বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—সাড়ে আট টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
গুপ্তপ্রেস, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

মিন্টুকে দিলাম

ভূমিকা

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি আমার আলোচনার সময়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে থামার কারণ, এই সময়েই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শক্তিমান লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। এর পরে বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিশেষ লেখা হয় নি। সম্প্রতি আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাচুর্য লক্ষ্য করছি। এই-সব রচনা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কেননা এদের পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করি নি। সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেশী ও বিদেশী লেখকের রচনায় আছে। সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন বোধ করি নি। আলোচনার সময় তাঁদের স্মরণে রেখেছি এই মাত্র।

ঐতিহাসিক তথ্য যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছি সেখানেই সংকলন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকর্মের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সংকলন করবার ইচ্ছে থাকলেও কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে সে ইচ্ছে পরিত্যাগ করেছি। কেবল গ্রন্থপ্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে পাঠকের সহানুভূতি প্রার্থনা করেছি। ইতিহাসের বই প্রায় সবই ইংরেজিতে। সেজন্য দীর্ঘ ইংরেজি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হয়েছি। এ ত্রুটি অনতিক্রম্য। যে-সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রামাণিক বলে উদ্ধৃত করেছি সেগুলি সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও বহুজনগ্রাহ্য। আমার আলোচ্য সময়ে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল তার অনেকগুলির পরিচয় দিই নি। কেবল যেগুলির মূল্য আছে সেগুলির কথাই আলোচনা করেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য পরিচিত গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা অনুসন্ধান করেছি। জ্ঞাতসারে কোনো বই উপেক্ষা করি নি। এর পরেও যদি কোনো মূল্যবান্ বই অনালোচিত থাকে তবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের স্নেহে ও শাসনে এই বই লিখিত। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণার কাজ করি। তিনি যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তা চিরকাল আমার পাথেয় হয়ে থাকবে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমার অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করে দিয়েছিলেন, তিনি আমার প্রণম্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন, সে কথা স্মরণ করি। বন্ধুবর শ্রীশিবচন্দ্র লাহিড়ীর উৎসাহ ও পরামর্শ এ বইয়ের পরম সম্পদ। এটি তাঁর বন্ধুকৃত্য। আমি প্রুফ দেখায় দক্ষ নই। কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। আশা করি পাঠক এ ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন। বন্ধুবর শ্রীসুবিমল লাহিড়ী প্রুফ দেখার ব্যাপারে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। আমার ছাত্রী শ্রীমতী রেখা রায়চৌধুরী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীমতীকে আশীর্বাদ জানাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাণ্ডুলিপি বিভাগের শ্রীসুকুমার মিত্র নানা দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার পর থেকেই তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করেছি। তিনি সানন্দে তা স্বীকার করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে যাঁর কথা মনে পড়ছে সেই জ্ঞানতপস্বী সুধীরকুমার দাশগুপ্তের উদ্দেশে আমার ভক্তি অর্পণ করছি।

২রা ফাল্গুন, ১৩৬৯ বি. দ.

সূচী

উপক্রম	...	১
ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত	...	৪০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৫৮
রমেশচন্দ্র দত্ত	...	১৫১
স্বর্ণকুমারী দেবী	...	১৮৮
চণ্ডীচরণ সেন	...	২১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২২৮
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	...	২৪৯
বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিক	...	২৫৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	...	২৯১
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩০২
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	...	৩০৮
শরৎকুমার রায়	...	৩১৮
দুর্গাদাস লাহিড়ী	...	৩২৪
বঙ্কিম-পরবর্তী ঔপন্যাসিক	...	৩২৮
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৪৬
পরিশিষ্ট	...	৩৭৭
নির্ঘণ্ট	...	৩৮১

উপক্রম

১

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের উল্লেখও আছে। ইতিহাস বলতে বোঝাত 'ইহা এইরূপ ছিল' (ইতি হ আস)। ইতিহাসের অন্য কতকগুলি অর্থও পাই, যেমন কথা, পৌরাণিক আখ্যান, ঐতিহ্য, ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস (আধুনিক অর্থে) রচনা সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল না। এর কারণ আগে আমাদের দেশে জাতীয় চেতনা ছিল না, সব-কিছুই কর্মচক্রের ফল বলে ধরা হত। সুতরাং অতীতের সম্বন্ধে তেমন কৌতূহল সেকালের লোকের ছিল না। এজন্যে বাণভট্টের 'শ্রীহর্ষচরিতে' ইতিহাসের সঙ্গে আরও বিভিন্ন বস্তু মিশ্রিত হয়ে গেছে। আমাদের দেশের পুরাণগুলিও ইতিহাস আখ্যা পেয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য পুরাণগুলি সমাজেতিহাস নয়। এমন-কি কহ্লনের বই সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকরা নানা আপত্তি তুলেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেগুলিকে চম্পূকাব্য বলা হয় সেগুলি রচনার মূলে যে খাঁটি ঐতিহাসিক প্রেরণা ছিল না এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং ইতিহাস রচনার উৎসাহই যে সাহিত্যে নেই সে সাহিত্যের ঐতিহাসিক কাহিনীর যাথার্থ্যবিচার সম্ভব নয়। (আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের যেমন তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মও উনবিংশ শতাব্দীতে।)

উপন্যাস অর্থটির বীজ রয়েছে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে। শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিলে রাজা দুষ্মন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কিমিদং উপন্যস্তম্'। অর্থাৎ 'একি কল্পিত কাহিনী বলছ'। এখানে স্পষ্টতঃ উপন্যাস মানে কল্পিত কাহিনী। আধুনিক কালে উপন্যাস বলতে আমরা কল্পিত কাহিনীই বুঝি। ইংরেজি Novel এবং Fiction (এ দুটোর অর্থ-পার্থক্য স্মরণে রেখেই বলছি) এর বাংলা কেন যে উপন্যাস হয়েছে তার কারণ বোধ করি এই।

আধুনিক কালে ইতিহাস কথাটি যে অর্থে চলছে বাংলা সাহিত্যে প্রথমে

সেই অর্থে ইতিহাস শব্দটি ব্যবহৃত হত না। বানানো গল্প বা ঐতিহাসিক গল্প এই দুই অর্থেই ইতিহাস কথাটি প্রযুক্ত হত। কেরীর 'ইতিহাসমালা'র কাহিনী সবগুলো বানানো। অথচ কেরীর বইয়ের নাম ইতিহাসমালা। তুতিকাহিনীর অনুবাদ হল 'তোতা ইতিহাস'। Persian Talesএর অনুবাদ হল 'পারস্য ইতিহাস'। Arabian Nightsএর অনুবাদ পাচ্ছি 'আরব্য ইতিহাস'। বলা বাহুল্য এই সবগুলি বইই গল্প-কাহিনী। ইতিহাস যে গল্প-কাহিনী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই বইগুলিই তার প্রমাণ। ভারতচন্দ্র থেকে রাধামোহন সেন অবধি বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বলতে গল্প-কাহিনী এবং অতীতের কাহিনী এই দুইই বোঝাত। প্রাচীন কবিরা যেমন কবিকঙ্কণ[১], ভারতচন্দ্র[২], মানিকরাম তাঁদের কাব্যকে স্থানে স্থানে ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরে যখন ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হল তখন ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্য সম্বন্ধে লেখকবৃন্দ সচেতন হলেন। নীলমণি বসাকের বইয়ের নাম ছিল প্রথমে 'পারস্য ইতিহাস' (১৮৩৪), পরে এর নাম হল পারস্য উপন্যাস (১৮৫৬)। ইতিহাস ও উপন্যাসের পার্থক্যটি সূচিত হবার পরই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে পূর্বের গল্পবৈশিষ্ট্যও রইল আবার তথ্যপ্রমাণও সংযোজিত হল। ঔপন্যাসিকেরা এর জন্যে গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে লিখেছেন, ইতিবৃত্তমূলক, ইতিহাসাশ্রিত, সত্যঘটনামূলক, ঐতিহাসিক উপন্যাস বা কাহিনী।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ইতিহাসের টেক্সটবই লেখা হতে লাগল পুরোদমে। এর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করছি। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় (১৮৩০): মার্শম্যান (John Clark Marshman); গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৩৩): ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়; আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯): হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন; ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৪০): গোপাললাল মিত্র; বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪০): গোবিন্দচন্দ্র সেন; বাঙ্গালার ইতিহাস

১ শুন শুন ঠাকুরানী কহি আমি হিতবাণী
ইতিহাসে কর অবধান।

নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।
সঙ্গে হৈল দেবী পূজার ইতিহাস॥

২ ইতিহাস হৈল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

(দ্বিতীয় ভাগ ১৮৪৮) : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড ১৮৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৯) : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সারাবলি (১৮৫১) : নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলির (১৮০৮) কথাও স্মরণ করতে পারি। এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে ইতিহাসপাঠে আমাদের আগ্রহ প্রবল হয়েছে। ইতিহাস যে উপন্যাস নয় সে বোধও ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের টেক্সটবইও লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এ দুইয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন।

২

যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারের পূর্বে ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতার আলোচনা প্রয়োজন। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে বর্তমানের দাবিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিলেই অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। ছেলেভুলোনো ছড়ার ভাষায়—

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা
মধ্যিখানে চর
তারি মধ্যে বসে আছে
শিব সদাগর।

কিন্তু এ বোধ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাই না। চৈতন্যদেবের পদরেণু স্পর্শে একবার জাতি বর্তমান সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল—প্রণমোহ কলিযুগ সর্বযুগ সার। ফলে দেবলোকের কথার পাশাপাশি মর্তজীবনের সুখদুঃখও সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার যে ষোড়শ শতাব্দীকে *precursor* to renaissance বলেছেন সে কথা সর্বৈব সত্য। এজন্যে চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে সমসাময়িক মানুষের পদাঙ্ক পড়েছে। কিন্তু এ চেতনা অচিরেই নিঃশেষিত হয়। কেননা দেশে তখন আধুনিকতার প্রস্তুতি ছিল না। তখন পর্যন্ত ভক্তিরস ছাড়া মানবরসের সন্ধান পাই না। চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্টই আছে কিন্তু ইতিহাসরস বলতে যা বুঝি সে বস্তু সেখানে নেই, থাকতেও পারে না। চৈতন্যজীবনীকাব্য গ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিকতা (যা অপ্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত) ইতিহাসের তথ্যঅনুগতিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দেশের কূলে কূলে বিদেশীর আনাগোনা চলছিল। দেশ যখন নানান দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন একদিন ঘুম ভাঙিয়ে, পাড়া মাতিয়ে 'বর্গী এল দেশে'। বিদেশের আবহাওয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-চিত্তকে প্রাচীনের বেড়া ডিঙিয়ে নবীনকে হাতছানি দিচ্ছিল। সেজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। ভারতচন্দ্রকে কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল এই বলে—

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥

এ সুর নাগরিকতার এবং নবীন সাহিত্যের ইঙ্গিতবাহীও বটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে, ঐতিহাসিক ছড়ায়, গানে এই নতুন সুর। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু নামেই প্রকাশ কাব্যকাহিনীতে ইতিবৃত্তের অসদ্ভাব না থাকলেও বইটি পুরাণশ্রেণীভুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অসংখ্য ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা বেরিয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই না ইতিহাস না বিশুদ্ধ কাব্য। (কাব্য কথাটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করছি)। অন্যান্য ইতিহাসাশ্রিত কবিতাগুলিতে কোথাও রাজমালা, কোথাও বংশগরিমা, কোথাও স্থানীয় স্মরণীয় ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে। শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই-গুলিকে এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন— রাষ্ট্রকথা, রাজকাহিনী, দুর্যোগবার্তা, সংঘাতচিত্র।[১] রাষ্ট্রকথার অন্তর্গত এই গ্রন্থগুলি: মহারাষ্ট্রপুরাণ, অন্নদামঙ্গল, তীর্থমঙ্গলকাব্য, বরদামঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গগীতিকা, মহাপ্রস্থানের ছড়া ইত্যাদি। রাজকাহিনীর অন্তর্গত এইগুলি: কৃষ্ণমালা, রাজমালা, গাজীনামা, কীর্তিচন্দ্রের গাথা, কাস্তনামা বা রাজধর্ম, প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত, বেহারোদস্ত, রাজবংশাবলী। দুর্যোগবার্তা পর্যায়ের কবিতাগুলি: দামোদরের বন্যা, ময়ূরাক্ষীর বন্যা, কীর্তিনাশার প্লাবন, ত্রিপুরার ছড়া, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া এবং কাহিনী। সংঘাতচিত্র পর্যায়ে পড়ে নানা ছোটখাটো বিদ্রোহ নিয়ে লেখা কবিতা— যার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ একটি উল্লেখযোগ্য ছড়া। বলা বাহুল্য এই-সব কাহিনী-ছড়াতে সাহিত্যপ্রচেষ্টা কিছু ছিল না। রাজমহিমা, বংশগরিমা,

১ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলাকবিতা

কিংবা বিদেশীর আক্রমণে বিপর্যস্ত সমাজবৃত্ত কোনো কোনো কাহিনীর উপজীব্য। তবে এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কবির ব্যক্তিগত শোক-উচ্ছ্বাস, আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করা যায়। এবং সেইখানেই কাব্যত্বের স্পর্শ লেগেছে। দুর্যোগবার্তা, সংঘাতচিত্র পর্যায়ের ছড়াগুলিতে দেশের কথা দশের কথা আছে। দেবনাথের তিতুমীরের অনুচর কর্তৃক নিধনের পর কবি এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

কইতে ফাটে বুক, বড় দুঃখ, রায় মারা গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল॥

এর প্রথম ছত্রে কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকম্পনটি লক্ষণীয়, দ্বিতীয় ছত্র প্রথার অনুকরণ। এমন আরো অনেক আছে। গ্রামজীবনের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, সংঘাত ইত্যাদি প্রবল আলোড়ন তুলত। প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ হিসেবে এই বর্ণনাগুলিতে হৃদয়ের ছোপ লেগেছে। বর্ণনা প্রায়ই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাতে করে ঘটনার গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে নি। কবিরা দুর্যোগের সালগুলিকে ঠিক মনে রেখেছেন—

এগারশ চৌরানব্বই ত্রিপুরের সন।
অন্নাভাবে প্রজা ক্ষিতি হইল নিধন॥

অথবা

বিধাতা জন্মের কালে সন ১২৭৩
বার তিহাত্তর সালে পরাধীনের ভাগ্যে কি লিখিল
অন্য সুখ জাহা হোক লক্ষ্মীহীন যত লোক পেটভরা অন্ন না পাইল।

কিংবা

এগার শত সাত পঞ্চাশ মঘি জ্যৈষ্ঠ মাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ॥
তৃতীয় বিংশতি তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাস ছিল।
পূর্ব্বভাগ হোতে পুনি মারুত উঠিল॥

এই-সব সাল তারিখ পাঠককে অতীতের জগতে নিয়ে যায়।

তথাপি এ কথা ঠিক ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাগুলিতে কাব্যত্বের স্পর্শ কম। এগুলি সাময়িক ঘটনাজাত, এগুলিতে কালজয়িত্বের স্বাক্ষর নেই।

এই সমস্ত কাব্যকবিতায় নামধামের ভুলচুক আছে, একের গুণ বা দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও দেখতে পাওয়া যায়। কবিরা ইতিহাসকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে নতুন কোনো ভাবনা প্রকাশ করবার চেষ্টাও

করেন নি। আগেই বলেছি তখন পর্যন্ত ইতিহাস-চেতনা সম্পূর্ণরূপে জাগে নি। সেই কারণে পুরাণের অনুকরণে এবং অনুসরণে ছড়া কাহিনী রচিত হয়েছিল।

তথাপি দেশের কথা, অতীতের কথাকে কাব্যে স্থান দিয়ে এঁরা একটা বড়ো কাজ করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টিকে ইহলোকমুখী করে তুলতে এ সমস্ত গাথা ছড়া কবিতা বিশেষ সহায়তায় এসেছিল। কিঞ্চিৎ ইতিহাস-চেতনাও জাগিয়েছিল। এইগুলির মূল্যও সেইখানে। ঐতিহাসিক উপন্যাস-গুলিও জাতীয় জীবনে এইরকম কাজ করেছিল। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে একটা ন্যায়নীতি বেশ স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল তারও সূচনা এই সমস্ত ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাতে। এগুলি যে এককালে দেশের লোকের মনের ভোজ্য জুগিয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

৩

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সী সাহেবসুবোদের রচনার মূল্য সকলেই স্বীকার করেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য—চরিত্র—' উপন্যাস নয়, জীবনীগ্রন্থ মাত্র। গ্রন্থটির কতগুলি তথ্য ঐতিহাসিক কতগুলি জনশ্রুতি কিছু ভারতচন্দ্র থেকে নেওয়া। বাংলাদেশের ইতিহাস জানবার জন্যে পাঠক যে উৎসুক ছিলেন সে কথা রামরাম গ্রন্থের আরম্ভেই বলেছেন। কিন্তু 'আনুপূর্বক না জাননতে ক্ষোভিত হয়'। রামরাম সেজন্যে প্রতাপাদিত্য-জীবনী লিখলেন। তিনি বলেছেন, 'তাহার (অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের) বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর ২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্বক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে'। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে এ বই লিখিত। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রাথমিক প্রয়োজন উপেক্ষিত, আবেগ অনুভূতির প্রাধান্য স্বীকৃত। সেখানেই এই বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য। এই বই যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদিরূপ তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'ও পাঠ্যপুস্তক। সিভিলিয়ানদের জন্যে লেখা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নানাদিক থেকে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে স্মরণীয়। স্বভাবতই বাঙালী লেখকের উপজীব্য হয়েছে কৃষ্ণচন্দ্র। বলা বাহুল্য ভারতচন্দ্রের কাব্য এ বইয়েরও উৎসস্থল।[১]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মধ্যমণি উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটির নামপত্রে আছে A collection of stories in the Bengali Language, Collected from various sources. গল্পগুলির বিভিন্ন উৎস বলতে নিশ্চয়ই জনশ্রুতিই কেরীর লক্ষ্য ছিল। অনেকগুলি গল্পের সমাপ্তিতে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করা আছে যেমন আছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের গল্পগুলিতে। কেরী ছিলেন মিশনরী। সুতরাং বাইবেলের অনুরূপ গল্পছলে নীতিকথা বলবার ইচ্ছাও কেরীর ছিল। ঈসপের গল্পগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। অর্থাৎ গল্প বলার দেশী ও বিদেশী আদর্শটি কেরীর ধ্যানে ছিল। বাংলা গল্প-উপন্যাস গঠনে কেরীর বইটির মূল্য অপরিসীম। ইতিহাসমালার ৪৬ সংখ্যক গল্পটি বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য এবং ভাঁড় মহেশের কাহিনী, ১০৯ সংখ্যক গল্পের বিষয় রূপগোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী ও ১৪৭ সংখ্যক গল্পটি আকবর শাহ ও বীরবর (বীরবল কে নিয়ে লেখা। এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ৪৬ সংখ্যক গল্প গোপাল ভাঁড়ের গল্পের অনুরূপ। সনাতনের গল্পের কোনো ইঙ্গিত চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে নেই কেবলমাত্র নাম দুটি ছাড়া। ১৭৭ সংখ্যক গল্পও কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের উপর স্থাপিত নয়। সুতরাং এগুলি নিছক গল্প মাত্র। এবং এগুলিতে গল্পরসও আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনায়ও এজন্যে এ বইটির মূল্য অনস্বীকার্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীর কৃতিত্ব হচ্ছে যেখানে এঁরা পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েও দেশীয় ভাবমণ্ডলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেরী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেন নি। রামরাম বসু, রাজীবলোচন

১ এই বইটি সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়: 'ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংখ্যা, ১৩৬০।

প্রমুখ লেখকবৃন্দ এমন কতগুলি বিষয় নির্বাচন করলেন যেগুলি বাঙালির পরিচিত, যে সমস্ত বিষয় শুনতে পাঠক মাত্রেরই কৌতূহল আত্যন্তিক। এঁরা সেই কৌতূহল এবং আগ্রহের আনুকূল্য করে জাতীয় প্রবণতাকে পুষ্ট করেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস গঠনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৃতিত্ব হচ্ছে সেখানে যেখানে কলেজের লেখকবৃন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতেও এঁরা সাহায্য করেছেন। রামরাম বসু তো বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি বৃহৎ চরিত্ররূপায়ণের পথিকৃৎ।

৪

দুটি ইংরেজি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই করতে হয়। একটি টডের *Annals of Rajast'han,* অন্যটি কন্টারের *Romance of History—India, Vol I & II.*

টডের রাজস্থান বেরিয়েছিল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড বার হয় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। *Annals of Rajast'han* সাফল্য পেয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে টড এই জাতীয় আরও একখানা বই লিখলেন *Travels in Western India embracing a visit to the sacred mounts of the Jains, and the most celebrated shrines of Hindu Faith between Rajpootana and the Indus; with an account of the Ancient city of Nehrwalled* নামে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে। এখানে লক্ষণীয় sacred mounts এবং celebrated shrines of Hindu Faith কথাগুলি। বুঝতে পারি কেন টড ভারতবাসীর এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন।[১] টডের রাজস্থানের পরবর্তীকালে অনেক অনুবাদ হয়েছিল। কিন্তু রাজস্থানকে

১ টডের জীবনীকার এই বইটির ভূমিকায় বলেছেন—The enthusiasm of the author, who is the historian of some remarkable events in recent Rajpoot history of which he was an eye-witness and in some of them an agent, has moreover, infused into the narrative a portion of his own feelings, and incorporated with it many of the adventures of his own life. এই feelings এবং adventuresই উপন্যাসিকদের কাছে এক অজ্ঞাত জগতের দ্বার খুলে দিলে।

যথার্থ ইতিহাস বললে ভুল করা হবে।[১] রাজপুত জাতির কিংবদন্তী, প্রবাদ, প্রবচন, কবির কাব্য (চান্দ বরদাইর 'পৃথ্বীরাজ রাসৌ') এ-সকল ছিল মূলত টডের অবলম্বন। সেজন্যে প্রতিটি রাজপুত জাতির বিবরণ প্রসঙ্গে টড তাঁদের পৌরাণিক কর্মবৃত্তান্তকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রাজপুত জাতির অনেক গল্পকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এ যেন বিগত শতাব্দীর অশোকের ইতিহাস-রচনা পদ্ধতি। বৌদ্ধজাতকে অশোক সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে সেগুলিকেই ঐতিহাসিকবৃন্দ যথার্থ ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছিলেন। আধুনিক ইতিহাস-রচনা পদ্ধতিতে শিলালেখগুলি ছাড়া জাতকের কোনো মূল্যই স্বীকৃত হয় নি। টডের রচনাকেও সেজন্যে ইতিহাস বলতে পারি না। কিন্তু বাংলা সাহিত্য টডের কাছে নানাদিক থেকে ঋণী। যথার্থ ইতিহাস পাই নি বলে দুঃখ করবার কারণ নেই। টডের গ্রন্থই বাংলা কাব্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারদের সামনে ঐতিহাসিক উপাদানের ভাণ্ডার উন্মোচিত করলে। রেনেসাঁসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বীরত্ব, উন্মাদনার প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ এসেছিল টডের রাজস্থান তার জোগান দিলে। দেশপ্রেম, সতীত্ব-গৌরব, বীরত্ব, এবং রোমান্স রাজস্থানে প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও কাব্যকারবৃন্দ যথেচ্ছ টডের দ্বারস্থ হতে লাগলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনায় টডের বইখানির গুরুত্ব এই কারণে অপরিসীম। টডের বইখানিতে আবার গ্রন্থকারের Personal Narrative থাকাতে সুখপাঠ্য হয়েছে। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিও বইখানিকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল। J. H. Caunterএর *Romance of History India*—Vol I & II তে ইতিহাস লেখার চেষ্টা ছিল না। ভূমিকাতে তিনি বলেছেন—

Romantic as are many of the events which the Mohamedan annals suppply; they are nevertheless all of one tone and colouring. They want the delightful blendings and tintings of social circumstances.

১ টডের জীবনীকার বলেছেন, The interest in this mass of genuine original history, many parts of which possess the fascinations of an elaborate fiction.

টড নিজেই আবার বলেছেন, it never was his intention to treat the subject in the severe style of history.

Their princes were despots, their nobles warriors, their governments tyrannies and their people slaves. The lives of their most eminent men, who were distinguished chiefly for their deeds in arms, present little else than a series of battles, their principal amusement was the chase, in which similar perils to those presented in war were courted for the stern glory which followed achievements.

এই রোমান্স ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের পরম আদরণীয় বস্তু হয়ে রইল। বলা বাহুল্য রোমান্স রচয়িতার কাছেও এই বইটি অপরিসীম মূল্য পেয়েছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার পূর্বে কতগুলি ইতিহাসাশ্রিত ইংরেজি কবিতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনাকালে এগুলির গুরুত্ব অবহেলা করতে পারি না। ইতিহাসকে কাব্যরসে জারিত করে এঁরা যা রচনা করলেন তার মূল্য অপরিসীম। এইগুলিও পাঠকের মনকে ঐতিহাসিক কাহিনী শোনবার জন্যে প্রস্তুত করলে। হরচন্দ্র দত্তের *The Flight of Humayun*, শশিচন্দ্রের *Jelaludeen Khiliji, The Requiem of Timour, Sivajee, The warrior's Return*, মধুসূদনের *The Captive Ladie*, রমেশচন্দ্রের *Asoka's message to his people* ইত্যাদি নিঃসন্দেহে ইতিহাসকে সাহিত্যগুণোপেত করেছিল। শশিচন্দ্রের *The Times of Yore*-এর কথা যথাস্থানে বলেছি।

সুতরাং (ঐতিহাসিক উপন্যাস গঠনে যথার্থ ইতিহাসচর্চা এবং নানা ঐতিহাসিক গল্প কাহিনী, টডের রাজস্থান, কন্টারের রোমান্স, ইতিহাসাশ্রিত ইংরেজি কবিতার প্রেরণা ছিল।) দেশীয় উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ঋণের কথাও বলতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য নানাদিক থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাছে ঋণী। ঐতিহাসিক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। স্কটের বই যে সে যুগে আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে স্কটের প্রভাব আছে বলে মনে করি।

(বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে গোড়াতেই একটা কথা বলা আবশ্যক। সেইটি হচ্ছে এই বঙ্কিমচন্দ্র - রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তা পরবর্তীকালে

সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ অনেক। প্রথমত, সামাজিক উপন্যাসের দ্রুত বিস্তার, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের আবির্ভাব, ইংরেজি সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অভাব, ঐতিহাসিক তথ্যের দৈন্য, ইতিহাসচর্চার প্রতি বাঙালির অনীহা। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্ভাবনার সার্থক পরিণতি বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। উপন্যাস রচনার একটা বাঁধাধরা আদর্শ (Pattern) নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সকলেই সেই ছাঁচে ঢেলে উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং এই-সব ছাঁচে-ঢালা উপন্যাসে বৈচিত্র্যের অভাব। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্রমপরিণতি নেই। সামাজিক উপন্যাসে যেমন একটা সুস্পষ্ট বিকাশ দেখি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বেলায় তা লক্ষ্য করা যায় না। কেননা আদি যুগের বিষয়বস্তুর জের পরবর্তীকালেও চলেছিল। নূতন কোনো আদর্শও স্থাপিত হয় নি। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনা উদ্ভবের সময়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল নানা কারণে পরবর্তীকালে অতি শীঘ্রই তাতে ভাঁটা পড়েছিল।

আমরা কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কতকগুলি বিভাগ করতে পারি।

প্রথম, রাজপুতবীর এবং মোগল বাদশার কাহিনী
দ্বিতীয়, বঙ্গের বীর সন্তানদের প্রশস্তিমূলক আখ্যান
তৃতীয়, সিপাহীবিদ্রোহমূলক ঘটনাবলি
চতুর্থ, স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী
পঞ্চম, হিন্দুযুগের গৌরবময় ঘটনা।

একে একে এগুলির পরিচয় দিচ্ছি।

মোগলবাদশার ইতিহাস কিছু পরিমাণে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পরিশ্রমে মুসলমান ঐতিহাসিকদের গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকের মৌলিক গ্রন্থ আমরা পেয়েছিলাম। হিন্দুরাজার ইতিহাস প্রধানত কিংবদন্তীর উপর স্থাপিত ছিল। কেবলমাত্র কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত টডের রাজস্থান গ্রন্থও মোগলবাদশার কীর্তিকাহিনী, রাজপুত আখ্যানকে বাংলাদেশে পরিচিত করেছিল। টডের রাজস্থান মূলত রাজপুত জাতির সঙ্গে মোগল বিরোধ নিয়ে লিখিত। তৃতীয়ত, মোগলবাদশা ছিল বিদেশাগত। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত স্বদেশ-

চেতনা পরাধীনতার গ্লানি বোধ করেছিল। বিদেশীর শাসনযন্ত্রকে সকলে সুনজরে দেখেন নি। সুতরাং ইংরেজের প্রতীক হিসেবে মোগলবাদশা চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু এইটি আংশিক সত্য। ইংরেজের শাসনে দেশ যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে তখন ইংরেজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার চেতনা দেশে আসে নি। শিক্ষিত বাঙালি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। সুতরাং আমাদের মনে হয় দেশের অধঃপতনের জন্যে ঔপন্যাসিকরা দায়ী করতে বাধ্য হয়েছিল মোগল আমলকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকই হিন্দু। হিন্দুত্বের অভিমান যে একেবারে ছিল না এ কথা জোর করে বলা যায় না। আসলে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা মিশ্র অনুভূতি ক্রিয়া করেছিল। এক দিকে বিদেশী শাসনের জ্বালাযন্ত্রণা অন্য দিকে বিদেশাগত মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সংশয়ের দৃষ্টি ঔপন্যাসিকদের প্রেরণায় ছিল। ফলে প্রায় বেশির ভাগ উপন্যাসেই মোগলের বিরুদ্ধশক্তির প্রতি সপ্রশংস অভিনন্দন লক্ষ্য করি। দেশে স্বাধীনতার চেতনাও পরিস্ফুট। জাতীয় উদ্দীপনা সর্বত্র সাড়া জাগিয়েছে। এই অবস্থায় জাতীয় বীরদের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করবার প্রত্যাশা স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলেছি বাঙালির ইতিহাস তখনও লেখা হয় নি। টড রাজস্থান গ্রন্থে রাজপুতজাতির রোমান্সকে বিস্তৃত করেছেন। সুতরাং উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ রাজপুত বীরবৃন্দকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি পেলে। বিদেশী বীরদের ইতিহাসও অধিগত হয়েছে। একিলিস, ওডিসিয়াসের মতো বীরকুলর্ষভদের কাহিনী শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। রাণাপ্রতাপ, রাজসিংহ, জয়সিংহ, মানসিংহ, (কোনো কোনো উপন্যাসে), পৃথ্বীরাজ ইত্যাদি বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যে যাঁরা আরও একটু এগিয়ে গেলেন তাঁরা বাঙালি বীরদের কাহিনীও বলতে আরম্ভ করলেন। এ সকল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নেই। কিন্তু বাঙালির মর্মবেদনার সম্যক্ প্রকাশ ঘটেছে এই-সব কাহিনীতে। মোগল দরবার ঔপন্যাসিকদের আকৃষ্ট করবার আরও একটা কারণ হল এই যে সে-কাহিনী নিয়ে রোমান্স রস অতিসহজেই পরিবেশন করা যায়। J. H. Caunterএর *Romance of History-India* দুই খণ্ডে তার স্বাক্ষর বহন করছে। মুসলমান শাসনের কোনো উজ্জ্বল চিত্র আমাদের ঔপন্যাসিকদের সামনে ছিল না। আলিবর্দীর সময়ে বার বার মারাঠা আক্রমণে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারী নবাবী শাসন

থেকে দেশবাসী অবশ্যই মুক্তি চেয়েছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচারিতার স্মৃতি লেখকদের স্মরণে ছিল। কেননা নবাবী আমল উনিশ শতক থেকে খুব দূরের ছিল না। সুতরাং লেখকবৃন্দ যখন মোগলশাসনকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন তখন তার রূপায়ণ নবাবী আমলের অনুরূপ হয়েছিল।

মুসলমানরা যখন রাজত্ব হারাল তখন তার দশা প্রায় চরমে পৌঁছে। মুসলমানদের সেই পতন দশার ছবি নিপুণ হস্তে এঁকেছেন সৈয়দ গোলাম তাঁর সুবিখ্যাত 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন' গ্রন্থে। কি ব্যাপক দায়িত্বহীনতা যে মুসলমানদের সর্বস্তরের জীবনে দেখা দিয়েছিল তার বিচিত্র ছবি ফুটেছে তাঁর লেখায়।…মুসলমানদের অবস্থা যে ব্যাপকভাবে হীন হয়ে পড়েছিল, সমাজে যে সব কদাচার প্রবেশ করেছিল তার সম্বন্ধে কোনো চেতনা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না, এমন-কি রাজ্য যে তাদের আর নেই সে সম্বন্ধেও তাদের চেতনা যে বহু দেরিতে আসে, তা মিথ্যা নয়। ১

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকবৃন্দ যখন উপন্যাস রচনা করছিলেন তখন মোগল-পাঠান শাসনের বিস্তৃত তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। সব ঐতিহাসিক কিছুপরিমাণে একদেশদর্শী ছিলেন। সুতরাং মোগল শাসনের উজ্জ্বল চিত্র না পাওয়ার জন্যে কেবলমাত্র ঔপন্যাসিকবৃন্দকে দায়ী করলে চলবে না। ঐতিহাসিকবৃন্দের মতনিরপেক্ষতার অভাবও এর একটা মস্ত কারণ।

এলফিনষ্টোন, ষ্টুয়ার্ট, বার্ণিয়ার, ট্রাভারনিয়ার প্রভৃতি কৃত একদেশদর্শী ইতিহাস-পুস্তকই বিদ্যালয়ে চলিত। অধ্যাপকগণ ও শিক্ষকগণ তাহাই পড়াইতেন ও পড়িতেন, আর তাহাই বিশ্বাস করিতেন। এ সমস্ত পুস্তকের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যুগ তখনও আরম্ভ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ স্কুল কলেজেই পড়িয়াছিলেন, সুতরাং মুসলিম যুগের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সাধারণের মতোই হইয়াছিল। ভারত ইতিহাসের যে সব ঘটনাকে আজ আমরা বিতর্কমূলক বলিয়া মনে করি, বঙ্কিমচন্দ্র হয়তো প্রচলিত বিশ্বাস মতে সে সম্বন্ধে একটা সুস্থির ধারণা করিয়াছিলেন।২

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলির কথা এবার আলোচনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পর যখন মৃণালিনী লিখলেন তখন নিশ্চয়ই ইতিবৃত্তের অভাব বোধ করেছিলেন। কেননা যতদূর বুঝি তাতে এই মনে হয় যে মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল। তিনি সপ্তদশ

১ কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ।
এই সম্বন্ধে যদুনাথ সরকারের *Fall of the Moghul Empire*এর ৫৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ রেজাউল করিম, বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ।

অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী বিশ্বাস করেছিলেন কি না সে প্রসঙ্গ অবান্তর। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মৃণালিনীর কাহিনীগঠন শিথিল, ইতিহাসকাহিনী আরও শিথিল, অসম্বদ্ধ, খাপছাড়া। ইতিহাস মুখ্য বস্তু হলেও তথ্যের অভাবে তা ধূসরবর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র যে মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন তারই খেদ প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শনে। বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনা শিক্ষিত বাঙালিকে স্পর্শ করেছিল। ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ এই বিশ বছরে সে আয়োজন সম্পূর্ণ হল। আর্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫ - ১৯০৪) অনেকগুলি জীবনবৃত্তান্ত লিখেছিলেন।[১]

> যোগেন্দ্রনাথ যখন জীবনবৃত্ত-রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সবে সাড়া জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই স্বভাবতই তিনি পাশ্চাত্য দেশের সেই মহাপুরুষদের জীবনী বাছিয়া লইয়াছেন যাঁহারা স্বদেশে অধীনতা মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন।[২]

কিন্তু এর মধ্যে লেখকবৃন্দ সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। অনুসন্ধিৎসু স্বদেশীভাবাপন্ন লেখকবৃন্দ বঙ্গের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হলেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী (১৮৬৫-১৯৩৫) দেশপ্রেমিক মহাত্মাদের চরিত্র অবলম্বন করলেন। তাঁর ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত (১৮৯৫), বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত (১৮৯৬), মহারাজ নন্দকুমার চরিত (১৮৯৯), ইত্যাদি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বারভূঞার কাহিনী এখন যতই অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হোক না কেন সেকালে বাঙালির স্বদেশী উদ্দীপনাতে এই-সকল কাহিনী ইন্ধন জুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। বঙ্গমাতার আসন ঘিরে এই সমস্ত বীরবৃন্দ সাময়িক আসন লাভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সতর্কতা সত্ত্বেও পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে Myth রচনা করতে শিক্ষিত বাঙালি নিরুৎসাহ হয় নি। ফলে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসেও অতি সহজে এঁরা আসন পেয়ে গেলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। সুতরাং লেখকবৃন্দ বঙ্গের বীরসন্তানদের মধ্যে যা-কিছু মহত্ত্ব ছিল সবটুকু নিংড়ে উপন্যাসের পাত্রে স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত বীর-সন্তানদের প্রতি— সীতারাম, উদয়নারায়ণ, শোভাসিংহ, প্রতাপাদিত্য, সমশের গাজী— ঔপন্যাসিকদের শ্রদ্ধা, বিস্ময়, সপ্রশংশ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করি। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দুর্দমনীয় উৎকণ্ঠা ও আবেগ এঁদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। সত্য কথা বলতে কি এগুলিকে জীবনীপর্যায়ের

১ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

গ্রন্থ হিসাবে দেখা উচিত। লেখকেরা যদিও বলেছেন তাঁরা উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এগুলিতে জীবনচরিতের বৈশিষ্ট্যের বাইরে আর বিশেষ কিছু নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম অবশ্য এই পর্যায়ের গ্রন্থ নয়। আরও একটি কথা, নিজবাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকার বেদনা রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। রাজপুতবীরদের বন্দনার মধ্য দিয়ে তা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পেল। কিন্তু সেও যেন একান্ত আপনার মনে হল না। সেজন্যে বাঙালীবীরদের স্বদেশ-উদ্দীপনার সন্ধান করতে হল। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি মিলে গেল। বাংলায় প্রথম যুগের ইতিকথার প্রধান উৎস তো এই। নিছক ইতিহাসচর্চার কঠোর পরিশ্রমই কেবল নয় তার পশ্চাতে ছিল একটা দুর্দমনীয় আবেগ, একটা স্বতোৎসারিত প্রেরণা। আন্দ্রে মোরয়া বলেছেন,

> A minor aspect of the fictional treatment of real people in the novel is the crediting of what are accepted as national characteristics to lesser known historical figures. Making traits of national character personal to a fictional individual and thereby stamping him to typical of the race is a literary convention as old as the Elizabethan dramatists. ১

সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসগুলি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার কারণ শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় সিপাহীবিদ্রোহের প্রভাব কতখানি এবং তা কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল এই উপন্যাসগুলিও তার একটা হদিস দিতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সিপাহীবিদ্রোহ বাঙালির চিত্তে সাড়া জাগাতে পারে নি। সিপাহী-বিদ্রোহ যদি সফল হত তবে নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন ব্যবস্থা খানিকটা ফিরে আসত। অথচ প্রাচীন ব্যবস্থার জীর্ণতার জোবরা এবং লালসার লোলতার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন বাঙালি কখনই তা গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে নি। সুতরাং সিপাহীবিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নি। এই কারণে সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসগুলিতে সিপাহী চরিত্র উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত নয়। প্রায়ই সিপাহীদের নৃশংস অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী উপন্যাসগুলিতে বিবৃত হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা প্রথম

১ *Cassel's Encyclopoedia ;* Historical Figures in Fiction. M. W. MacCulum, *Shakespeare's Roman Plays and their background* বইটিও দ্রষ্টব্য।

উপন্যাস থেকে আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ বই 'নানা সাহেব' পর্যন্ত সমস্ত বইতে লেখকরা নিজস্ব জবানিতে কবুল করেছেন সিপাহীবিদ্রোহ উন্নতির প্রতিবন্ধক, সিপাহীদের চেতনায় ব্যক্তিগত স্বার্থই ছিল বড়ো। সুতরাং এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না যে সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির প্রেরণা অন্যত্র কোথাও প্রচ্ছন্ন আছে। রজনীকান্ত গুপ্ত তিন খণ্ডে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এই প্রেরণা নিছক ঐতিহাসিক ছিল কিনা তা জোর করে বলা শক্ত। আমাদের মনে হয় জাতি যে বহুকাল পর্যন্ত সিপাহীবিদ্রোহের স্মৃতি মনে রেখেছিল তার কারণ এই বিদ্রোহ ইংরেজের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে এবং বণিকবুদ্ধিকে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়েই কোম্পানির শাসনব্যবস্থা রদ করেছিল। ঔপন্যাসিকরা সিপাহীবিদ্রোহের দূরগত কারণগুলিকেই বিস্তৃত করেছেন। ইংরেজ কোম্পানী পরাধীন জাতির উপর শোষণের ভার নামিয়ে দিচ্ছিল। সিপাহীবিদ্রোহ এই শোষণেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। ঔপন্যাসিকরা এই শোষণের কথাও বলতে ভোলেন নি। দেশীয় সিপাহীদের তাঁরা সমর্থন করেন নি, কিন্তু তাই বলে ইংরেজ স্তাবকতাও তার মধ্যে ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহ যে একটা নবযুগের সূচনা করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সেইটি হচ্ছে কোম্পানির রাজত্বের অবসান ও মহারানীর প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তন। অন্তত ঔপন্যাসিকরা এই মনে করেছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের এই ঐতিহাসিক ফলশ্রুতিই ঔপন্যাসিকের বিষয়নির্বাচনে সাহায্য করেছিল।

(আর-এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস দেখা যায়, যেগুলির মধ্যে স্থানীয় কিংবদন্তী ইতিবৃত্ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।) শালফুল, ইলছোবা, রণচণ্ডী এই জাতীয় উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাসগুলিও এই পর্যায়ের। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়ে উপন্যাসটির প্রধান আকর্ষণ স্থানীয় ইতিবৃত্তের মনোরম বর্ণনায়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় উপন্যাসে ভৌগোলিক বিবরণ একান্ত প্রত্যাশিত এবং স্থানীয় ভূগোলবিবরণ পাঠকের মনে একটা প্রত্যয়ের সুর এনে দেয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়, স্থানীয় নামের পশ্চাতে ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়ের আবিষ্কারে প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া ইত্যাদির পশ্চাতে জনচিত্তস্পন্দনের চকিতচমক দীপ্তিতে এই উপন্যাসগুলি একটি নতুন আস্বাদ এনে দিতে সমর্থ হয়েছে। (ঐতিহাসিক

উপন্যাসগুলিতে সাধারণতঃ রাজকীয় সমারোহ, যুদ্ধের কোদণ্ডটঙ্কার শুনি। কিন্তু এই জাতীয় উপন্যাসে কোনো ঐশ্বর্যসমারোহ লক্ষিত হয় না। একটা স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী— যা বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল— তারই কথা বর্তমানযুগের অতি-বাস্তবজগতের বাঙালি প'ড়ে আনন্দ পায়। আরও একটি কথা— স্বদেশপ্রেম ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান। এই-সব উপন্যাসে স্পষ্টত কোথাও স্বদেশপ্রেমের কথা নেই। বীরত্ব, উন্মাদনার রেশও সর্বত্র দেখতে পাই না। তথাপি মনে হয় লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যেই স্বদেশ-চর্চার অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রচ্ছন্ন। দেশপ্রীতিই লেখকদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল নিজদেশের কথাকে বলতে। Butterfield বলেছেন—

> Even where it contains no sounding of the trumpets of nationalism; and where its author holds no patriotic motive, the historical novel cannot help reminding men of their heritage in the soil. It is often born of a kind of patriotism; it can scarcely avoid always being the inspiration of it. ১

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন' সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় কিন্তু অন্য দিক থেকে বিচার করলে এগুলির ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। সেকালের পাঠশালা, বসন্তোৎসব এবং গ্রামীণ জীবনই ইতিবৃত্তের ভিত্তিভূমি। সুতরাং ইতিহাসের গোড়ার কথা পাচ্ছি এই উপন্যাসগুলিতে। বাংলার গ্রামের হৃদস্পন্দনটি প্রকাশ করেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর 'বিশ্বনাথ' খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। সেকালের বীরত্ব ও শৌর্যের মধ্যে যে রোমান্স রস সঞ্চিত ছিল তাকেই শ্রীশচন্দ্র নিষ্কাশিত করেছেন এই উপন্যাসে।[২]

আমরা সকলেই জানি যে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণা এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' দেশে ইতিহাসচর্চার আগ্রহ এনে দেয়। 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত দেশচর্চার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে দেখতে পাই তিনি দেশের পুরাবৃত্ত চর্চার প্রতি দেশবাসীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

১ H. Butterfield— *The historical novel.*

২ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে ইতিহাস রচনা করতে হলে এক-একটি গ্রাম কিংবা এক-একটি স্মরণীয় ঘটনা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রকথা রচনা করতে হবে। এই আলোকে গ্রামগুলির বিস্মৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকরা এ বিষয়ে আগে থেকেই পথ দেখিয়েছেন। লেখকেরা নিজগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করে আধুনিক কালেরই একটি আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিত করেছিলেন।

এর সুফলও ফলতে আরম্ভ করল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামদাস সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটল। এরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে তথ্য আবিষ্কার করলেন তাতে ইতিহাসের চেহারা বদলে গেল। এই অনাবিষ্কৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটনে এক বিস্তৃততর পটভূমি ঔপন্যাসিকদের কাছে এসে গেল। এই-সব দিগন্তকে ফুলে ফলে রঙে রসে ঔপন্যাসিকবৃন্দ রাঙিয়ে তুললেন। এই পর্যায়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র রায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, সেন যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের উপর উপন্যাসের ইমারত প্রস্তুত হল। অবশ্য এ কথা ঠিক এরই পাশাপাশি পূর্ববর্তী ধারার জেরও সমানে চলল। এবং এই জাতীয় উপ-ন্যাসেও পূর্ববর্তী ধারার 'টেকনিক' অবলম্বিত হল। পূর্ববর্তী ধারার প্রভাব থাকলেও এগুলিকে স্বতন্ত্র পর্যায়ে রাখার কারণ এই যে এগুলি রচনার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রসপরিবেশন নয়—সমগ্র যুগচিত্তের প্রাণস্পন্দনটি এর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে এও লেখকদের ধারণায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন—

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান

এ নিছক অন্তরের আবেগে-উচ্ছ্বাস নয়—জ্ঞানের পথে তার সম্যক্ উপলব্ধি হবে এইটিও তিনি চেয়েছিলেন। সুতরাং এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের ধূসরতা অনেকাংশে কেটে গেছে, অস্পষ্ট কুহেলিকা-আচ্ছন্ন জীবনকে জ্ঞানের আলোকে এঁরা দেখেছিলেন। এবং এই কারণেই সেই যুগের শিলালেখ, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, অলংকারশাস্ত্র ঘেটে, মন্থন করে এঁরা যে অমৃত উপহার দিলেন তার মধ্যে ইতিহাসের অনুস্মৃতি অনেকাংশেই বাস্তব হয়েছে। কিন্তু খাদ মেশানোর প্রয়োজন তখনও ছিল পরেও থাকবে। স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, এই খাদের উপর নির্ভর করে। 'পাথুরে প্রমাণে'র উপর রসসর্জনার আবেগকম্পিত শিহরণটি চাই। সুতরাং ঔপন্যাসিকবৃন্দ যেখানে তথ্যের অভাব বোধ করেছেন সেখানে কল্পনার খাদ মিশিয়েছেন। সে কল্পনা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অনুসরণে পরিবেশিত। আরও একটি কথা রাখালদাস হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুখ্যত ঐতিহাসিক। কিন্তু রসদৃষ্টি ছিল বলেই এঁরা ইতিহাসের সঙ্গে

উপন্যাসকে মিলিয়ে ফেলেন নি। দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং রচনাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এঁরা অবহিত ছিলেন। এই কারণে এঁদের উপন্যাসগুলিতে এক দিকে ইতিহাস অনুগতির নৈপুণ্য সুস্পষ্ট অন্য দিকে রসসৃষ্টিরও অনপেক্ষিত প্রকাশ পরমরণীয়তা লাভ করেছে।

৬

(এই-সব উপন্যাসে রোমান্সের প্রাচুর্য। এই রোমান্স রস পরিবেশন করা হয়েছে নানাভাবে। প্রথম মোগলহারেমের রহস্য উদ্ঘাটনে, দ্বিতীয় নানা অলৌকিক সাধুসন্ন্যাসীর কার্যাবলীর মধ্যে, তৃতীয় কোনো একটি নারীর প্রহেলিকাময় কার্যে, চতুর্থ স্বদেশ উদ্দীপনাতে, পঞ্চম নায়কের বীরোচিত কর্মের উৎসাহ উদ্দীপনায়, ষষ্ঠ নায়ক-নায়িকার রূপবিশ্লেষণে, সপ্তম, অতীতের স্বপ্নময় বর্ণনায়।) এগুলি একে একে বিস্তৃতভাবে বলছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে নূতন রস পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা-তিলোত্তমাকে ঠিক হারেমের মধ্যে পাই না। মতিবিবি এবং নূরজাহানের দ্বন্দ্বে (কপালকুণ্ডলা) নারীর ঈর্ষাফেনিল মানসিকতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। হারেমের অপরিচিত পরিবেশ সেখানে অনুপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণে মোগল হারেমের রহস্য কিছু পরিমাণে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মাধবীকঙ্কণে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল'। এই স্বপ্নালু এবং ঐন্দ্রিজালিক বর্ণনায় রমেশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এক অলৌকিক রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদটিতে। বলা বাহুল্য এ বর্ণনা স্বকপোলকল্পিত। মোগল বাদশাদের কাহিনীই যখন পূর্ণরূপে ইতিহাসে বর্ণিত হয় নি তখন এই জাতীয় বর্ণনায় কল্পনার আশ্রয় স্বাভাবিক। মোগল অন্তঃপুরের খোজা হাবশী, দাসদাসী, প্রহরীর সতর্কতা, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত আবাসগৃহ, অন্তঃপুরের গোলকধাঁধা এ সমস্তই রমেশচন্দ্র অতি সাবধানে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় রমেশচন্দ্রের অনেক আগেই তাঁর পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্ত *The times of Yore*এ (১৮৪৫ ?) রঙ্গমহাল রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন আকবর বাদশাহের নওরোজার উৎসবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু

রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি অন্তঃপুরের চিত্র পরিবেশনে সাহিত্যের ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। হীরামুক্তামাণিক্যের ছটার অন্তরালে কত নির্মম নিষ্ঠুরতা ও ঈর্ষা কুটিলতা চাপা পড়ে আছে ঔপন্যাসিক তারই বর্ণনা করেছেন।

মোগল বিলাস-ঐশ্বর্যের বহিরঙ্গ রূপ লেখকদের গোচরে ছিল। অন্ততপক্ষে তাঁর স্থাপত্যকলা এবং চিত্রকলার সংবাদ ঔপন্যাসিকেরা জানতেন। এরই প্রক্ষেপ করেছেন তাঁরা অন্তঃপুর বর্ণনায়। অন্তরের বিলাসই যে বাইরের রূপবৈভবের কারণ এইটি মনে করেই সম্ভবত ঔপন্যাসিকবৃন্দ মোগল অন্তঃপুরের চিত্র এঁকেছেন। এ কথা বলবার কারণ এই যে এই-সকল লেখকবৃন্দই যখন হিন্দু রাজার অন্তঃপুরের বর্ণনায় মুখর হয়েছেন তখন প্রায়শই শুদ্ধচারিতা, পবিত্রতার বাড়াবাড়ি করেছেন। আসল কথা বাস্তব কোনো তথ্য হাতে না থাকাতে লেখকবৃন্দ যথেচ্ছ কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর যা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত, যার কথা আমরা কিছুই জানি না তার সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল এবং আগ্রহ স্বাভাবিক। লেখকবৃন্দও সেই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এজন্যে রমেশচন্দ্র যে পথ খুলে দিলেন সে পথে অনেক কবিযশপ্রার্থী প্রবেশ করে নিজের নিজের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ছিল না। ফলে রমেশচন্দ্রের সংযম, ঔচিত্যবোধকে এঁরা ধূলিসাৎ করে দিলেন। এর চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে। তাঁর 'রঙ্গমহাল রহস্য' এক কালে 'Best Seller' ছিল। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে পাঠকদের এই জাতীয় কৌতূহল। হরিসাধনবাবু পর্দার পর পর্দা উঠিয়েছেন, পাঠকের রুদ্ধনিঃশ্বাস চরমে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের কথা স্মরণ করি। যে দিব্যরূপিণীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়। এই কবিত্বের আবরণ উন্মোচন করলে দেখা যাবে যে বাদশাহজাদীর অচরিতার্থ কামনা পাষাণফলকে রক্তের স্বাক্ষরে দীপ্যমান। কবি যা করেছেন, ঔপন্যাসিকেরা তাই ফেনিয়ে ফেনিয়ে, তরল করে পরিবেশন করেছেন। অন্তঃপুরিকাদের রূপ, ঐশ্বর্য, ধন দৌলত, বংশমর্যাদা সবই ছিল কিন্তু আভিজাত্যের আড়ালে এদের মর্মরহস্য অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গিয়েছিল। মানবমনের বিচিত্রগতির অন্তরের বাসনা-কামনাকে প্রক্ষিপ্ত করেছেন লেখকরা এই নায়িকাদের মধ্যে। বর্ণনায়

বিশেষত্ব নেই, সবই প্রায় একরঙা। এবং তরলিত হয়ে সে বর্ণনা প্রায়ই ফিকে এবং একঘেয়েমির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে ঔপন্যাসিকেরা খোজা প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নারীহৃদয়ের মূকবাণীকে মুখর করে তুলেছেন। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রচুর। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের সংযম এবং নিষ্ঠা পরবর্তীকালের লেখকদের অনায়ত্ত ছিল। তাই তাঁরা যা দিয়েছেন তা রোমান্সের তরল বর্ণনা, যা প্রায়ই আতিশয্য দোষে দুষ্ট। অতিকথনের চাপে হৃদয়রহস্য অনুদ্ঘাটিত থেকে গেছে। আরও একটি কথা, ইংরেজি অনুবাদের হিড়িকও এই সময়ে খুব দেখা যায়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে রেনল্ডসের অনুবাদ বার হতে থাকে। হরিচরণ রায়ের অনুবাদ লণ্ডন-রহস্য (১৮৭১) এবং ফকিরচাঁদ বসুর উজীরপুত্র (১৮৭২-৭৬) সে সময়ে বেশ নাম কিনেছিল। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হরিদাসের গুপ্তকথা বা আমার গুপ্তকথা (১৮৭২-৭৩) সে যুগের জনপ্রিয় গ্রন্থ।[১] বলা বাহুল্য রেনল্ডসের এই-সব বইয়ের প্রভাব তদানীন্তন পাঠক সমাজে সর্বাধিক ছিল। গল্পখোর পাঠকদের দাবি মেটানোর পক্ষে রেনল্ডসের জুড়ি ছিল না। রেনল্ডস অন্তঃপুরের রহস্য উদ্ঘাটন, নানা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা, প্রেমোপাখ্যানে ভাবালুতার স্পর্শ দিয়ে উপন্যাসকে জমকালো করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাঙালি ঔপন্যাসিকবৃন্দও সে পথ অনুসরণ করলেন। ঐতিহাসিক কাহিনী গঠনে স্কটের চেয়ে রেনল্ডসই যে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দহ নেই।

সাধুসন্ন্যাসীর ভূমিকা ঐতিহাসিক উপন্যাসের অপর বিশেষত্ব। এই সাধু সন্ন্যাসীদের কোথাও সক্রিয়ভাবে উপন্যাসের ঘটনার স্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে আবার কোথাও নিষ্ক্রিয়ভাবে উপদেষ্টার ভূমিকা অবলম্বন করতে দেখি। বলা বাহুল্য এই বিষয়টিও ঔপন্যাসিকেরা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে। বঙ্কিমের পূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় উপাখ্যানে রামদাস স্বামীর সাক্ষাৎ পাই। রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, চণ্ডীচরণ সেন,

১ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ। পৃ. ১৭৩-১৭৪

In the eighties and the nineties of the last century, the books of fiction that were most read happend to be the mystery. specially that of Reynolds. P. R. Sen. *Western Influence in Bengali literature.*

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় সকলেই এই সাধু সন্ন্যাসীর কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আবার 'স্বামী'-দের যুদ্ধে যোগদান করতে দেখি। আদর্শ এবং লক্ষ্যে এক হয়ে এই সাধুসন্ন্যাসীরা দেশোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন[২]। দেশোদ্ধার ব্রত অনেক-গুলি উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিককার সকলেরই এই ধারণা ছিল যে এই ব্রতে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকারীদের হাতে থাকত গীতা এবং তাঁরা আনন্দমঠ থেকে তাঁদের দেশচর্যার শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সুতরাং গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের (স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ) প্রভাব এই সমস্ত উপন্যাসে এসে গেছে। আবার নিছক একটি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব দেখাবার জন্যে সাধুসন্ন্যাসীর নানা অলৌকিক কার্যাবলী এই সমস্ত উপন্যাসে বেশ খানিকটা অংশ জুড়েছে। প্রধানত এই সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীর বাসভূমি স্থাপন করা হয়েছে দূরপ্রান্তে— প্রায়শই নদীর ধারে কিংবা কোনো গুপ্ত গুহার সন্নিকটে। এই সমস্ত অঞ্চলের রহস্যময় বর্ণনা এবং প্রাচীন ভারতের পূত আদর্শের (প্রধানত যা বনভূমি এবং নির্জনতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল— এই ধারণার জন্যে) উজ্জ্বল মহিমময় ছবি লেখকবৃন্দ দিয়েছেন। রোমান্সের সুর এসেছে এই অলৌকিকতাকে কেন্দ্র করে। যখন দেখি নায়কের কার্য এই-সকল মহাপুরুষদের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর নির্ভরশীল এমন-কি এই সমস্ত নায়কের ভাগ্য মহাপুরুষ নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে চলেছে তখন বিস্ময়ের উদ্রেক হয় বৈকি। এই সমস্ত নায়কের বিপদবরণ এবং অলৌকিক উপায়ে তা থেকে উদ্ধার একমাত্র মহাপুরুষের সাহায্যেই ঘটেছে। এইটি পাঠ করে পাঠক বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ত। মহাপুরুষদের অসামান্য অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে পাঠকদের পূর্বসংস্কার নিশ্চিন্ত হত। মহাপুরুষরা ছিলেন সর্বত্রগামী; রাজা, মহারাজা এবং দেশের পথ-প্রদর্শক। এঁদের অতীত জীবন রহস্যাবৃত সেই কারণে এঁদের সম্বন্ধে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা বেশি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে এই জাতীয় চরিত্র উপন্যাসে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি এনে দিয়েছে। কোথাও ঘটনার স্বাভাবিক

২ চন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বভারতী পত্রিকা

পরিণতিতে বাধাস্বরূপ হয়ে, কোথাও তত্ত্বের জটিল এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে উপন্যাসগুলিকে তাদের মূল ধর্ম হতে বিচ্যুত করতে দায়ী হয়েছে। স্বর্ণ-কুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' একটি ভালো উপন্যাস। কিন্তু হরিতাচার্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা, হিন্দুধর্মের মর্ম উদ্‌ঘাটন উপন্যাসের পক্ষে একান্তই অসঙ্গত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ত্রয়ী' উপন্যাসে এই ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। গীতা থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। লেখকবৃন্দের আদর্শ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু এঁদের কারুরই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তি ছিল না। সুতরাং গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে এঁরা প্রায়ই বিপথগামী হয়েছেন। আমরা বড়ো বড়ো বীরের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা, উত্তাপ এবং উত্তেজনায় মুগ্ধ হই কিন্তু যখন বুঝি যে এ-সকলেরই মূলে রয়েছে মহাপুরুষের শিষ্যত্বের মহিমা তখন সবকিছুই যেন শূন্য বোধ হয়। মঙ্গলকাব্যের নায়কের পশ্চাতে যেমন দেবতা এঁদেরও পশ্চাতে তেমনি গুরুর অলৌকিক মহিমা। (এই প্রেক্ষাপট উপন্যাসের বর্ণনাকে উজ্জ্বল করে নি বরং কায়াকে ছায়া রূপে প্রতিভাসিত করেছে।) লোকালয় থেকে দূরে ফলমূলাহারী এই সাধুসন্ন্যাসীদের যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জ্যোতিষগণনার আশ্চর্য ফল লক্ষ্য করি শোভাসিংহের মতো বীর, সমশের গাজীর মতো যোদ্ধার, অমর সিংহের মতো বিদ্রোহী নায়কের উপর।

চমকপ্রদ ঘটনা কিংবা অঘটনঘটনপটিয়সী নারীর প্রহেলিকাময় কার্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখতে হবে এরা বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা নয়। হীরার বাস্তবভিত্তি সন্দেহাতীত। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রহেলিকাময়ী এই সমস্ত নারীচরিত্রের কোনো বাস্তবভিত্তি নেই। মনে হয় এই জাতীয় চরিত্রের উৎসস্থল রমেশচন্দ্র দত্তের মাধবীকঙ্কণের জেলেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিমলাতে এর পূর্বাভাস। জেলেখার বাঙালি বীরের প্রতি সহানুভূতি, প্রেম— অবাস্তব ও বাস্তবতার মাঝামাঝি। জেলেখার পূর্ব পরিচয় অজ্ঞাত। পাঠক তার জন্যে বিশেষ কৌতূহলীও নয়। কেবল নারীশক্তির অসামান্য কার্যের দ্রষ্টা ও সাক্ষী হয়েই তার তৃপ্তি। এই সমস্ত নারীরা কখনও পুরুষ বেশে, কখনও ছদ্মবেশে দেখা দেন। দিনে ও রাত্রে এদের সমান গতি-বিধি। কখনও মিত্রশিবিরে কখনও শত্রুশিবিরে— সর্বত্র এদের চলাচল। নায়কের প্রতি ভালোবাসা অথবা সহানুভূতি এদের এই কার্যাবলীর মূল উৎস। আবার অনেক সময়ে দেখা যায় কোনো অচরিতার্থ প্রেমের প্রতিহিংসা মেটাবার জন্যে,

কিংবা কোনো মহাপুরুষ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এরা উপন্যাসে বেশ বড়ো জায়গা জুড়ে বসেন। অনেক লেখকের বর্ণনার মধ্যে এমনও একটা আভাস থাকে যে এই সমস্ত নারী যেন নায়কের নিয়ন্ত্রীশক্তি— ভাগ্যবিধাতা। ভারতীয় বিশ্বাস অনুযায়ী নারীর দুই শক্তি— কল্যাণময়ী এবং ভয়ংকরী। যেহেতু ঔপন্যাসিকবৃন্দ প্রায়ই উপন্যাসে ধর্মবোধ প্রকাশ করেছেন সেই হেতু এটা অবিশ্বাস্য নয় যে নায়ক-নায়িকা অঙ্কনেও এঁরা কতকটা সেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন। ফলে নারীর কল্যাণময়ী এবং 'ঘোরা'রূপ উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি। যে সমস্ত নারীদের কথা বলা হচ্ছে এরা সকলেই ভয়ংকরী মূর্তির আকার ধারণ করেছে। নৃমুণ্ডমালিনী, খর্পরধারিণীর প্রতিভাস এদের চরিত্রে। কিন্তু তন্ত্রোক্ত মূর্তির যথার্থ স্থান তন্ত্রে— আখ্যায়িকায় তাদের প্রবেশ নিশ্চয়ই অন্যরূপে হওয়া প্রয়োজন। দেখা যাবে এই-সব চরিত্র অল্প-বিস্তর হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো আচরণ করে, কিঞ্চিৎ নিউরোটিক, এরা ভানুমতীর সগোত্র। এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিচয় নেই। স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এরা লেখকের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রমাত্ররূপে পর্যবসিত। আগে বলেছি ভারতীয় দৃষ্টি অনুযায়ী এই-সব নারীচরিত্র পরিকল্পিত। এই-সব চরিত্রের অবতারণার সার্থকতা কি? এর কারণ বলেছি। কিন্তু অপর এবং মুখ্য কারণ রোমান্সরসের পরিবেশন। রোমান্স সম্বন্ধে লেখকবৃন্দের কতকগুলি নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। যেমন আকস্মিকতা, চমকসৃষ্টি, অলৌকিক কিংবা অতিলৌকিক ঘটনার অবতারণা। স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না এমন ঘটনার মধ্যে বাস্তবতা নেই। পাঠকের বিস্ময়ও সেখানে। এই ধারণায় লেখকবৃন্দ এই সমস্ত নারীচরিত্র কল্পনা করেছেন। শক্তিতে সাহসে কৌশলে এরা অদ্বিতীয়। এদের অন্তরের কামনা অস্বাভাবিক, জিঘাংসা অতিলৌকিক। ফলে মানবচরিত্রের ধরাবাঁধা নিয়মে এদের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় নি। এই-সব ভূমিকায় রোমান্সের দীপ্তিই মুখ্য বস্তু। উত্তেজনা বিস্তার, কোলাহলসৃষ্টি (যা লোকালয়ের নয়— দূরের) এইগুলিই লেখকদের অবলম্বন ছিল।

(বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রেমের উপাখ্যানের প্রাচুর্য।) রাজ-রাজড়ার প্রেমোপাখ্যানে রাজকীয় সমাবেশের মধ্যে যে কটি লক্ষণ দেখি তার মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই। অ্যান্টনি এবং ক্লিওপেট্রার প্রেম হয়তো ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল। স্কটের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের আদর্শ তো ছিলই। (রাজা বাদশা কোনো সাধারণ নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে

রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন কিংবা নারী যে বীরভোগ্যা এইটি প্রমাণ করার জন্যে রাজা বাদশা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।) 'শাশ্বত ত্রয়ী'র (Eternal triangle) দ্বন্দ্বও অনেকগুলি উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। এই ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব স্বভাবতই বহিরঙ্গ। বাধাবিপত্তি বাইরে থেকেই এসেছে। (প্রণয়ীর ক্রোধ, জিঘাংসা, ক্রূরতা উপন্যাসগুলিতে বিস্তৃত করা হয়েছে। ইতিহাসের তথ্য যাই হোক অনেক রাজ্যপতনের জন্যে লেখকেরা দায়ী করেছেন প্রেমের অস্বাভাবিক পরিণতিকে।) যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শোভাসিংহ সুপরিচিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁরও পতনের কারণ বর্ধমানের রাজকুমারী। যথাস্থানে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি।

এখন, লেখকদের এই বিশেষ ধারণার কারণ কি? বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাস এই-সকল ঔপন্যাসিকদের আদর্শ ছিল। সীতারাম বীর, যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। কিন্তু এই-সকল গুণই পদ্মপত্রে জলের মতো ক্ষণস্থায়ী হয়েছে সীতারামের প্রবল ভাবাবেগের কাছে। অপ্রাপণীয়া শ্রীকে করায়ত্ত করবার জন্যে সীতারাম রাজকার্য ভুলেছিলেন, যতবার শ্রী তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ততবার সীতারামের তৃষ্ণা বাহুবিস্তার করেছে। একচক্ষু হরিণের মতো সীতারামের লক্ষ্য কেবল স্ত্রীর উপর ন্যস্ত ছিল। সেজন্যে রাজ্যস্থাপনের মহতী আশা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। মনে হয় সীতারামের এই পতন বাঙালিকে খুব একটা নাড়া দিয়েছিল। দেশোদ্ধার ব্রতে, স্বদেশচর্চায় নারীপ্রেমের স্থান গৌণ— এইটিই তখনকার শিক্ষা। যা গৌণ তাকে মুখ্যরূপে বিবেচনা করার জন্যেই সীতারামের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা অন্যান্য ঔপন্যাসিকেরা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এঁদের উপন্যাসগুলিতে রাজ্যের পতনের কারণ দেখি নারীপ্রেম। নিষ্কামধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে যে-কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষার ধ্বংস অনিবার্য। প্রেমের একটা ধ্রুব আদর্শ আমাদের লেখকদের সামনে ছিল। তার বিচ্যুতি যেখানে ঘটবে সেখানেই আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে প্রণয়ীর চিত্ত 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু'। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে প্রেম-উপাখ্যানেরও এইটি ধুয়া। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালাপাহাড়ের সর্বনাশা নীতির মূলে নারীর প্রেম। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে রাজার

পাহাড়ীদের আশ্রিত নারীর জন্যে লালসা রাজ্যপতনের কারণ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণা, অসীম, ধ্রুবা, ময়ূখ— এই সমস্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রেমের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রেম যে অন্ধ, সে যে মানুষকে কর্তব্যচ্যুত করে রাখালদাসের বর্ণনায় তারই পরিচয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাঞ্চনমালায় নারীর প্রেমের বিকৃতরূপ চিত্রিত করেছেন। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যাঁরা সে যুগে কিছু প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তাঁদের উপন্যাসের লক্ষণগুলি থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি প্রেমসর্বস্ব। এবং তাঁর উপন্যাসগুলির রসও শৃঙ্গার আবার এরই আবর্তে রাষ্ট্রযন্ত্র বিঘূর্ণিত। ত্রিকোণ প্রেমের আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো পুরুষের প্রতি দুটি নারীর আসক্তি যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে একটি নারী সহজ, সাদাসিধে সরল। অপরজন জটিল, ক্রুর এবং স্বার্থপর। দুটি নারীর প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বমুখর চিত্র এবং ঈর্ষাক্ষুব্ধ মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিকবৃন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা-তিলোত্তমার প্রতিরূপও পাই অনেকগুলি উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে নয় অনেক সময়েই ঐতিহাসিকতাকে অগ্রাহ্য করে এই-সব প্রেমকাহিনী বিস্তৃত অংশ জুড়েছে। এমন-কি রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণেও একই পন্থা অনুসৃত হতে দেখি। আসলে ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে সূত্ররূপে ধরে ঔপন্যাসিকেরা এই সমস্ত প্রেমকাহিনীকেই আশ্রয় করেছিলেন বেশি। এমন-কি সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা চিত্তবিনোদিনী, ঝান্‌সীর রানী, বিজয়, অমরসিংহ ইত্যাদি উপন্যাসে প্রেমকাহিনী বাদ যায় নি। প্রেমোপাখ্যানের অনুপ্রবেশে আপত্তি করবার কিছুই থাকত না যদি এই-সব কাহিনী ইতিহাসের জড়স্তূপে প্রাণ সঞ্চার করতে পারত, কিংবা ইতিহাসের ফাঁক পূরণে সাহায্য করত। দেখা যাবে ঔপন্যাসিকবৃন্দ সেদিক দিয়ে চিন্তাও করেন নি। ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। এই প্রসঙ্গে রাখালদাসের উপন্যাসগুলি স্মরণ করতে পারি। তিনি ইতিহাসের ফাঁক পূরণে সাহায্য করতে পারে এমন প্রেমোপাখ্যানেরই সাহায্য নিয়েছেন। অন্ততঃ মূল তথ্যের বিরোধিতা না করে এমন প্রেমকাহিনীই সন্নিবেশ করেছেন। সকল ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না চললেও কারও কারও গল্পরচনার কৌশল সম্বন্ধে Disrailiর এই মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে।—

Take a pair of pistols a pack of cards, a cookery book and a set of new quadrilles, mix them up with half an intrigue and a whole marriage, and divide them into three equal parts.১

আসল কথা (রোমান্স সৃষ্টি করাই এঁদের উদ্দেশ্য ছিল।) তুলনামূলক আলোচনার জন্যে নবীনচন্দ্র সেনের কথা তুলতে পারি। তিনি মহাকাব্য রচনা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর 'ত্রয়ী' কাব্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সে যুগে প্রশংসা পেয়েছিল। খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নবীনচন্দ্রের কাব্য আসলে Metrical Romance। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নবীনচন্দ্র অনেকগুলি প্রেমোপাখ্যান সন্নিবেশ করেছেন। এই সমস্ত প্রেমোপাখ্যানের বর্ণনার তরী বেয়ে কবি তীরে পৌঁছেছেন। সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে যা পাই তাতে প্রেমকাহিনীর প্রাচুর্য লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য এক জাতীয় কাহিনী-কাব্যেও এই জাতীয় বস্তু উপেক্ষিত হয় নি। ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যের (purpose) আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না করেও বলা চলতে পারে যে এঁরাও অনেক সময়ে মূল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে অবান্তর প্রেমকাহিনী বর্ণনায় শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এমন-কি কঠোর শোনালেও এ কথা সত্য যে অনেক সময়ে এঁরা দিক্‌ভ্রষ্টও হয়েছেন। রামপাল উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নবীনচন্দ্রের মতোই ঔপন্যাসিকবৃন্দ উপকাহিনী বর্ণনায় উল্লাস বোধ করেছেন, আনন্দ পেয়েছেন এবং পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। সাহিত্যের নানা বিভাগে এই ব্যাপার চলছিল। নাটকে, বর্ণনাত্মক ঐতিহাসিক কাব্যগুলিতেও এই রোমান্সসৃষ্টির প্রচেষ্টা। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম নাটক' (১৮৭৪) ; 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' নাটক (১৮৭৫) 'অশ্রুমতী নাটক' (১৮৭৯) 'স্বপ্নময়ী নাটক' (১৮৮২) ইত্যাদিতে ঐলবিলা-অম্বালিকা এবং পুরু-তক্ষশীল, সরোজিনী-রোষেনারা এবং বিজয়সিংহ-রণবীর সিংহ, অশ্রুমতী-মলিনা এবং সেলিম-ফরিদ খাঁ-পৃথ্বীরাজ, শুভসিংহ-সত্যবতীর প্রেমকাহিনী বেশ বড়ো অংশ জুড়েছে। সহজেই অনুমেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে রোমান্সের রস পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে জোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে এই-সকল কাহিনীর সমাবেশ সত্ত্বেও কোথাও সাহিত্যের ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে নি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো

১ *The Young duke*

২ C. M. Bowra, *From Virgil to Milton.*

শক্তিশালী সকলে ছিলেন না। অক্ষম নাট্যকারদের হাতে পড়ে এই প্রেমকাহিনী রোমান্সের জলাভূমি সৃষ্টি করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই রোমান্সের জলাভূমি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা না বললে অন্যায় হবে যে এই রোমান্স সর্বত্র উপন্যাসকে নষ্ট করে নি। রমেশচন্দ্র, শচীশচন্দ্র, রাখালদাস ইত্যাদি লেখকের হাতে রোমান্টিক উপন্যাস এক নূতন রূপ লাভ করেছে। ভাবালু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিচিত স্নিগ্ধ প্রেমের ছবি দুর্লভ নয়।

এখানে একটা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ বলে নিই। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ঘটনাসংস্থান অনেক ক্ষেত্রে বাংলার বাইরে ঘটেছে। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে অবাঙালি চরিত্র অনেক সময়েই বাংলাদেশের বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। এমন-কি বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার মধ্যেও অবাঙালিসুলভ আচরণ প্রত্যাশিত নয়। ফলে প্রেমকাহিনীতেও এই বাঙালি জীবনের ছবি প্রত্যক্ষগোচর। রোমান্সের অতি গাঢ়প্রলেপ সত্ত্বেও এদের বাঙালিত্ব মুছে যায় নি। বাঙালি পাঠক এই-সব প্রেমের উত্থানপতনে ঘরের কথাকেই বড়ো করে অনুভব করেছে।

রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে স্বদেশচর্চার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। নারীগণের উৎসাহবাক্য যোদ্ধাদের উত্তেজিত করেছিল, প্রবল হতাশার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিল 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়' গানে। নবীনচন্দ্র 'পলাশির যুদ্ধে' নূতন করে বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন মীরমদন ও মোহনলালের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাকেই বিস্তৃত করেছেন। একে আরও এগিয়ে দিয়েছেন ভারতী-সাধনা পত্রিকার লেখকবৃন্দ। দেশমাতৃকার সেবায় তখন পর্যন্ত রাজনীতির কুটিল শর নিক্ষিপ্ত হয় নি। দেশ বলতে প্রধানত একটা Ideaকেই বিশেষ করে বোঝাত। এবং দেশসেবা ছিল জীবনের অন্যতম আচরণীয় আদর্শ। এই আদর্শের জন্যে মৃত্যুবরণ গৌরবের বিষয় ছিল। রাজপুত ইতিহাসে তার পরিচয় পেয়েছি। রাজপুত ইতিহাস যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছিল তার মুখ্য কারণ এখানে। একটা মহৎ ও উচ্চ আদর্শের জন্য সংগ্রামী কোনো বীরচরিত্রকে পরিচিত জগৎ থেকে অন্য জগতে স্থাপন করে। প্রাত্যহিকতা বা দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ গ্লানি সেই চরিত্রকে স্পর্শ করে না। বীরত্ব, শৌর্য সাহসিকতার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা তা এই-সব চরিত্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হত।

রোমান্সের পতাকাস্থানও এইখানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আনন্দমঠের 'স্বামী'-দের কথা স্মরণ করতে পারি। শ্রী চরিত্র হিসেবে এমন কিছু উঁচুদরের নয়, কিন্তু দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রুকে মারবার জন্যে শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি নিশ্চয়ই বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। এ জাতীয় চরিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। হারাণচন্দ্র রক্ষিত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের, উপন্যাসগুলিতে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ পাই। বলা বাহুল্য এই-সব চরিত্র ধীর এবং উদাত্ত বটে কিন্তু ধীরতা এবং উদাত্ত মনোভাব কোথা থেকে এরা সংগ্রহ করেছিলেন তার কোনো পরিচয় উপন্যাসে নেই। কিন্তু সে আলোচনা পরে। রোমান্স সৃষ্টি হয়েছে বড়ো বড়ো বীরের বীরত্ব উন্মাদনায়, যুদ্ধের কোদণ্ডটঙ্কারে, অস্ত্রের শিহরণে। স্কট সম্বন্ধে T. F. Henderson বলেছেন,

> With him, romance was not primarily the romance of love, but the general romance of human lite, of the world and its activites, and, more especially, of the warring, adventurous, and more or less strange and curiosity-provoking past. ২

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেও এ মন্তব্য খাটে (তবে romance of loveএর প্রাচুর্য আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বেশি।) অবশ্য warring and adventurous দৃশ্য অথবা ঘটনাও যথাযোগ্য স্থান পেয়েছে। যুদ্ধের উত্তাপ ও উত্তেজনা বাঙালির স্মৃতিকে নাড়া দিয়েছিল। এককালে অস্ত্রবিদ্যা ছেড়ে শাস্ত্রবিদ্যার প্রতি আত্যন্তিক মোহ বাঙালিকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এ হীনতা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করেছিল। এর প্রমাণ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্য 'ভারত উদ্ধারে' আছে।

রঙ্গলাল পদ্মিনী উপাখ্যান, কাঞ্চীকাবেরী ইত্যাদি গ্রন্থে যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে বাঙালি যুদ্ধোন্মাদনার যথার্থ স্বাদ পায় নি। এমন-কি কাঞ্চীকাবেরী কাব্যে (পুরুষোত্তম দেব কৃত— সপ্তদশ শতাব্দী) যুদ্ধের যে উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে তার স্পর্শও রঙ্গলালে নেই। শস্ত্রবিদ্যার কথা বাঙালি ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং নতুন করে যখন বীরত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষা

১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠ্য, শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড; শ্রীপ্রভাময়ী দেবী, বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য।

২ *The Cambridge History of English Literature*, Vol XII

জাগল তখন তার বর্ণনা তো অতিশয়িত হবেই। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধের দৃশ্যে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত যেখানে যেখানে যুদ্ধের বর্ণনা পেয়েছি সেখানে যুদ্ধের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে নি। ধর্মমঙ্গল কাব্য এদের ব্যতিক্রম। ঘনরাম বলেছিলেন 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ'। দেশচর্চার কথা এখানে বলছি না। রূপরাম, ঘনরাম, মানিকরাম ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের কাব্যে মালঝাঁপ, একাবলী ছন্দে যুদ্ধোন্মাদনা প্রকৃত উত্তাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সে যুদ্ধ পল্লীর প্রতিবেশ অতিক্রম করে নাগরিক সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায় নি। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে, ঢাল মৃগেল মৃদঙ্গ বাজে' ছড়ায় একটা দোলা আছে। সে সুর মিঠে মেজাজের, ঘুমপাড়ানিয়া গানের। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধবর্ণনাও প্রায়শ এই জাতীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালির স্মৃতি থেকে যুদ্ধের উন্মাদনা প্রায় মুছে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দে সে স্মৃতি লুপ্ত।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা যখন যুদ্ধের দৃশ্য বর্ণনা করলেন তখন তাঁদের সামনে ছিল টডের রাজস্থান এবং স্কটের উপন্যাসসমূহ। স্কট যুদ্ধের যে বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন তা কেবল অস্ত্রের বৈচিত্র্য বর্ণনাতেই নিঃশেষিত হয় নি (যদিও সে বর্ণনায়ও স্কটের নৈপুণ্য অসামান্য) কিংবা বীরত্বের যথাযথ চিত্রণেও সে বর্ণনা শেষ হয় নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্কট বিজেতা ও বিজিতের মানসিক উত্থানপতনকে যুদ্ধের দামামাধ্বনির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। এক পক্ষের জয়ের উল্লাস, কোলাহল, তীব্রতার পাশাপাশি বিরাজ করে অপর পক্ষের হতাশা, নৈরাশ্য এবং কারুণ্য। পরাজয়ের অপমান যে দুরপনেয় কলঙ্ক বিজিত পক্ষের সে ধারণা থাকত সদাজাগরূক। অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রা কেবল সৈন্যসমাবেশ নয় কিংবা শিবিরের মিছিলই নয়, তার সঙ্গে মানব-মনের উৎকণ্ঠা ব্যগ্রতাও মিশে যেত। মানব-মনের এই খাঁটি সুরটি স্কটের উপন্যাসে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। নাইটদের যুদ্ধে, কিংবা নর্মান ও আংলোস্যাক্সন দ্বন্দ্বে রোয়েনা-রেবেকার মানসিক বিচলন এ ক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি। আমাদের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা স্কটের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। বিশেষত রমেশচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, রাখালদাস এ বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। রমেশচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনায় মানব-মনের উত্তাপ উত্তেজনার প্রকাশ লক্ষ্য করি। রাখালদাস করুণা উপন্যাসে এবং ধর্মপালে এই খাঁটি সুরটি

ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। স্কন্দগুপ্তের ঐতিহাসিক পরিচয় কতগুলি শিলালেখ থেকে আহৃত। কিন্তু পাষাণের কথাকে রাখালদাস প্রাণবন্ত করেছেন। হূনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধযাত্রাকে প্রকৃত জাতীয় যুদ্ধ (National war) হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। পরাজয়ের মুখেও স্কন্দগুপ্তের দেশের জন্য আত্মবিসর্জন একটা গৌরবের সুরে নিঃশেষিত হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের মহত্ত্ব এবং মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিদেশীর আক্রমণের সম্মুখে স্কন্দগুপ্তের অকুতোভয়তা, নির্ভীকতা বাঙালির কুলটানা জীবনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরণ এনে দিয়েছিল নিশ্চয়ই। স্কটের উপন্যাসের মতো এই-সব উপন্যাসেও বাঙালি উদ্দীপ্ত হয়েছে, অন্তরের সমরতৃষ্ণা মিটিয়েছে। রমেশচন্দ্রের বর্ণনায় রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার করুণ আলেখ্য বেদনাবিধুর আবার মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে নবোদিত সূর্যের ন্যায়ই দীপ্ত এবং উজ্জ্বল। শিবাজীর সংগ্রামে বাঙালি অতীতের ঐতিহ্যকে নতুন করে অনুভব করেছে। যথার্থ রোমান্সের দীপ্তি এবং গৌরব এই-সকল যুদ্ধ-বর্ণনায় পাই। যুদ্ধ বর্ণনায় রূপার্ট ব্রুক এবং উইলফ্রেড আওয়েনের চিন্তা পাশাপাশি এসে ভিড় করেছে এই-সব উপন্যাসে। বায়রণের উচ্ছ্বাস এবং প্রাণোচ্ছলতারও অভাব নেই কোথাও। বুঝতে পারি ইন্দ্রনাথ সমসাময়িক বাঙালি জীবনের কাপুরুষতা দেখে যে খেদ প্রকাশ করেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটেছে এই-সকল ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

এ কথা বলি না যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় বর্ণনে লেখকবৃন্দ সর্বত্র সফল হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের অনুকরণে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছিল। বেশির ভাগ উপন্যাসেই যে যুদ্ধ দৃশ্য পাই তা পুথির পাতার বর্ণনা। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব অনেক উপন্যাসেই ঘটেছে। যে স্মৃতি লুপ্ত, যার কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই তাকে 'সত্য'-বস্তু রূপে প্রকাশ করতে গেলে ক্ষমতার প্রয়োজন। কেবল ক্ষমতাই নয় দিব্যকল্পনার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য সকল ঔপন্যাসিকের কাছে এ দাবি করা যায় না। বস্তুতঃ রামগতি ন্যায়রত্নের ইলছোবা উপন্যাসে যত্নুর যুদ্ধ স্কটের হুবহু অনুকরণ করতে গিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধবর্ণনায় কোনো চমৎকারিত্ব আনতে পারেন নি। যদুনাথ ভট্টাচার্য তো কেবলমাত্র গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে এ-সকল বর্ণনা অতিকথন দোষে দুষ্ট, অনুকরণের

ব্যর্থতায় পর্যবসিত। লেখকবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্রের নাম সুকৌশলে উহ্য রেখেছেন। সুতরাং যুদ্ধের বাস্তবতার স্পর্শও সেখানে পাই নি।

আগে বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র রূপতৃষ্ণার পরিণাম তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসে দেখিয়েছেন। নারীর রূপবর্ণনা বাংলার কাব্য নাটক উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। আয়েষা, তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, শৈবলিনী, দলনী, শ্রী, ইত্যাদি নায়িকার চরিত্র প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিম এদের রূপবর্ণনা করতে ভোলেন নি। বিশিষ্ট নায়িকার রূপবর্ণনাতে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের অনুযায়ী রূপবর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন পরিবেশে বিশিষ্ট। উপন্যাসে বঙ্কিম যে রীতি শুরু করলেন তারই জের চলল বহুকাল ধরে। অবশ্য এ বিষয়ে বঙ্কিমকেই পুরোধারূপে ধরলে অন্যায় হবে। যথার্থ বিচারে বলতে হয় সংস্কৃত কবিগণ নায়িকার রূপবর্ণনায় আত্যন্তিক উল্লাসবোধ করতেন। কালিদাস ভবভূতির মতো কবি ছত্রের পর ছত্রে উপমার পর উপমা সাজিয়ে নায়িকার দেহের প্রতিটি অঙ্গের সৌন্দর্যরূপ আস্বাদন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের এই রীতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও সুলভ। এর ফলে কতকগুলি বাঁধাধরা কৌশল নির্ণীত হল। উপমানের সীমাবদ্ধ গণ্ডী ছাড়িয়ে কাব্যের পরিধিকে বিস্তৃত করবার কোনোও প্রকার উৎসাহ কবিবৃন্দ অনুভব করেন নি। আমাদের ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই সংস্কৃত সাহিত্যে পারঙ্গম। অনেকে সংস্কৃত আখ্যায়িকার ঢঙও অনুকরণ করেছেন। ইলছোবা, বিজয় ইত্যাদির কথা স্বতঃই মনে আসে। রূপবর্ণনায় এই রীতি গতানুগতিক, একঘেয়েমির পর্যায়ে পড়ে। নায়িকার রূপবৈভব অঙ্কনে অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। ঔপন্যাসিকরা হয় তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমার কথা বলেছেন, নচেৎ কুশ্রীতার চরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। অলৌকিক সৌন্দর্যের আধার এই সমস্ত নায়িকাদের মধ্যে যে বাস্তবাতিরিক্ত আর একটি মহত্ব রয়েছে তাকেই প্রকাশ করেছেন লেখকবৃন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী, মহাশ্বেতা পত্রলেখার সৌন্দর্য, আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, উর্বশীর অপার্থিব সৌন্দর্য পাঠককে আবিষ্ট করে। পরিচিত জগৎ থেকে পাঠক অন্য জগতে চলে যায়। এইভাবে

রোমান্সসৃষ্টির প্রয়াস সহজ ছিল। এবং এই সোজা পথ ধরে ঔপন্যাসিকবৃন্দ এগিয়ে গিয়েছেন।

(ঐতিহাসিক উপন্যাসকে উপকথা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি বলে ধরে নিতে পারি। একেবারে বাস্তবসর্বস্ব অথবা কল্পনাসর্বস্ব আখ্যায়িকা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বাস্তবতার কিছু অংশ এবং উপকথার কিছু অংশের সমবায়ে ঐতিহাসিক রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে।) এই রোমান্সরস এসেছে ঘটনাবলি বর্তমানকাল থেকে দূরবর্তীকালে স্থাপন করার জন্যে। অতীতের স্বপ্নময় রাজ্যে পাঠক অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পায়। বর্তমান জগতের বাধানিষেধ, দৈনন্দিন জীবনের শতধাবিচ্ছিন্নতায় পাঠক অস্বস্তিবোধ করে। পাঠক অতীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নয়। পুথিপত্রের এবং ঐতিহাসিক তথ্যের বাইরে তার অতিরিক্ত কোনো জ্ঞান নেই। বাংলা ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে এ কথা বলতে পারি পাঠকের চাইতে তাঁদের জ্ঞানও খুব বেশি ছিল না। কারণ ইতিহাসচর্চার তখন উষাকাল। সুতরাং ইতিহাসের রাজ্যে যখন ঔপন্যাসিকরা আলোক ফেললেন তখন কল্পনা ভিন্ন অন্য কোনো আশ্রয় তাঁদের ছিল না। কল্পনা স্ফীত হতে স্ফীততর হয়েছে। ঔপন্যাসিকবৃন্দ অতীতের জড়স্তূপে প্রাণসঞ্চার করেছেন কল্পনার দ্বারা। কল্পনাসমৃদ্ধ এই-সব রচনা সর্বত্র ভারসাম্য রাখতে পারে নি এ কথা যেমন ঠিক অন্য দিকে এইটিও সত্য যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূসংস্থানই রোমান্টিক। মধ্যযুগীয় আচার বিচার, প্রথা কানুন, রাজারাজড়ার শোভাযাত্রা, বর্ণসমারোহ অনেকগুলি উপন্যাসেই একটা স্বপ্নঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে ধীর বিচার এবং সাবধানতা প্রয়োজন। স্কট এই রোমান্স সৃষ্টি করেছেন তথ্য এবং কল্পনার সাহায্যে। পাছে গল্পটি কেবলমাত্র উপকথায় পরিণত হয় এজন্যে সে যুগের খুঁটিনাটি বস্তুকেও তিনি অবহেলা করেন নি। কিংবদন্তী গ্রহণ করেছেন কিন্তু সে কিংবদন্তী ইতিহাসের কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধিতা না করে সে দিকেও তিনি কড়া নজর রেখেছিলেন। তথাপি স্কট পরিত্রাণ পান নি। ঐতিহাসিকের তিরস্কার তাঁর কপালে জুটেছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সঠিক জবাব দিয়েছেন।[১] আমাদের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকবৃন্দ যেখানে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

সার্থক সেখানে স্কটের সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। শালফুল, ইলছোবা, রণচণ্ডী, বিদ্রোহ ইত্যাদি উপন্যাসগুলির আয়তন খুব বড়ো নয় শেষেরটি ছাড়া। এই-সব উপন্যাসে স্থানীয় কিংবদন্তীকে অবলম্বন করে লেখকরা একটা ঐতিহাসিক ভাবাবহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কেবলমাত্র কতগুলি স্থান-নামের পশ্চাতে যে অতীতের কলরব স্তব্ধ হয়ে আছে তাকেই উদ্ঘাটিত করেছেন এঁরা। অতীতের প্রতি আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত বেশি। রবীন্দ্রনাথের গানে একদিকে পাই 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' অন্য দিকে কবিতাতে পাই 'কথা কও কথা কও হে অনাদি অতীত'। সুতরাং বর্তমান কালের সমস্যা, জিজ্ঞাসা, সমাধান যেমন আমাদের উদ্‌বেজিত করে তেমনি সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়ে তোলে। এই উৎকণ্ঠা, আবেগচঞ্চলতার স্ফূর্তি ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখি। আমাদের মনে হয় এদিক থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকতর শিল্পী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ডঙ্কানিশান' অসমাপ্ত হলেও রাখালদাসের রচনার চাইতেও কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। রাখালদাস যে সময়ে তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেন সে সময়ে প্রাচীন ভারতের কিছু কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি তো ছিলই। তাঁর শশাঙ্ক ধর্মপাল, করুণা, উপন্যাসের দিক থেকে বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে না পারলেও প্রাচীন দুর্গ, সৈন্যসমাবেশ, অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা, দুর্গাধিপতিদের বংশমর্যাদা, সাধারণ নরনারীর বিচিত্র সংলাপ— সব কিছু মিলে মিশে এক অপরূপ বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়েছে। অতীত কেবল আর অতীত থাকে নি, নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। রোমান্স সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে Distance lends enchantment to the view এ কথা রাখালদাসের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে খাটে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অতীতের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। তাজমহলের বিচিত্র সৌন্দর্য, পালযুগের গৌরবময় ইতিহাস, রোটাস দুর্গের ঐশ্বর্য, গুপ্ত আমলের কথা আমরা ইতিহাসে পেয়েছি। এই তথ্য বিবৃতিতে আমাদের মন প্রসন্ন হতে চায় না। এর মধ্যে অনেক কিছুই আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের সামগ্রী প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনগুলির মূকবাণী উদ্ধারের জন্যে উল্লাসবোধ করেছিলেন। অশোকের অনুশাসনের পশ্চাতে একটি মানব-মনের বিচিত্র ধারণা, ধ্যান ছিল। সেই মানুষটির অন্তরপরিচয় লাভে পাঠক উল্লসিত হয়ে ওঠে।

অতীতের লুপ্তবস্তু আর উদ্ধার হবে না, তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এই বেদনা রোমান্সরস উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করে।[১] ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের কাছে ছোটো ছোটো তথ্যগুলি পরম আদরের বস্তু। এই তথ্যকে অতিক্রম করে তিনি আরও গভীরে চলে যান। যেখানে পরিবর্তমান মানবজীবনের চঞ্চল প্রতিবিম্ব লক্ষ্যগোচর হয়। তিনিও মানবজীবনের সেই রহস্যের জন্যে উৎকণ্ঠা অনুভব করেন। তিনি বেদনা কল্পনা দিয়ে রঙে রসে মানুষ গড়ে তোলেন। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা বাস্তব জীবন থেকে পলায়ন করেন নি, অতীত সম্বন্ধে তাঁদের যে বিস্ময়বোধ জেগেছিল তাকেই প্রকাশ করেছেন।

৭

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতারা ইতিহাসের ইঙ্গিতও উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। ইতিহাসের উৎপত্তি জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে। জ্ঞান আহরণ আমাদের জীবনের অন্যতম আচরণীয় বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যে জ্ঞান নীতিশিক্ষা ইত্যাদির জন্যে অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে ইতিহাস পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল। (বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়) আজীবন শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন। সুতরাং তিনি যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে স্পষ্টত উপদেষ্টার ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।[২] উপন্যাসের উৎপত্তি ভাবের ক্ষেত্র থেকে। স্বভাবতই উপন্যাসে উপদেশ নীতির স্থান গৌণ। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। (ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূমিকায় বলেছেন গল্পচ্ছলে ইতিহাস

১. But most of all, the reason why we love the ruins of an abbey' and preserve the flags that are riddles with the bullets of waterloo—the reason why we prize the books in the margins of which Coleridge himself scribbled pencil-notes of literary criticism, and keep a lock of Keats hair, is that those things are like stray flowers that cheat the scythe, or like the last stars that outdare the morning sun; they are the few things that are saved from ship-wreck. The work of a historian is to reconstruct the past out of the debris that is cast up by the sea from the wrecks of countless ages. H. Butterfield. *The historical novel.*

২. The knowledge of past events is the sovereign corrective of human nature. A. J. Toynbee 'Polybius of Megapolis', *Greek Historical Thought.*

শিক্ষা দেওয়াই তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই ইতিহাস শিক্ষার স্বরূপটি কি? প্রথমত দেশের বড়ো বড়ো বীরচরিত্রের কাহিনী বর্ণনা করে পাঠকচিত্তকে উদ্‌বোধিত করা। কাল্পনিক কাহিনীতে সে কাজ হয় না। শিবাজী, রাজপুতবৃন্দের কাহিনী এ কারণে ঔপন্যাসিকবৃন্দ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপার বঙ্কিম-রমেশের মধ্যে ক্ষীণ। দ্বিতীয়ত এই-সব ঐতিহাসিক উপন্যাসই ইতিহাসপাঠে আগ্রহ এনে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক Ranke বলেছিলেন যে তিনি স্কটের *Quentin Durward* পড়েই সত্যকাহিনী উদ্ধারে ব্রতী হন। কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাস যখন লেখা হতে লাগল তখনও সার্থক ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে নি। তবে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, এ কথা আগে বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং সাধারণ পাঠকের যখন ইতিহাসবোধ জাগ্রত হয়েছে তখন তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে ঐতিহাসিক কাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে এঁরা ইতিহাস পঠনপাঠনে তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে দেন। বিদেশীর রচিত ইতিহাস অনেক সময়েই প্রকৃত ইতিহাস হয় না। তাঁদের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়। ঔপন্যাসিকবৃন্দ সম্ভাব্য সত্যটিকে প্রকাশ করে ঐতিহাসিকের মনে প্রেরণা জন্মাতে সাহায্য করেছেন। আবার এমনও দেখা গেছে পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে প্রকৃত সত্যনিরূপণে ঐতিহাসিক উপন্যাস সহায়তা করেছে। যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাটে। তৃতীয়ত এক ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্পষ্টত ইতিহাসের গতিচক্রের, নিয়মশৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্র একটা নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মের অধীনে অতীতের ঘটনা সংস্থাপিত। সুতরাং পরবর্তীকালের ঘটনাও সেই নিয়মে চলবে এই ইঙ্গিত কোনো কোনো ঔপন্যাসিক করেছেন। পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের ধারাটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার বাসনা অনেক লেখকের মনে ছিল। এজন্যে তথ্য সংকলনে এঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদিপর্বে কেউ কেউ অতিরিক্ত তথ্যপ্রীতি দেখিয়েছেন। এর কারণ এঁরা উপন্যাসের নামে ইতিহাস রচনা করেছেন। যেমন করেছেন চণ্ডীচরণ সেন। চতুর্থত, আমাদের দেশের প্রাথমিক ইতিহাস গবেষণায় যে বস্তু আহৃত হয়েছিল তা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য এবং তাও রাজরাজড়ার কাহিনী-ঘটিত। ফলে ঐতিহাসিক উপন্যাসেও সেই সমস্ত বিষয়ই পাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের যে ইতিহাস তা নিশীথরাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো। ঔপন্যাসিক-বৃন্দ সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সেজন্যে তাঁরা কল্পনাবলে অতীতের দেশকালপাত্রকে জীবন্ত করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা যে সর্বত্র সার্থক হয়েছিলেন এ কথা বলি না। কিন্তু এই প্রচেষ্টাই 'মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত'কে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলি এবং সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাসসমূহ এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সার্থক প্রতিভাবান ঐতিহাসিক আসবার আগেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি। অনেক ক্ষেত্রেই এই-সব উপন্যাসগুলিকে দুটি দাবি মেটাতে হয়েছে। এক দিকে ইতিহাসের অন্য দিকে উপন্যাসের। যেখানে এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে সেখানেই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির আসল সার্থকতা। পঞ্চমত, দেশচর্চার দিকটিকে ঔপন্যাসিকরা ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ দিই—

আজ বঙ্গে কি ঘোর দুরবস্থা উপস্থিত। দশম বর্ষীয়া বালিকা এখন পাশ্চাত্য ধরণে গঠিত ও ইংরেজি লিখন পঠনে যত্নবতী। বোধ হয় এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বঙ্গরমণী এক্ষণে প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া আপন নির্ধন স্বামীর প্রতি কদাচিৎ মাত্র ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্যুত স্বামী সেই প্রকার বিদুষী পরিণীতার পাণিগ্রহণে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন।—পাচক, পাচিকা, দাস, দাসী, বেহারা ভিন্ন পত্নীর একদণ্ড সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার উপায় নাই। সনাতন আর্যধর্মে ভক্তি ও বিশ্বাসহীনা, সেই বিলাস-বিভ্রান্তা বৌ বাবুর গর্ভের সন্তান, যখন ভাবী বঙ্গের আশা ও আশ্রয় স্বরূপ সংসারবক্ষে বিচরণ করিবে, তখন হা জগদীশ, এই সোণার বঙ্গের কি দশা হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

অধুনাতন বালিকা, বাল্যাবস্থা হইতে বিদ্যালয়ে গিয়া পিতামাতার কি উপকার সাধন করে, কিংবা পরিণত বয়সে স্বামীর গৃহে গমন করিয়া কি বিষময় ফল প্রসব করে, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই ভালরূপে অবগত আছেন। নিরপেক্ষ ভাবী দর্শনক্ষম পাঠক নিশ্চয় জানিবেন যে, তদপেক্ষা আমাদের পূর্বকালের বালিকাগণ যে বার, ব্রত উদ্‌যাপন ও শিব পূজার দ্বারা বাল্যকাল অতিবাহিত করিত, তাহাতে শৈশবাবস্থা হইতে চিত্তক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হইত ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের ধর্মোন্নতি দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে থাকিত।[১]

১. চাঁদরাণী

সুতরাং শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, ন্যায়নীতি, সতীত্বের মহৎ আদর্শ সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যকে যথাযথ এবং সুচারুরূপে দেখতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক-বৃন্দ। দেশপ্রেমের এই উচ্চ আদর্শ আজও আমাদের সাড়া জাগাতে পারে। ঔপন্যাসিকদের ধারণার মধ্যে কিছু ভুলচুক থাকতে পারে, সনাতন প্রথাকে আঁকড়ে থাকবার একটা অনমনীয় মনোভাবও দেখা যেতে পারে তথাপি দেশচর্চার এই আন্তরিক সদিচ্ছা আমাদের মুগ্ধ করে। ষষ্ঠত, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রত্যেক লেখকই সাহিত্যকর্মে তাঁদের কর্মচিন্তার ইঙ্গিতও রেখে গিয়েছেন। সমাজজীবন তখন রেনেসাঁসের আলোকে উদ্‌ভাসিত। শিক্ষিত বাঙালি দেশের লুপ্তস্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। ইতিহাস সে কাজ করতে পারে। অভাবে উপন্যাসগুলিই সে কাজ করেছে। সপ্তমত, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকবৃন্দ হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভাবনার কথাটিও চিন্তা করেছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রাখীবন্ধন উৎসবের জোয়ার সাহিত্যকর্মেও এসেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত করে তুলেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের কয়েকটি উপন্যাসে। কেবল তাই নয়, যেখানে ঘটনাটি প্রাচীন ভারতের, সেখানেও দেশের দুর্দিনে সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে প্রকাশ করে লেখকরা সমসাময়িক দাবির পূরণ করেছিলেন। রাজপুত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পরিণাম যে ভয়াবহ এবং শোচনীয় তার উদাহরণ সংগ্রহ করে দিয়ে এঁরা দেশকর্মে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন।

৮

এই সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে সমাজচিত্র বেশি পাই না। এর কারণ কি। সাম্প্রতিক কালে যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস বার হচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তি অপেক্ষা যুগের চিত্রই প্রাধান্য লাভ করছে। ব্যক্তির চাইতে সমাজ যখন বড়ো হয়ে উঠেছে তখন সমাজ এবং যুগের চিত্র প্রাধান্য লাভ করবে তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু ১৮৫৭-১৯৩০ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। সে যুগের ইতিহাসচর্চার মূল সুরও ছিল এইটি। কার্লাইলের বীরপূজার আদর্শ তখন

স্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিই ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাসের বল্‌গা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে। বীরত্বের প্রতি আমাদের উৎকণ্ঠা ও উদ্‌বেগ সে যুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বইগুলির নামেই তার প্রকাশ— রাজসিংহ, শশাঙ্ক, ধর্মপাল, রানী ভবানী, সীতারাম, উদয়সিংহ, ইত্যাদি। সুতরাং বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা যদি সমাজচিত্র সম্পূর্ণরূপে না পাই তবে লেখকসাধারণের উপর দোষ চাপানো যায় না। মোটামুটিভাবে সে যুগের পরিবেশ রচনা করে ঐতিহাসিক নায়কের উপরেই তাঁরা তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এইটি উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ আদর্শের পরিণামী ফল।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত

শশিচন্দ্র দত্ত

শশিচন্দ্র (১৮২৪-১৮৯১) রামবাগানের দত্ত পরিবারের একজন খ্যাতিমান লেখক। হিন্দুকলেজের ছাত্রী হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত এবং শশিচন্দ্র উভয়েই রিচার্ডসনের ছাত্র। রিচার্ডসনের শিক্ষার ফলে স্বভাবতই এঁদের পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। উনিশ শতকের পঞ্চম দশকেই শশিচন্দ্রের ইংরেজি রচনা ইংরেজ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। *Blackwaod Magazine*এ শশিচন্দ্রের লেখার প্রশংশিত সমালোচনাও হয়েছিল। শশিচন্দ্রের ইতিহাস-নিষ্ঠা সেযুগের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নয়। তাঁর রচনা অধিকাংশই ইতিহাস এবং ইতিহাসাশ্রিত গল্প কবিতা। উল্লেখযোগ্য রচনায় মধ্যে *Shunkur : A Tale of the Indian Mutiny of 1857* এক দিক থেকে স্মরণীয়। কেননা এ রচনা সরকারী মহলেও আলোড়ন এনেছিল। শশিচন্দ্র দত্তের *The Times of Yore ; or, Tales from Indian History* মোট ২৪টি ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন। এ গল্পগুলি টডের রাজস্থান এবং অন্য ইতিহাস বই থেকেও সংকলিত হয়েছে। বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছিল উপন্যাস মালা (১৮৭৭) নামে। উপন্যাস মালার ভূমিকা থেকে জানতে পারি প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বে তিনি *The Times of Yore* গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে জানি বইটি শশিচন্দ্রের *'earliest writings'*. শশিচন্দ্রের *The times of Yore* যে বইটি পাওয়া গেছে তার প্রকাশকাল ১৮৬৪।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালির জীবনে যে আলোড়ন এসেছিল, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যজগতেই তার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। বলা বাহুল্য এ আলোড়নের অন্যতম ফলশ্রুতি স্বদেশপ্রীতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রথমেই ইতিহাস-বিদ্যার অনুশীলনে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসবিদ্যার যথার্থ অনুশীলন

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে আরম্ভ হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে এবং কতিপয় দেশীয় মনীষীর প্রচেষ্টায় যে সমস্ত বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস বই প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে (উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকেই ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটে।) এই সম্বন্ধে *Society for the Acquisition of Knowledge* অথবা জ্ঞানোপার্জিকা সভার কার্যবিবরণী উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষের ইতিহাস এই সভাতেই সম্ভবত প্রথম পঠিত হয়।

শশিচন্দ্রের কৃতিত্ব এই দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয়। তিনি যে ঐতিহাসিক গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলি ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির দিকে নজর রেখে। শশিচন্দ্র গ্রন্থের আভাসটি পেয়েছিলেন ইংরেজ কবি টমাস চ্যাটার্টন (১৭৫২-১৭৭০) এর *The Storie of William Canynge* কবিতার এই ছত্র থেকে

Straight was I carried back to times of Yore
Whilst Canynge swathed yet in fleshy bed.

লক্ষণীয়, ইতিবৃত্ত চ্যাটার্টনেরও প্রিয় ছিল। বিশেষ করে নাইট, যাজকদের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। পঞ্চদশ শতকের যাজককবির রোমান্স নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন চ্যাটার্টন। বলা বাহুল্য শশিচন্দ্র চ্যাটার্টনের সঙ্গে একটা মানসিক ঐক্য অনুভব করেছিলেন। তিনি *The Times of Yore* এ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ থেকে মোগল আমল পর্যন্ত ইতিহাসের জের টেনেছেন। বইটির ক্রোড়পত্রে আছে—*From the invasion of Alexander The Great, to the battle of Paniput.*

বইটি লেখবার পশ্চাতে যে তার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল এমন মনে হয় না। ইতিহাসচর্চার ফলে ইতিহাসের যে সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে এবং যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা কিছু পরিমাণে গল্পের আকারে বিবৃত হয়েছে তিনি সেগুলিকেই তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। যদিও তাঁর গ্রন্থে প্রায় দুহাজার বছরের ইতিহাস-পাঠের পরিচয় পাওয়া যায় তথাপি এ কথা জোর করে বলা যায় না যে তিনি এর মধ্য দিয়ে কোনো একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এগুলি নেহাৎই গল্পখোর পাঠকের মুখ চেয়ে লেখা। শশিচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে

পনেরোটি কবিতা লিখেছিলেন *Indian Ballads* নাম দিয়ে। বাংলা গাথা-কবিতার ইতিহাসে এই ইংরেজি 'Ballad'গুলির মূল্য স্বীকার করতে হয়।
এবারে গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

রঙ্গমহালের ধ্বংস

শংকরের রাজধানী রঙ্গমহাল। শংকরের কন্যা আর্সি। আর্সি শংকরের এক কর্মচারীর পুত্র বলনাথের প্রণয়ী। তাদের বিবাহের সময় যখন আসন্ন তখন আলেকজাণ্ডার রঙ্গমহাল আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে আর্সিকে আলেকজাণ্ডার উপহার পেলেন। আর্সি পরে আলেকজাণ্ডারকে বিষপানে নিহত করেন। শশিচন্দ্র গল্পে অ্যারিস্টটলের নজির তুলে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

ইরাণী বণিক।

পারস্যরাজ তৃতীয় সাপুরের পুত্র বেনসাপুর (ছদ্মবেশী বণিক) হানিফ সেখের পুত্র বনুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে হানিফের বাড়ি ত্যাগ করে মন্দিরে আশ্রয় নিলে। প্রহরী কর্তৃক ধৃত হয়ে রাজদরবারে নীত হলে বেনসাপুর আত্মপরিচয় দিলে। রাজকন্যার সঙ্গে বেনসাপুরের বিবাহ হল। গল্পটি ইউরোপীয় নাইটদের কীর্তিকলাপের কাহিনীর অনুরূপ। বীরত্ব দেখিয়ে রমণীহৃদয় জয় করার ঘটনা নাইটদের জীবনে বহুবার ঘটেছে। এই কাহিনীতেও তার প্রতিরূপ দেখতে পাই। আবার নাইটরা যে নারীর পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ বনুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর মধ্যে তার জের টানা হয়েছে।

গড় বিত্‌লি।

আজমীর রাজ্যের রাজা মানিকরায়ের দুর্গের নাম গড় বিত্‌লি। মানিকরায়ের পুত্র লোত্‌। কালিফ ওমর এই সময়ে রোসন আলিকে ভারতবর্ষ অভিযানে পাঠান। এক ছদ্মবেশী মুসলমান ফকিরের সহায়তায় রোসন মানিকরায় এবং লোত্‌কে পরাজিত করেন। এই ছদ্মবেশী ফকির মল্লিনাথ। লোতের প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লিনাথ প্রণয়ের ব্যর্থতার জন্যই এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ করেছিল। মল্লিনাথ শেষে জানতে পারলেন তার প্রণয়ী মায়া মৃত। তখন মল্লিনাথ অনুতাপে দগ্ধ হলেন। মল্লিনাথ পরে রাজপুত বীরত্ব নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন।

কাহিনীটিতে গল্পরসের জোগান পুরোমাত্রায় আছে। মল্লিনাথের বিশ্বাসঘাতকতার পশ্চাতে যে ব্যক্তিগত আবেগ ঈর্ষা ছিল সেইটি পরিস্ফুট হওয়াতে গল্পটিতে প্রকৃত মানবজীবনের হৃৎস্পন্দনটি অনুভব করা যায়। গল্পটিতে নিছক কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ পাই না— পরিণতিতে মল্লিনাথের হাতে মায়ার চুল আবিষ্কার একটা আকস্মিকতার দ্যোতনা দিয়েছে। গল্পের মোড়ও ফিরেছে এইখানে।

আলোর বিজয়ী বেন কাসিমের বৃত্তান্ত।

আলোররাজ ডাহিরের কন্যা ভবানী কি ভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল তারই বিবরণ এই গল্পটিতে আছে।

এই গল্পটির মতো অনেক গল্প পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যায়। নারীর জিঘাংসা যে অনেক সময় বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটনের জন্যে দায়ী গল্পটিতে তার ইঙ্গিত আছে। ডাহির রাজ্যের বর্ণনায় লেখক তদানীন্তন ঐতিহাসিক পরিবেশটি ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

কনোজ সুন্দরী।

মামুদ ও কনোজরাজ্যের কাহিনী।

গল্পটি বিশেষত্ববর্জিত। চরিত্রগুলিরও কোনো সঙ্গতি নেই। তবে সূচনায় কনোজ নগরীর যে বর্ণনা পাই তা ইতিহাসসম্মত এবং বর্ণনায় চমৎকারিত্বও আছে।

তিরোরির যুদ্ধ।

জয়চাঁদ-পৃথুরায়-সংযুক্তার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাহিনী।

গল্পটির বিশেষত্ব যুদ্ধ বর্ণনা কিংবা চরিত্রসৃষ্টিতে নয়। পৃথু যখন যুদ্ধে যাবার জন্যে প্রস্তুত তখন সংযোগতার (সংযুক্তা) হৃদয়োচ্ছ্বাস যে তীব্র ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল সেইটিই এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ। পৃথু রায়ের পতনের দৃশ্য শশিচন্দ্র বর্ণনা করেন নি। বীরত্বের আদর্শকে স্থাপন করাই যেন শশিচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। গল্পটিতে চাঁদকবির উল্লেখ আছে। সংযোগতার কাব্যরচনার কথা শশিচন্দ্রের কল্পিত বিষয়।

কুতব-উদ্দীন আইবেক, দিল্লীর দাস রাজা।

মহম্মদ ঘোরী ও তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুতবের বিবরণ।

মহম্মদ ঘোরীর শেষ দশা।

মহম্মদ ঘোরীর শেষজীবনের করুণ ইতিহাস গল্পটির উপজীব্য।

বিমাতার উপদ্রব।

আলতামাসের পুত্র নাসীরউদ্দীনের রাজ্যলাভের ইতিবৃত্ত গল্পটির বিষয়।

কেকোবাদের শেষ দশা।

সুলতান কেকোবাদ তাঁর নিজামের কুপরামর্শে রাজ্যে অশান্তি ডেকে আনলেন। ফলে বাংলার শাসনকর্তা গয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র এবং কেকোবাদের পিতা বোখারা খাঁ পুত্রকে নিজামের ষড়যন্ত্রজাল থেকে মুক্ত-করবার জন্মে সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করলেন। পিতাপুত্রের মিলন ঘটল। নিজাম এতে সন্তুষ্ট না হয়ে মুক্তাবাঈ নামে এক রমণীকে কেকোবাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে। মত্তপ ইন্দ্রিয়াসক্ত কেকোবাদ মুক্তাবাঈয়ের রূপে মুগ্ধ হলেন। রামদেব ঠাকুর নামে কেকোবাদের এক প্রিয় অনুচর নিজামকে হত্যা করলে এবং শেষে কেকোবাদকেও নিহত করলে। কেননা রামদেব ঠাকুরের বাগদত্তা ছিল মুক্তাবাঈ।

গল্পটির মধ্যে দুইটি অংশ আছে। এক পিতাপুত্রের মিলন, দুই রামদেব ঠাকুর এবং মুক্তাবাঈ প্রসঙ্গ। শেষেরটি রোমান্টিক। কিন্তু দুটি অংশের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই।

পাপ করিলেই ভুগিতে হয়।

আলাউদ্দীন জালালউদ্দীনকে নৃশংসভাবে নিহত করেন। এই হত্যা-কার্য সাধিত হয় আক্তিয়ার হুর এবং বেন সেলিমের দ্বারা। পরে এই দুই সেনাপতিকে আলাউদ্দীন হত্যা করেন। ইতিহাসের অসংখ্য নিষ্ঠুর কার্যের উদাহরণ হিসেবে এই বিশেষত্ববর্জিত গল্পটি রচিত।

পদ্মিনী উপাখ্যান।

আলাউদ্দীনের রূপতৃষ্ণা এবং রাজপুত সৈন্যদের দৃঢ়তা ও বালক বাদলের বীরত্ব গল্পটিতে বিবৃত।

জাবুয়া অধিকার।

ভীল সর্দার শুকনায়ক ও ধূলিত নিবাসী রাজপুতরাজ চন্দ্রভুবন দেশে ভীষণ অত্যাচার করেছিলেন। এঁদের বাসভূমি ছিল জাবুয়া পর্বত দুর্গে।

ইলা নামে একটি রাজপুতবালার বীরত্ব এবং কৌশলের সাহায্যে এই দুই অত্যাচারী নায়কের পরাজয় ঘটল। ইলার প্রণয়ী কৃষ্ণদাস অবশ্য এই সংগ্রামে সাহায্য করেছিল। ইলার কৃষ্ণদাসের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল।

গল্পটির বাঁধুনি অত্যন্ত শিথিল। তবে ঐতিহাসিক ভাবমণ্ডলটি অক্ষুণ্ণ আছে।

দেবলাদেবী।

আলাউদ্দীনের প্রধানা মহিষী কমলাদেবী। তার কন্যা দেবলাদেবী। কমলার সন্তুষ্টির জন্যে আলাউদ্দীন দেবলাদেবীকে নিজের অন্তঃপুরে আনতে সেনাপতি আলেফ খাঁকে হুকুম দিলেন। দেবলা তার পিতার মনোনীত বর শংকরের হাত থেকে মুক্তির জন্যে দিল্লীর অন্তঃপুরে এলেন। এখানে বিজির খাঁর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

কাহিনীটি নিছক রোমান্স। কয়েকটি কৌতূহলাক্রান্ত দৃশ্য আছে। দেবলা দেবীর আকস্মিক আবির্ভাব সেকালের রীতির অনুবর্তনমাত্র। গল্পের পরিণতিও আরোপিত বলে মনে হয়।

রাজধানী পরিবর্তন।

মুহম্মদ তোগলক একবার দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন করতে চাইলেন। খেয়ালী বাদশার এই দাবি পূরণ করতে অসহায় প্রজাদের দুঃখের অবধি ছিল না। আবদুল্লা এবং জেবিদার দুঃখ কাহিনী সংকলন করে শশিচন্দ্র খেয়ালী রাজার উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

তৈমুরলঙ্গের দয়া।

ইতিহাসে তৈমুর নিষ্ঠুর বর্ণে চিত্রিত। শশিচন্দ্র এহেন নিষ্ঠুর সেনাপতিরও যে দয়া দাক্ষিণ্য থাকতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই গল্পে।

কাহিনীটিতে গল্পরসের অবসর ছিল। কিন্তু শশিচন্দ্র তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। তবে তৈমুরের চরিত্রের প্রচলিত ধারণার বিপরীত ঘটনা প্রতিপাদন করে শশিচন্দ্র অভিনবত্ব আনতে সমর্থ হয়েছেন।

গণনায় সিদ্ধি।

সাধারণ গৃহস্থকন্যা জিনা ভাগ্যের ফলে কি করে বিলোলি নামক সৈন্যকে বিবাহ করে বাদশাহের বেগমে পরিণত হয়েছিল তারই বর্ণনা আছে এ গল্পটিতে।

গল্পটি বৈচিত্র্যহীন। তবে প্রকৃতি বর্ণনাতে লেখকের কৃতিত্ব আছে। এ জাতীয় প্রকৃতিবর্ণনা পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখতে পাই।

মেওয়ারের রাণা সঙ্গ।

রাজপুত দস্যু রাণা সঙ্গকে লালনপালন করেছিলেন। রাণা বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাবরকে উত্যক্ত করে তুললেন। বাবরও সঙ্গকে নিহত করবার উপায় বার করলেন। শীলাদি নামে এক রাজপুতকে হস্তগত করে বাবর সঙ্গকে মারবার উপায়টি জেনে নিলেন। সঙ্গর কর্ণের সহজাত কবচ কুণ্ডলের মতো একটি মখমলের থলি ছিল। শীলাদি একদিন একটি পায়রার সাহায্যে থলিটি অপহৃত করলে। অসহায় সঙ্গ ভীষণ যুদ্ধ করে নিহত হলেন। রাণা সঙ্গ থেকেই রাজপুত গৌরবের প্রতিষ্ঠা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাবরের কাহিনী বিশেষ পাই না। সেই দিক থেকে গল্পটির কথঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করতে হয়।

হুমায়ুনের পলায়ন।

শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হয়ে হুমায়ুনের পলায়ন কাহিনী এবং সেনাপতি তর্দিবেগের বিশ্বাসঘাতকতা ও নিদিম কোকার কন্যা জীদার ও চন্দ্রসেনের প্রণয় গল্পটিতে বিবৃত।

কাহিনীটি ফিরিস্তার বর্ণনানুযায়ী। তর্দিবেগের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিদিম কোকার সহৃদয়তাও ফিরিস্তানুসারী। কিন্তু চন্দ্রসেন জীদা কাহিনী ফিরিস্তায় নেই। কাহিনীটিতে চমৎকারিত্ব আছে।

কি ভয়ানক কাগজ।

মাড়োয়ারের পরাক্রান্ত রাজা মালদেবের ও শের শাহার সংগ্রাম গল্পটির বিষয়। মালদেবের প্রতি শশিচন্দ্রের শ্রদ্ধা ফিরিস্তার বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়—The most potent prince in Hindusthan.

নরোজা।

মোগল বাদশাদের প্রিয় উৎসব ছিল নরোজা। সম্রাট আকবর এই উৎসবটিকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আকবর যখন যুবরাজ তখন প্রতাপের ভ্রাতা শক্তাবতের কন্যা জয়ার অসামান্য রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে তার পাণি-প্রার্থনা করেছিলেন। আকবরের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে জয়া পৃথু রায়কে বিবাহ করেছিল। নরোজা উৎসবে আকবর ছদ্মবেশে জয়াকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছিলেন। জয়ার স্বামী পৃথু রায় নিজের স্বার্থের জন্যে নরোজা

অনুষ্ঠানে পত্নীকে পাঠিয়েছিলেন। সে যাই হোক জয়া আকবরকে উপেক্ষা করল।

কাহিনীটি টডের রাজস্থানের। টড এই ঘটনাটিকে আরও বিস্তৃত করে লিখেছেন। টড এই নরোজা উৎসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির বীরত্ব-গৌরবের দিকটিকে উজ্জ্বল করেছেন। পৃথু রায় আত্ম অবমাননা ভুলতে না পেরে জয়াকে পাঠিয়েছিলেন অপমানের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। নরোজা উৎসবে রাজপুত জাতিকে ব্যঙ্গ করা হত। শশিচন্দ্র নরোজার এই-সব দিককে পরিস্ফুট করেন নি। কেবলমাত্র আকবর-জয়া প্রসঙ্গই তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। শশিচন্দ্র পৃথু রায় চরিত্রটির উপর সুবিচার করেন নি।

শশিচন্দ্র জয়াকে নরোজা উৎসবে পাঠানোর মধ্যে পৃথু রায়ের ব্যক্তিগত স্বার্থটিকেই বড়ো করে দেখেছেন। টড দেখেছেন জাতীয় স্বার্থ। পৃথু সম্বন্ধে টড বলেছেন—was one of the most gallant chieftains of the age, and like the Troubadour princes of the West, could grace a cause with the soul-inspiring effusions of the muse, as well as aid it with his sword. গল্পটির গুরুত্ব আছে। পরবর্তীকালে এই নরোজা উৎসবের কাহিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসে নানাভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

অমরসিংহের দরওরাজা।

সাজাহান ও তাঁর কর্মচারী কোষাধ্যক্ষ সালাকত সাজাহানেরই কর্মচারী অমরসিংহের কন্যা হিরণ্যের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে হিরণ্যকে অপহরণ করতে এলে অমরসিংহ কন্যাকে নিহত করে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন। গল্পটি এই।

বাদশাহের হুকুম তামিল

সাজাহানের সময়ে তাঁর পুত্রদের রাজ্যলাভের জন্য যুদ্ধকাহিনী। গল্পটি বিশেষত্ববর্জিত।

মল্লার রায় হোলকার পাণিপথের যুদ্ধের একদেশ।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের কাহিনী।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) আজীবন শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রবল বাসনা তাঁর ছিল। বিদেশী শিক্ষার আবহাওয়া দেশে এসেছে। বিদেশী সংস্কৃতির পাশাপাশি ভূদেব আর্য সংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপটিও তুলে ধরলেন। ইতিহাসচর্চার প্রতি তাঁর সানুরাগ প্রচেষ্টার কথা বিস্মৃত হবার নয়। তিনি নিজে কতগুলি ইতিহাস বই লিখেছিলেন। সেগুলি সবই বিদ্যালয়পাঠ্য। সেজন্যে এগুলির মধ্যে নতুন কোনো তথ্য উদ্ধারের প্রচেষ্টা নেই। কিন্তু সে সময়ে এই বইগুলিও বিশেষ কাজে এসেছিল।

> বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ ২ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়।

তিনি বিদ্যালয়পাঠ্য এই কয়টি ইতিহাসের বই লিখেছিলেন। পুরাবৃত্ত-সার (প্রাচীন কালের বিবরণ, প্রথম খণ্ড, ১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭২)। এ ছাড়া বিবিধ প্রবন্ধের রচনায়ও ভূদেবের ইতিহাসচর্চার পরিচয় আছে। ইতিহাসের প্রতি এই প্রীতিপক্ষপাত ছিল বলেই ভূদেব যখন গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন কাহিনীর জন্যে ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

ভূদেব কেবল যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক রচনাকার তাই নন, তিনি বাংলা উপন্যাস রচনারও পথিকৃৎ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় Creative রচনাকার ছিলেন না। মননশীলতাই তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকামনা, কল্যাণ আদর্শের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েই উনিশ শতকের কবি-মনীষীবৃন্দ জাতির চিত্তকে পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এজন্য এঁদের সাহিত্য-কর্মে নীতিমূলকতা, উপদেশপ্রবণতা মাঝে মাঝে অনাবৃতভাবে দেখা দিয়েছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় অবশ্য কোথাও তাঁর মনোভাব গোপন করেন নি। 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র [১] ভূমিকায় বলেছেন, 'গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

১. রচনাকাল ১৭৭৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পাঞ্জলিতে ভূদেব লিখেছেন 'প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা বাংলাভাষায় লিখিয়াছিলাম।' পুষ্পাঞ্জলির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।' লক্ষণীয়, 'হিতোপদেশ শিক্ষা হয়' কথাগুলি। সংস্কৃতে ইতিহাসকে অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখা হত। ভূদেব যে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা তিনি তো প্রাচীন মনীষিগণের চিন্তাধারাকে Young Bengalএর মতো অবহেলা করেন নি বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করেছেন। ইতিহাস যে শিক্ষণীয় বিষয়, ইতিহাস পাঠে যে ভুল সংশোধন হতে পারে এ ধারণা গ্রীক ঐতিহাসিকদেরও ছিল। এ কথা উপক্রম অধ্যায়ে বলেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী দুইটি। সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয় বিনিময়। দুইটি কাহিনীরই জড় কন্টারের *Romance of History-India.* "ইংরাজিতে 'রোমান্স অব হিস্টরি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফল স্বপ্ন' নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।" কন্টারের বইটি নিছক রোমান্স। ভূদেবের কাহিনীতে কল্পনা আছে, নীতিকথাও অবহেলিত নয়। টড রোমান্সকে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেও ইতিহাসের ইঙ্গিতগুলিকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন। কন্টারের তেমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। ভূদেব এই রোমান্সকে অবলম্বন করে তাঁর দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস রচনা করলেন। বইটির সঙ্গে ভূদেব হজ্‌সন্ প্রাট্ এবং রামগতি ন্যায়রত্নের নাম যুক্ত করেছেন। এঁদের কাছে ভূদেবের ঋণ কতখানি সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে রামগতি ন্যায়রত্নেরও ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি ঝোঁক ছিল। এ গ্রন্থ মুদ্রণে রামগতি যে ভূদেবকে উৎসাহিত করবেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

'সফল স্বপ্ন' গল্পটির উৎস কন্টারের *The Traveller's Dream.* সকল সমালোচকই এটি যে একটি তুচ্ছ রচনা সে কথা বলেছেন। এর সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছুই নেই। ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বৈচিত্র্যও নেই।

এই কাহিনী 'সফল স্বপ্ন' বটে। গল্পটিতে ভূদেবের ধর্মকথা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। একে তো কাহিনীর পরিসর স্বল্প, তদুপরি বেশ কয়েক বছরের ঘটনাকে মাত্র তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে স্থাপন করে ভূদেব মাত্রাহীনতার

পরিচয় দিয়েছেন। এর উপর তত্ত্বের ভার নিতান্ত বেমানান। নায়ক সবকতাগীন এক জায়গায় বলছেন,

> পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন।

বলা বাহুল্য এইটি সবকতাগীনের জবানিতে ভূদেবের নিজস্ব বক্তব্য। কাহিনী ছিল ঐতিহাসিক কিন্তু 'সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ' ধর্মশিক্ষাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। আসলে ধর্মের জয় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই ভূদেব একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। ইতিহাস কেবল সেখানে উপলক্ষ— ধর্মই লক্ষ্য। প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভূদেবের জগৎ-নিয়ন্তার কথা মনে পড়ে যায়, সবকতাগীনের হরিণশিশুর প্রতি কারুণ্য বর্ণনা করে ভূদেব কাহিনীর গতি ভুলে গয়ে 'সাত্ত্বিক ধর্মের কি অনির্বচনীয় মহিমা' এই ভেবে বিস্মিত হন। জেহীরা-সবকতাগীনের প্রেমকাহিনী অনেকটা 'আচার প্রবন্ধে'র নির্দেশ অনুযায়ী। শব্দচয়নেও এই কাহিনীতে ভূদেব কিছু পরিমাণে দুরূহতার অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পান না। যেমন অধ্বশ্রম, জিজীবিষাবৃত্তি, ঈদৃক্, বশাৎ, বালাতপ, ওসারিয়া, অপসব্য, তূষ্ণীম্ভূত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সফল স্বপ্নের আরম্ভটির সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর সূচনার ঐক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় বঙ্কিম-চন্দ্রের রোমান্টিক মনোবৃত্তি ভূদেবের ছিল না। এ মিল কেবল বর্ণনাগত— অন্তরঙ্গ নয়।

চরিত্রসৃষ্টিতেও এ কাহিনীর কোনো কৃতিত্ব নেই। সবকতাগীন ধর্মাত্মা পথিক। 'যথা ধর্ম তথা জয়' এই বাণীর প্রতীক তিনি। এই গল্পে ইতিহাসের মধ্য থেকেও ভূদেব কোনো নতুন ইঙ্গিত দিতে পারেন নি।

সফল স্বপ্নের ত্রুটিবিচ্যুতি কিন্তু অঙ্গুরীয় বিনিময়ে লক্ষিত হয় না। অঙ্গুরীয় বিনিময় আকারে ছোটো তথাপি উপন্যাসের পূর্ণতা আছে। ভূদেব বলেছেন তিনি এই কাহিনীটিও রোমান্স অব হিস্টরি— ইণ্ডিয়া থেকে নিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয়ে ভূদেব কণ্টারের কাছে ঋণী। কণ্টারের গল্পটির নাম *The Mahratta chief.* সফল স্বপ্নে যেমন এই ঋণ ভারস্বরূপ অঙ্গুরীয় বিনিময়ে তেমনি এ ঋণ সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিতে রূপান্তরিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের বিশদ আলোচনার পূর্বে এর কাহিনীর পরিচয় নেওয়া যাক।

মারাঠা বীর শিবজী পার্বত্যপ্রদেশে ধীরে ধীরে বলে বীর্যে একচ্ছত্র হয়ে উঠেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করে তিনি এমন একদল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন যার তুলনা সেকালে মেলে না।

আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন করবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। শিবজী কৌশলে আওরঙ্গজেব কন্যা রোশিনারাকে বন্দী করে নিজের শিবিরে নিয়ে আসেন। উপন্যাসটির আরম্ভ এখান থেকে। আওরঙ্গজেব কন্যা রোশিনারা যবন। স্বভাবতই শিবজী কিংবা তাঁর সৈন্যবাহিনীর উপরে রোশিনারার বিরাগ আশা করা যায়। রোশিনারা শিবজীর দুর্গে এসে প্রথমে অবজ্ঞা অবহেলায় হিন্দুরাজার ঔদ্ধত্যের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শিবজীর সৈন্যের ব্যবহারে, দুর্গের সেবিকার শিষ্টাচারে রোশিনারা বিস্মিত হলেন। দুর্গের সৈন্যদের আশ্চর্য ব্যবহারে রোশিনারার পূর্বধারণা যখন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে, তখন তিনি দুর্গস্বামীর প্রতি আর অহেতুক বিরাগ পোষণ করলেন না। শিবজী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুর্গে ফিরে এলেন। রোশিনারা বন্দিনী। কিন্তু শিবজীর ব্যবহারে বন্দিনী রোশিনারা মুগ্ধ হলেন। শিবজী বললেন তিনি বিবাহ করবার জন্যেই বাদশাহ-পুত্রীকে দুর্গে এনেছেন। গর্বিতা রাজনন্দিনী শিবজীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। মোগলের সঙ্গে মারাঠার যুদ্ধ আসন্ন এটা সহজেই বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে শিবজীর এক সৈনিক রোশিনারার প্রতি আসক্তি অনুভব করলে। শিবজী সৈনিকের এই আচরণে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবজী তাকে মৃত ভেবে দুর্গ থেকে বহিষ্কৃত করলেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে শিবজীও অক্ষত ছিলেন না। রোশিনারা কৃতজ্ঞতা বশতই শিবজীর শুশ্রূষায় আপনাকে নিয়োজিত করলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ধীরে ধীরে প্রেমে রূপান্তরিত হল। শিবজীর আচরণে মুগ্ধ রোশিনারা আত্মপ্রকাশ করলেন। বাদশাহপুত্রী প্রতিহিংসা বিস্মৃত হয়ে আপন হৃদয়াবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

অপর দিকে শিবজী কর্তৃক আহত সেনাপতি মোগল শিবিরে গিয়ে জ্বলন্ত ভাষায় তাদের উত্তেজিত করল। সেনাপতির দুর্গের পথঘাট জানা। তার সহায়তায় মোগল সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গ অধিকার করলে। শিবজী পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। রোশিনারা দিল্লীতে প্রেরিত হল।

মোগল সৈন্যদের ধারণা ছিল শিবজী মৃত। কিন্তু শিবজী পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে চাতুর্যের দ্বারা মোগলদের পরাজিত করে দুর্গ দখল করে নিলেন। ভীষণ যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মোগলদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। বিধর্মীর হাতে লাঞ্ছিত সেনাপতি সকল দোষ স্বীকার করলে। তার দুরবস্থা দেখে শিবজী বললেন, 'হায়! ভারতভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে।' পাপাত্মা হল মোগল সৈন্য। ভূদেবের দৃষ্টিতে শিবজী ভবানীর বরপুত্র। এই ভবানীই কি পরবর্তীকালে ভারতমাতার পরিকল্পনার বীজ। সেনাপতি বললে স্বপ্নে দেবী ভবানীর আদেশ ছিল এই রকম—

> রে নরাধম। তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্ তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মি শত্রুর হস্তগত করিলি— জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি— এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।

এমন সময় শিবজীর গুরু রামদাস স্বামী এসে শিবজীকে আশীর্বাদ করলেন। সেনাপতির অপমানে শিবজীর সমরানল পুনরায় উদ্দীপিত হল। রামদাস স্বামীর ইচ্ছায় শিবজী পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করলেন। রামদাস স্বামী কেবল ধর্মশিক্ষাই দেন না, শিবজীর সকল কর্মের সহায়কও তিনি।

রামদাস আহত সেনাপতিকে নিয়ে গেলেন। শিবজীর সুশিক্ষিত সৈন্যদল মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। মোগলসৈন্য শিবজীর অপূর্ব রণসজ্জা দেখে চমৎকৃত হল। রামদাস স্বামীর শিক্ষায় সৈনিক যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। একবার যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারই ঋণ শোধ করবার জন্যে মারাঠা সেনাপতি আমরণ যুদ্ধ করলে। তার সাহস, বীর্য, শক্তি দেখে শিবজী বিস্ময়ান্বিত হলেন। মারাঠা বীর দেশের জন্যে, নিজ জাতির জন্যে মৃত্যু বরণ করতে কুণ্ঠিত হল না। শিবজী সেনাপতির জন্যে সমবেদনা অনুভব করলে রামদাস স্বামী বললেন, 'মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ করো— সেনানী তাঁহার জীবন-ঋণ পরিশোধ করিলেন।'

শিবজী জীবদ্দশায় এবং মোগলসৈন্য তৎকর্তৃক পরাজিত এই সংবাদে আওরঙ্গজেব জয়সিংহকে শিবজীদমনে পাঠালেন। শিবজী এবার অন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তাঁর মধ্যে কেবল রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল

ছিল না। মারাঠা এবং হিন্দুরা যে মোগলদের থেকে শক্তিতে, সামর্থ্যে কোনো অংশে ন্যূন নয় সে কথা প্রমাণ করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। জয়সিংহের কাছে তিনি অকপটে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। জয়সিংহ শিবজীর আবেগময় ভাষণে মুগ্ধ হলেন, তাঁরও রাজপুতগরিমা জাগ্রত হল। তিনি শিবজীর সাহায্যের জন্য অঙ্গীকার করলেন। জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি অনুযায়ী শিবজী মোগলদের সৈন্য নিয়ে বিজয়পুরের বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে মোগল দরবারে উপস্থিত হলেন। শিবজীর অন্তরে বীরত্বের স্পৃহা ছিল, পুরুষত্বই তাঁর একমাত্র কাম্য। তিনি মনে করেছিলেন তিনি আওরঙ্গজেবের কাছে পুরস্কৃত হবেন। দিল্লীর দরবারে গেলে রোশিনারা-প্রাপ্তি সহজ হতে পারে এইটিও শিবজী ভেবেছিলেন।

এদিকে রোশিনারা দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হয়ে শাজাহানের সেবাতে মন দিলেন। কোমলহৃদয় বালিকা শাজাহানের কাছে আপন মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বৃদ্ধ শাজাহান পৌত্রীর এই প্রেমে আন্তরিক খুশি হলেন। পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজের জীবনের ব্যর্থ পরিণতিতে বৃদ্ধ শাজাহানের মন ভেঙে গিয়েছিল। নিজে যা পান নি অন্যের জীবনে তা লভ্য দেখে তিনি প্রীত হলেন। বৃদ্ধের নিকট দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম প্রীতি এক স্বর্গীয় আনন্দের আধার বলে মনে হল। কিন্তু বাদশাহপুত্রীর প্রেম অচরিতার্থ থাকে। কেননা বাদশাহনন্দিনী প্রেম জানে না। রোশিনারার প্রেম শাজাহানের উৎসাহে গাঢ় হল।

শিবজী দিল্লীতে এলে রোশিনারার আশার সঞ্চার হল। অপ্রাপণীয়কে পাওয়া আর অসম্ভব মনে হল না। কিন্তু আওরঙ্গজেব ক্রূর, খল, চতুর। শিবজীর যথার্থ সম্মান মোগল দরবারে হল না। শিবজী অপমানিত বোধ করলেন। কিন্তু ধীর বিচক্ষণ শিবজী আপন সৈন্যদের বিদায় দিয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে নিভৃতে বাস করতে লাগলেন। রোশিনারা হতাশা, ব্যর্থতা, দৈন্য নিয়ে শাজাহানের পক্ষপুটে আশ্রয় পাবার চেষ্টা করলেন।

এদিকে শিবজী একদিন ছদ্মবেশী রামদাস স্বামীকে দেখতে পেলেন। রামদাস স্বামীর সহায়তায় পলায়নের সব ব্যবস্থা ঠিক হল। আওরঙ্গজেবও শিবজীকে যাতে জয়সিংহ আসবার পূর্বে পর্যুদস্ত করতে পারেন তার দিকে মনোযোগ দিলেন। পুত্র মহম্মদের নিকট চিঠি লিখে তিনি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতক সেনামণ্ডলীর নাম জানতে চাইলেন। জয়সিংহকে বিষপানে

হত্যা করলেন। সুতরাং শিবজী জয়সিংহের কোনো সহায়তা পাবে না মনে করে আওরঙ্গজেব নিশ্চিন্ত হলেন। এদিকে শিবজী পলায়নের পূর্বে এক বারবণিতাকে আওরঙ্গজেবের জন্মদিনে দিল্লীর হারেমে পাঠালেন এই সংবাদ দিয়ে যে যদি রোশিনারা ইচ্ছা করেন তবে তিনি শিবজীর সঙ্গে পলায়ন করতে পারেন। শিবজীর আন্তরিকতায় রোশিনারার একান্ত আত্মসমর্পণেচ্ছু হৃদয় ভেঙে পড়ল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আওরঙ্গজেবের সাবধানবাণী ছায়ার মতো অনুসরণ করল। বাদশাহজাদী এবারে কঠিন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। শিবজী প্রেরিত অঙ্গুরীয় গ্রহণ করে রোশিনারা আপন অঙ্গুরীয় শিবজীকে দেবার জন্য বারবণিতাকে দিলেন। রোশিনারার যে শিবজী-অন্ত প্রাণ, শিবজীই যে তার একমাত্র প্রেমাস্পদ, একথা পত্রে জানালেন। শিবজী সেই দিন পালিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বারবণিতা শিবজীকে রোশিনারার মনোভাব বললে। রামদাস স্বামী সব শুনে রোশিনারার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলেন এবং শিবজীকে আপন কার্যসাধনে উৎসাহিত করতে লাগলেন। শিবজীও রোশিনারার প্রেমে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু এ মিলনে কণ্টক। একদিকে রমণীর প্রেম অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরন্ত ইচ্ছা। এই সংকটের কোনো সমাধান না করেই ভূদেব কাহিনী শেস করেছেন।

('অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' মারাঠা বীরকে কাহিনী হিসেবে অবলম্বন করে ভূদেব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন।) মারাঠাজাতির অভ্যুত্থানের সময়ে রাজপুত জাতির বীর্য মোগলদরবারের আনুগত্যস্বীকারে রুদ্ধস্রোত। সুতরাং যদি নবভারতবর্ষ স্থাপন করতে হয় তবে মারাঠারাই তা পারবে। হয়তো এই কারণেই ভূদেব মারাঠা ইতিহাসকে অবলম্বন করেছিলেন। এ ধারণা আরও দৃঢ় হয় যখন দেখি 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' শিবজীর বংশধরকেই তিনি আদর্শ নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। মারাঠা বীরের আদর্শ ভূদেবকে আরও এক কারণে আকৃষ্ট করে থাকতে পারে। হিন্দু জাতির ধর্মীয় প্রবণতাও মারাঠা জাতির মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল। এই কারণেও তিনি মারাঠাদের প্রতি সমবেদনা অনুভব করে থাকতে পারেন। কিন্তু শিবজীর আদর্শ পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শিবজীর পুত্র পৌত্র মারাঠা ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারে নি। ভূদেব যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বাধীনতা শিবজীর উক্তিতে রয়েছে। গ্রন্থমধ্যে শিবজীর চরিত্রটির ওপরই নানা দিক দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। (গ্রন্থের নাম অঙ্গুরীয় বিনিময়।

কিন্তু এই 'বিনিময়' ভূদেবের উপন্যাসে সামান্য অংশ জুড়েছে। প্রধান হয়েছে শিবজীর আদর্শ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কৌশল। সব মিলে শিবজী আদর্শবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছেন। জয়সিংহের নিকট শিবজীর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'জয়সিংহের নিকট শিবজীর বক্তব্য কেবল চাতুর্যের নিদর্শন নয় বরং শিবজীর জলন্ত বিশ্বাসের প্রকাশ। (যে স্বাধীনতার স্পৃহা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দী উজিয়ে উনিশ শতকে পৌঁছেছিল ভূদেব তাকেই শিবজীর জবানিতে ব্যক্ত করেছেন)—

যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমাকর্তৃক হ্রস্বতেজা হয়েন, উভয়েরই আওরঙ্গজেব মঙ্গলাবহ।

এই জাতীয় ধর্ম রক্ষা করবার জন্যেই এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যেই ভূদেবের আজীবন কর্মসাধনা। সুতরাং শিবজী ভূদেবের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই অধ্যায়েই ভূদেব আদর্শ রাজ-শক্তির মৌলিক গুণাবলীর কথা বলেছেন—

রাজশক্তি যে ব্যক্তিতে অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন বিধি সমস্ত নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

শিবজীর এই উক্তির সঙ্গে 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে'র আশ্চর্য মিল দেখা যায়—

আকবর সাহাই বুঝিয়াছিলেন, কেমন করিয়া অন্তর্বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন মহাদেশটিকে একচ্ছত্র করিয়া রাখিতে হয়। ধর্মবিদ্বেষ কখনই তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান লাভ করে নাই। তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে একধর্মসূত্রে সম্বদ্ধ করিবার জন্য কি বিচিত্র উপায়েরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যিনি ঐ পথে না চলিবেন তিনিই ভারতবর্ষের সিংহাসন হইতে স্খলিতপদ হইবেন।

এই উক্তি রামচন্দ্রের, অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যার বীজ 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তাই মহীরুহে পরিণত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ে যা অস্ফুট 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তাই ফুটন্ত, ফলন্ত।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র অপর এক মূল্যের কথা উল্লেখ করছি। আগে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গালগল্প পেয়েছি সেখানে রোমান্স, কিংবা যুদ্ধবর্ণনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইতিহাসের ক্ষীণ পদধ্বনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় যে কাহিনীটি ইতিবৃত্তমূলক। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাস ও উপন্যাসের মাঝামাঝি। ভূদেবের অঙ্গুরীয় বিনিময়ে রোমান্স অংশ ততটা প্রাধান্য পায় নি সত্য কিন্তু সমস্ত জুড়ে একটি ঐতিহাসিক আবহ রয়েছে। শিবজীর পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায়, মারাঠাদের সাহসিকতায়, যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনায়, রাজ অন্তঃপুরের চকিত উদ্ঘাটনে, শাজাহানের করুণ জীবনী প্রকাশে, বাদশাহজাদীর ট্রাজিক অবস্থায়, আওরঙ্গজেবের শঠতা ক্রূরতার বর্ণনাতে ভূদেব ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ তথ্য কোথাও আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয় নি। সর্বত্রই কাহিনীর গতি সাবলীল-ভাবে অগ্রসর হয়েছে। আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাসের ফাঁক পূরণ থাকে। কল্পনার প্রাধান্য তো থাকেই। যা ঘটে নি অথচ সম্ভাবিত ছিল সেই সত্য উদ্ঘাটনে ভূদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাস কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে— আর রোমান্স ইতিহাসের চার দিকে একটা সরু পাড় বুনে দিয়ে নবতর বৈচিত্র্যের সূচনা করেছে।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে কন্টারের 'দি মার্হাট্টা চীফ' এর অনেক অংশই বাদ গিয়েছে। কন্টার শিবজী-রোশিনারার বিবাহ ঘটিয়েছেন এবং শিবজীর পুত্রের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে চমৎকারিত্ব আনবার চেষ্টা করেছেন। ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল শিবজীর দেশহিতৈষণার দিকটিকে তুলে ধরা। সে বিষয়ে তিনি সার্থকও হয়েছেন। শিবজীর সঙ্গে রোশিনারার বিবাহ ঘটানো ভূদেবের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তবে কন্টারের গল্পটি নিছক রোমান্স। ভূদেব এই রোমান্সের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের সংমিশ্রণে নূতনত্ব এনেছেন।

অঙ্গুরীয় বিনিময় আরও এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এ বই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ক্ষীণ প্রভাব ফেলেছিল। ভূদেবের রামদাস স্বামীর অনুসরণে দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী কল্পিত। রোশিনারার সঙ্গে আয়েষার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'অঙ্গুরীয়' উভয় উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান। অবশ্য এর জড় পৌঁছায় সংস্কৃত সাহিত্যে।

ভূদেবের সময়ে ডফের বই ছাড়া মারাঠাদের কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ছিল না। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের চোখে শিবজী একজন দস্যুরূপে

চিত্রিত। বাঙালির পক্ষে তখন সুদূর মারাঠা অঞ্চলের ইতিহাস জানবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ শিবজীর উত্থান এতই অতর্কিত এবং আকস্মিক যে তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা প্রচুর গবেষণাসাপেক্ষ ছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে;
পায় নি সংবাদ—
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।

ভূদেবের কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই বাংলাদেশে মিথ্যাময়ী ইতিহাসের মুখর ভাষণ থেকে শিবজীকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরও কল্পনায় ছিল রবীন্দ্রদৃষ্টি—

তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
"এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বই রমেশচন্দ্র দত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। জয়সিংহ-শিবজী দৃশ্যকে প্রায় পুরোপুরিভাবে রমেশচন্দ্র অনুকরণ করেছেন তাঁর 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' গ্রন্থে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে। সম্প্রতি বাংলা উপন্যাসের জন্মসাল নিয়ে কিঞ্চিৎ বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিপূর্বে জানা ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। এখন মিসেস ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণা' প্যারীচাঁদের স্থান নিতে চাইছে। এ বাদবিতণ্ডায় প্রবেশ না করেও এ কথা বলা যেতে পারে যে 'ফুলমণি ও করুণা' অথবা 'আলালের ঘরের দুলাল' এ-দুটি গ্রন্থ কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের দাবি করতে পারে না। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লেখকের মতে নিশ্চয়ই উপন্যাস কিন্তু এ গল্পটিকে অনেক সমালোচকই বড়ো গল্পের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে অনুপস্থিত। উপন্যাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞাও আজ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নি। বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাসের যে বিচিত্র রূপ দেখা দিয়েছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের অনেক রূপকর্মকেই সংজ্ঞার বন্ধনে বাঁধা সম্ভব নয়। এতে এক দিক থেকে উপন্যাসরচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে। লেখকদের স্বাধীনতা বিচিত্রপথগামী হবার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং উক্ত বাদবিতণ্ডায় প্রবেশ না করে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্মের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। পূর্বে যে তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি সেগুলির গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এদের সাহিত্যক মূল্যও আছে। এমন-কি সামাজিক মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। তথাপি সাহিত্যবিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই উপন্যাসের জলন্ত রূপটি গড়ে উঠেছিল। দুর্গেশনন্দিনী বাংলা উপন্যাসের মাইলস্টোন। এ কথা আমরা সকলেই জানি দুর্গেশনন্দিনীর নানা ত্রুটি সত্ত্বেও তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি দুর্গেশনন্দিনীকে কখনও উপেক্ষা করে নি। দুর্গেশনন্দিনী বার হবার পর এ কথা অবিদিত রইল না যে ইউরোপীয় সাহিত্যের আর একটি রূপকর্ম বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপ্ত হল। উনবিংশ শতকে ইউরোপ থেকে আমরা অনেক কিছু গ্রহণ করেছি। উপন্যাস তার মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রই সাহিত্যের এই শাখাটিকে ফুটন্ত জলন্ত করে তোলবার জন্য নিজ প্রতিভাকে নিয়োজিত করলেন, বহু প্রতিভাবানকে

আহ্বান জানালেন উপন্যাসের প্রাঙ্গণে। তার ফল যে কী অসামান্য হয়েছিল, সে কথা সাহিত্যের ইতিহাস অনুধাবন করলে বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র মোট চোদ্দটি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারানী বড়ো গল্প। বাকি বারোটি উপন্যাসের মধ্যে নয়টি উপন্যাসেই তিনি ইতিহাসকথার অবতারণা করেছেন। যুগলাঙ্গুরীয়তে ইতিহাস নেই বটে কিন্তু স্থান কাল পাত্র সুদূর অতীতের। ইতিবৃত্তের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগ্রহ প্রমাণ করে যে তিনি অতীতের বিস্মৃত অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসী ছিলেন। অতীত সম্বন্ধে তাঁর আকর্ষণও ছিল প্রবল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যথার্থ ইতিহাস ছিল না। যথার্থ ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাতও মুখ্যত তাঁর প্রচেষ্টাতেই হয়। স্কুলে এবং কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়তে হয়েছিল তা 'মুষ্টিভিক্ষা'ও নয়। ইতিহাস পাঠে তাঁর আগ্রহ ছিল, অথচ উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। ইউরোপের ইতিহাস পড়ে তাঁর বাংলার ইতিহাসের জন্যে ক্ষোভ হত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন,

> At college Bankim Chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian ১

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই। এই সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থ কি ছিল তা আর আজ জানবার উপায় নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই এই-সব গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করে গেছেন।

> কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রিনাইসেন্স (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। ২

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখবার আশা ত্যাগ করেন নি। তার সূত্রপাতও করেছিলেন বঙ্গদর্শনের পাতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আশা ফলবতী হয় নি।৩ তাঁর জন্যে দুঃখ করি না। দেশে তিনি বাঙালি চিত্ত-

১ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী
২ হরপ্রসাদ-রচনাবলী
৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— সাহিত্য সাধক-চরিতমালা ২২

গহনে যে অনুরণন তুলেছিলেন তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ। ইতিহাসচর্চা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে নি। কিন্তু বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে খসড়া রচনা করবার পূর্বে তিনি উপন্যাসে যে বস্তু দিতে আরম্ভ করেছিলেন, দুর্গেশনন্দিনীতেই তার শুভ সূচনা।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রায়শই ইতিহাস এবং উপন্যাসের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান হয় নি। কেউ তথ্যকে বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি। কেউ তথ্যকেই সর্বস্ব করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত রোমান্স-রচয়িতা। তিনি ইতিহাসকে সেই কাজেই ব্যবহার করেছেন বেশি। কিন্তু তথ্যের আতিশয্য তাঁর উপন্যাসে জোবরা হয়ে লেগে থাকে নি। পৌরাণিক ঋষি যেমন মন্দাকিনীধারা এক নিমেষে পান করে নিয়ে পরে তাকে ভোগবতী ধারারূপে বইয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও জহ্নু মুনির মতো ইতিহাসধারাকে আপনার বশে এনে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে ইতিবৃত্তকে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। একে একে সেগুলির উল্লেখ করছি।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পরচনা করতে চেয়েছেন। অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসে ভাষাগত শৈথিল্য আছে। তথাপি শৈলেশ্বরের মন্দির বর্ণনায়, দুর্গের রহস্যঘনিমায়, নায়িকার রূপমহিমায়, কতলু খাঁকে নর্তকীর ছদ্মবেশে বিমলা কর্তৃক হত্যার দৃশ্যে, নদীর ধারে ওসমান-জগৎসিংহের যুদ্ধ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি দীপ্তি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে বাংলা রচনায় আমরা দেখতে পাই নি। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বহুকথিত এই উক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিশীথের যে রহস্যময় পরিবেশের অবতারণা করেছেন তাও প্রশংসার যোগ্য। উপক্রমে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতের স্বপ্নময় বর্ণনার সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করেছি। দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণনাময় দৃশ্যগুলির সেই সার্থকতা। ইতিহাস এখানে সমতলের রুক্ষতা নিয়ে উপস্থিত হয় নি, পর্বতশীর্ষের দীপ্তমহিমায় ইতিবৃত্ত যথার্থ মর্যাদা স্থাপিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> নবোদিত সাহিত্যসূর্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ পর্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটিরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।[১]

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিই এই নবোদিত সাহিত্য-সূর্যের আলোকে উদ্‌ভাসিত। দুর্গেশনন্দিনীতে তার প্রথম প্রকাশ এবং চরম বিস্তার। ইতিবৃত্তকে এখানে তিনি কোনো প্রয়োজনে উপস্থাপন করেন নি। কেবলমাত্র গল্পরস পরিবেশন করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল।

কপালকুণ্ডলার ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীটির একক মর্যাদা বঙ্কিমচন্দ্র দিতে চান নি। কপালকুণ্ডলার ভূমিকাই ঐ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। কপালকুণ্ডলাকে মুকুলিত বিকশিত করার জন্যে ইতিহাসকাহিনীর সার্থকতা। এই জাতীয় আর একটি ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী আছে চন্দ্রশেখরে, অবশ্য ইতিহাস-কাহিনীটির স্বতন্ত্র মর্যাদা কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দলনী বেগমের কাহিনীটির আদ্যন্ত বিকাশ দেখিয়েছেন। কপালকুণ্ডলায় মুখ্য কাহিনীর প্রয়োজনে মতিবিবি প্রসঙ্গ এনেও বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবির বিকাশ দেখিয়েছেন। আজকের দিনে এই গৌণ ভূমিকার বৃত্তান্ত সমালোচকের কঠিন মন্তব্যের কারণ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে উপকাহিনী সম্বন্ধে এত কঠোর হবার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। সুতরাং তিনি মতিবিবির আদ্যন্ত পরিচয় উপন্যাসে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেন নি। বিশেষত নবকুমারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল বলেও পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা-মতিবিবি পরিচয় সবিস্তারে বলেছেন। এ কথা ভুললে চলবে না বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রবিশ্লেষণে যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন (যেমন বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী) তেমনি নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাহিনী গ্রন্থনে। এ-যুগে উপন্যাসে কাহিনীর মূল্য ততটা নয় যতটা মূল্য মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যাতে। কাহিনী গ্রন্থনে মনোযোগের অভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীসূত্ররচনে গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সর্বদা সার্থক হয়েছেন এমন কথা বলি না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি অমনস্ক ছিলেন না এ কথা জোর করেই বলা যায়। দলনী বেগম এবং শৈবলিনী স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমচন্দ্রের দলনী বেগমের প্রতি সমবেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনী প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর কথাস্রোত মাঝে মাঝে রুদ্ধ করে দিযে বঙ্কিমচন্দ্র দলনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। দলনী বেগম গীতিকবিতার একটি অখণ্ড ভাবের প্রবাহ। বঙ্কিমের কবিজনোচিত অভীপ্সা দলনীর মধ্য দিয়ে সার্থকতা পেয়েছে।

মৃণালিনীতে ইতিহাসের ভূমিকা আর গৌণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার

ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন এই উপন্যাসে। প্রথম যুগের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের দ্বিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। এক দিকে ইতিহাস অবলম্বন করে রসসৃষ্টি, অন্য দিকে ইতিহাসের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটন। শিক্ষিত বাঙালির চিত্তে ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগানোও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। মৃণালিনীর তথ্যবিরলতা পীড়াদায়ক। কিন্তু এই বিরল তথ্য থেকে যে সত্যটি মৃণালিনীতে নির্ণীত হয় তা হল দেশ-প্রেমিকের জাতির কলঙ্কমোচনের প্রগাঢ় প্রয়াস। বাংলার প্রচলিত ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সংশয় জাগিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের মতো ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত অনুসরণ করেই সত্যপরিচয় উদ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করেন।[১] এইখানেই মৃণালিনীর অন্যতম সার্থকতা।

চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী এবং সীতারাম উপাখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র কাছের ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন। এ যুগ সম্বন্ধে লোকমুখে যে গল্পগুলি চলছিল সেগুলি নিছক আব গল্প নয়। কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে। ইংরেজ-শাসনযন্ত্রে তিনি নিজে শিক্ষিত। তবে সুফল তিনি দেখেছেন। নবাবী আমলের অত্যাচার নিপীড়নের কথা সর্বজনবিদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় সেইজন্যে রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ দেখি। ইতিহাস কেবলমাত্র রোমান্স নয় তা অতীতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু এই ইতিহাস ঘরোয়া পরিবেশের নয়। আনন্দমঠ কিংবা দেবী চৌধুরানী অথবা সীতারামের বিবরণে যে উচ্চাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপিত তা বাঙালিব নিস্তরঙ্গ জীবনে অসম্ভাবিত ছিল। জীবনে যা পাই নি অথচ যার প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে জেগেছে তাই উপন্যাসে লাভ করে বাঙালি ধন্য হয়েছে। এই-সব উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশচর্চার কথা বলেছেন। দেশচর্চার কথা পরিস্ফুট করতে হলে যে পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশের জন্যে ঐতিহাসিক পটভূমির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ কথা মনে রাখতে হবে তখনও কংগ্রেস-অনুশীলন-যুগান্তর পার্টির বৃহত্তর ভূমিকার কথা কেউ ভাবতে পারে নি। কংগ্রেসের সবে মাত্র শুরু। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের কথা শুনিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই সমিধ সংগ্রহ করে পরবর্তীকালের যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারা গিয়েছিল। আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র

১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র, নারায়ণ ১৩২২

ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চর্চাকে সুস্পষ্ট আকার দেবার জন্য একটি পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সে সুযোগ দিলে। ইতিহাসের সার্থকতা সেইখানে। প্রসঙ্গত বলে রাখি শৈবলিনীর প্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলে চিহ্নিত করতে পারতেন। সমসাময়িক যুগের শিক্ষিত বাঙালির চেতনা সে রকম ছিল না। সুতরাং শৈবলিনীর প্রেম বর্ণনার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল ইতিহাসের। অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জ ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব করে। H. Butterfield নিপুণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন সে সমালোচনা যথার্থ নয়। অনেক সময়েই লেখক ইতিবৃত্তে এমন সব ব্যক্তির এবং এমন সব ঘটনার সাক্ষাৎ পান যা ঔপন্যাসিকের একটি ideaকে প্রমূর্ত করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করে। ঔপন্যাসিক যেন একটি তৈরি-গল্পের মধ্যে রঙরিপুর কাজ করে দেন। সীতারাম এই শ্রেণীর উপন্যাস। গীতার নিষ্কাম ধর্ম এবং স্বদেশচর্চার মহান্ বাণীটি তিনি সীতারামের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একটা ideaর ইতিহাসে সমর্থন মিলে যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র সাগ্রহে তাকে গ্রহণ করলেন। সীতারামের ইতিহাস নির্বাচন আরও এক দিক দিয়ে সার্থকতায় মণ্ডিত। ম্যাককালাম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে শেক্সপীয়র ইতিহাসের সেই সমস্ত বিষয়ই নির্বাচন করেছিলেন যেগুলি জাতির প্রিয় ঘটনা এবং চরিত্র। তদানীন্তন পাঠকসমাজ নাটকের কলাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখে নি। ইতিহাস নাটকের পাত্রে বিধৃত হয়ে সেই প্রাচীন প্রিয় গল্প-গুলিকেই নতুন করে পাঠককে শুনিয়েছে। পাঠক নির্বিচারে তা গ্রহণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের ক্ষেত্রে সেই সাফল্য দেখিয়েছেন। মৃণালিনীতেও তা পারতেন। কিন্তু তথ্যের বিরলতার জন্য সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান থেকে গেছে। সীতারামের তথ্য ছিল প্রচুর। সেগুলিকেই বঙ্কিম নিজের মতো করে সাজিয়ে উপন্যাসাকারে পরিবেশন করেছেন। অবশ্য এ কথাও ভুললে চলবে না যে সীতারামের শিল্পমূল্য কোনো অংশে কম নয়।

উপন্যাসে ইতিহাসের যোগাযোগ ঘটা সত্ত্বেও মৃণালিনীর তৃতীয় সংস্করণের (১৮৭৪) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন না। দুর্গেশনন্দিনীর টাইটেল পেজে লেখা ছিল 'ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস', মৃণালিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত টাইটেল পেজে লেখা ছিল

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকায় দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তালিকা থেকে খারিজ করেছেন। আর মৃণালিনীর তৃতীয় সংস্করণ থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস পরিচয়টি লুপ্ত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাখ্যান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রাথমিক ধারণাকে পরিবর্তিত করেছিলেন। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার কথা পেলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আটখানি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেব মধ্যে একমাত্র রাজসিংহ ছাড়া বাকি সাতখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। দেবী চৌধুরানীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> পাঠক মহাশয অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।

আগে বলেছেন—

> সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রযোজনের অভাব।

এ থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাস আকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে হলেও প্রকৃতিতে সেগুলি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয সে কথা লেখক বলতে চেয়েছেন। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[১] এই সমস্ত উক্তি থেকে বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে কঠোর নিযমকানুন আরোপ করতে চেযেছিলেন। এ কথা ঠিক তিনি ইতিহাসকে গ্রহণ করলেও সব উপন্যাসেই ইতিহাসকে সর্বস্ব করতে চান নি। কিংবা ইতিহাসের মাহাত্ম্যও প্রচার করতে উৎসাহী হন নি। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনাসংস্থান সবই ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কেন যে এই উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা থেকে বঞ্চিত করলেন তা বলা দুরূহ। আয়েষা-তিলোত্তমা অনৈতিহাসিক। গ্রন্থটির নাম দুর্গেশনন্দিনী। তিলোত্তমা গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয চরিত্রটি অনৈতিহাসিক হওয়ার জন্যেই কি বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে সম্মত ছিলেন না? ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহাসিক চরিত্রের প্রবেশ কি একেবারেই সম্ভব নয়? রাজসিংহে মবারক-দরিয়া অনৈতিহাসিক চরিত্রের প্রবেশ তা হলে

১ উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন— ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন—সীতারাম, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘটা সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনৈতিহাসিক চরিত্রের প্রবেশে আপত্তি করেন নি। তাঁর মতে সেই উপন্যাসই ঐতিহাসিক যে উপন্যাসে ইতিহাসই প্রধান হয়ে দেখা দেবে। ইতিহাসের কোনো একটি বৃহত্তর বা স্মরণীয় ঘটনাকে পরিস্ফুট করার জন্য যদি সমস্ত ভূমিকাগুলি একযোগে দায়িত্ব পালন করে তবেই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হবে। দুর্গেশনন্দিনীতে মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হয় নি, কিংবা যুদ্ধ বর্ণনাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্যও দেন নি। সে যুগের কোনো ঐতিহাসিক সত্যও নির্ধারিত হয় নি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দুর্গেশ-নন্দিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। মৃণালিনী যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হবার প্রধান বাধা তথ্যের অভাব। এখানেও প্রধান ঘটনা হয়েছে পশুপতি-মনোরমা এবং হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমকাহিনী। মনোরমার দ্বৈত ব্যক্তিত্বের উপরও বঙ্কিমচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন। স্থান কাল এবং পরিবেশটিও তথ্যের অভাবে ফিকে দেখায়। এই কারণে মৃণালিনী ঐতিহাসিক উপন্যাস হতে পারে নি। কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অন্য কারণে। তার কারণ আগে বলেছি। চন্দ্রশেখরে ইতিহাস-কাহিনীটি তেমন প্রাধান্য পায় নি। প্রাধান্য দিতে বঙ্কিমচন্দ্র চানও নি। এই কারণেই এইটিকেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস শ্রেণীতে বিবেচনা করেন নি। সীতারাম উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতে বলেছেন সীতারামের ঐতিহাসিকতা রক্ষিত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখেছি সীতারামে ঐতিহাসিকতা অনেকখানিই যথাযথ। তবে শ্রী-জয়ন্তীর মিলিত শক্তির জন্যে সীতারামের উত্থান এবং পতন অনৈতিহাসিক। সেই কারণে সীতা-রামকেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চান নি। একমাত্র রাজ-সিংহেই বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। চরিত্রগুলি ইতিহাসের স্রোতকেই বিস্তৃত করেছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ও হল রাজসিংহ-আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাবকেই পরিস্ফুট করেছেন। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নিদর্শন বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে আমরা আটখানি উপন্যাসের মধ্যে সাতখানি উপন্যাসই কেন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় তার আলোচনা করলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণে' আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় যে সমস্ত ঐতিহাসিক ভূমিকা লিখেছেন সেখানে কিন্তু তিনি

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতকে গ্রাহ্য করেন নি। তিনি ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করে দেখিয়েছেন যে কোথাও কোথাও তথ্যগত ভুল থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র যুগপরিবেশটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। কখনও ঘটনার যথাযথ বর্ণনায়, কখনও চরিত্রের যাথার্থ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পাত্রপাত্রী কিংবা স্থানকাল ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই এইগুলিকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে দ্বিধা করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এবং আচার্য যদুনাথ সরকারের এই ভিন্ন মতের কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞার ভিন্নতা থেকে উদ্ভূত। আচার্য সরকার সীতারাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভূমিকার শেষে 'টাইমস লিটারারী সাপ্লিমেন্ট' থেকে অভিমত তুলে নিজের মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোনো সংজ্ঞা দেন নি বটে। তবে তিনি যে কঠোর নিয়মের অনুশাসন দিয়েছেন সেরকম সংজ্ঞাও অলভ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম এবং রাজসিংহ যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেননা এখানে স্পেস, টাইম, কন্‌টেক্‌সট ঠিক আছে। মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এই-সব উপন্যাসে স্থানকাল-পাত্রদ্বারা যুগচিহ্নিত। কিন্তু মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী এবং কপালকুণ্ডলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। এগুলিতে ইতিহাস এসেছে কোনো একটি idea বা কোনো সাধারণ ঘটনাকে আরও বিকশিত আরও মুকুলিত করে তোলবার জন্য। ইতিহাসের এখানে স্বতন্ত্র মর্যাদা নেই। সেজন্যে এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব না। কিন্তু ইতিহাসের কিছু দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গীকার করেছেন বলে এগুলিকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলতে চাই। রাজসিংহে ইতিহাসই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। রাজসিংহ এবং আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ-কাহিনীটিই উপন্যাসের মূল আকর্ষণ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যানুগত্যও ছিল অপরিসীম। কেবল যেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা ঘটেছে সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যের ফাঁক-পূরণের জন্য কিঞ্চিৎ নূতন উপাদান যোগ করেছেন। এই কারণেই একমাত্র রাজসিংহ উপন্যাসকেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। প্রথম চারখানিকে (যে চারখানির কথা আমরা বলেছি) ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে দ্বিধার কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধা ছিল কেননা তিনি কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী। কিন্তু আগের আলোচনায় দেখিয়েছি প্রথম চারখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন

ইতিহাসেরই স্বার্থে। শেষোক্ত চারখানি উপন্যাসে মূল কাহিনীকে ইতিহাস সাহায্য করেছে মাত্র। এর মধ্যে চন্দ্রশেখর আবার মিশ্রধরণের। এই উপন্যাসটিকে ইতিহাসাশ্রিতই বলা উচিত। কিন্তু উপন্যাসটির গঠন কিঞ্চিৎ শিথিল। দলনীর অত্যধিক প্রাধান্যও দুর্লক্ষ্য নয়। সেজন্য চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাসও বলতে আপত্তির কারণ নেই। আসল কথা উপন্যাসের যেমন নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা আজও পর্যন্ত নিরূপিত হয় নি সেইরকম ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা হয় নি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এবং আচার্য যদুনাথ সরকারের সমালোচনা দুটিই গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নেই। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। কারণ সীতারামের মুখ্য বিষয় নরনারীর প্রেমদ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতি— ঐতিহাসিক আলোচনা গৌণ। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় একমাত্র রাজসিংহকেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। কেননা তাতে স্পেস্, টাইম, কন্‌টেক্‌সট ঠিক আছে। আমাদের সিদ্ধান্ত কি তাও বলেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে যুদ্ধবর্ণনার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস উভয় রচনাতেই যুদ্ধবর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধবর্ণনাতে বঙ্কিমচন্দ্র একই ভাবের পুনরাবর্তন করেন নি। যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিকরা বিশেষ আলোচনা করেন নি। সে যুগে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধেও এতকাল আমাদের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল।[১] বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস রচনা করেন তখন যুদ্ধবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা আরও সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং তাঁকে কল্পনাবলে সেযুগের যুদ্ধপরিকল্পনা করতে হয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনী থেকে রাজসিংহ পর্যন্ত যত-গুলি যুদ্ধবর্ণনা পাই তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার বৈচিত্র্য এবং গভীরতা দেখি। দুর্গেশনন্দিনীতে পাঠানদের বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গের আক্রমণ কতকটা ফিকে। পাঠান সৈন্য কর্তৃক অতর্কিতে দুর্গে প্রবেশ এবং বিমলার দুর্গে বন্দী হওয়া এবং পরে বিমলার পাঠান সৈন্যকে নিয়ে কিঞ্চিৎ আদিরসের অভিনয় যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোনো বাস্তব ধারণা দেয় না। জগৎসিংহের সঙ্গে ওসমানের দ্বৈত সমর ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শে পরিকল্পিত। মৃণালিনীতে যুদ্ধবর্ণনা নিশীথ রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো। বখতিয়ার খিলিজি অনায়াসে লক্ষ্মণ-

১. সম্প্রতি প্রকাশিত যদুনাথ সরকারের *Military System of India* গ্রন্থ এ সম্বন্ধে প্রচুর আলোকপাত করেছে।

সেনের রাজপ্রাসাদ দখল করে নিলে। (তবে যুদ্ধের একটা প্রকৃত পটভূমিকা প্রস্তুত করে বঙ্কিমচন্দ্র আসন্নসমরের প্রত্যাশাকে পাঠকচিত্তে দৃঢ় করে দিয়েছেন।) (চন্দ্রশেখরে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ কিংবা প্রতাপের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের যুদ্ধ আমাদের তেমন উৎকণ্ঠার আবেগে উদ্‌বেলিত করে না। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজ সমর নেহাৎ ইতিহাসের বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী। ঔপন্যাসিকের বর্ণানুলেপ সেখানে পাই না। প্রতাপের যুদ্ধবর্ণনায় প্রকৃত বীরত্বের আভাস আছে। কিন্তু প্রতাপের যুদ্ধ আত্মবিসর্জনের জন্য। যুদ্ধ-বর্ণনা অপেক্ষা আত্মত্যাগের মহৎ ভূমিকাটির উপরই বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছেন বেশি।) আনন্দমঠ-সীতারামের যুদ্ধবর্ণনা প্রকৃত দেশনিষ্ঠার মহান্ আদর্শের দ্বারা উদ্‌বোধিত। ভবানন্দ ধীবানন্দ, সত্যানন্দ যে-কৌশলে নবাব এবং ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করেছে তাতে করে যুদ্ধপ্রণালীর বাস্তবতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ধারণা করে নিতে পারি। আনন্দমঠ-সীতারামের যুদ্ধবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির বীরত্ব-আকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করেছেন। সমস্ত সংগ্রামের পশ্চাতে আদর্শবাদের এমনই একটা সৌন্দর্য বিস্তার করে যা একাধারে ভীম ও কান্ত, কঠোর ও পৌরুষদীপ্ত। (রাজসিংহে এই যুদ্ধবর্ণনা আদর্শ-বাদের দ্বারা বিজড়িত হয়েও স্বতন্ত্র। এখানে বাহুবল প্রতিষ্ঠা করাই বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বাংলার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র বীরত্ব-সংগ্রামের তেমন কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুঁজে পান নি। তথাপি কল্পনাপ্রবণতার অসাধারণ বিকাশ ঘটিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধবর্ণনায় উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। রাজসিংহে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে সাহায্য পেয়েছেন। টডের গ্রন্থে তার ভূরি পরিমাণ বিবরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যুদ্ধের কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলেন রাজসিংহ উপন্যাসে। ফলে রাজসিংহ উপন্যাসেই বৃহৎ মোগলসৈন্যের ব্যূহ প্রবেশ থেকে রাজপুত সৈন্যের গোপন প্রদেশ থেকে অতর্কিত আক্রমণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন যে বর্ণনায় প্রকৃত-যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কূটনীতি ষড়যন্ত্র সবই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আদর্শ-বাদের সঙ্গে বাস্তবতার মিলনে রাজসিংহ উপন্যাসের যুদ্ধবর্ণনা অপরূপ দীপ্তি লাভ করেছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে 'স্বাধীনতা-হীনতায়' বাঙালি মর্মপীড়া অনুভব করেছিল। অথচ বাঙালি বীরের সন্ধান তখনও ইতিহাসে মেলে নি।) দুর্গেশনন্দিনী থেকে সীতারাম পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিবীরের কথা নানাভাবে বলেছেন। কিন্তু যথার্থ বীরত্বের আভাস দিলেও তিনি সার্থক বীরচরিত্র

ফুটিয়ে তুলতে না পেরে অতৃপ্ত ছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ-হেমচন্দ্র-প্রতাপ-সত্যানন্দ-ভবানন্দ-সীতারাম এই-সব চরিত্রের ব্যর্থতার কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। এই-সব পরিকল্পনা থেকে এ কথাই মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসে যা খুঁজেছিলেন তা পান নি। অতএব বাংলার বাইরের রাজপুত জাতির ইতিহাস সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অগস্ত্যতৃষ্ণা মেটালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর-আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানীতে নবাবী আমলের শেষ এবং ইংরেজ আগমনের প্রথম পর্ব উপস্থিত করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি আর একটি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। নবাবী আমলের যে সময়কে তিনি বেছে নিলেন সে সময়টি বিশৃঙ্খলার যুগ। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন 'নগড় পুড়িলে দেবালায় কি এড়ায়'। সমস্ত বাংলাদেশই তখন দগ্ধ অবস্থায় পরিণত। এই বিশৃঙ্খলা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরানীতে বিশেষ করে প্রকাশ করেছেন। নবাবী আমল যে আর চলবে না, সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন আনন্দমঠে। সুতরাং old order changeth yielding place to new। বাংলাদেশের যে অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন সে কথা উপন্যাস আলোচনায় বলেছি। দেবী চৌধুরানীতে বলেছেন 'তখন ইংরাজদের আইন হয় নাই। সব তখন বে-আইন'। এই বে-আইনী অবস্থার অবসান কিভাবে ঘটেছিল তার কিছু কিছু পরিচয় এই উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাবে। আচার্য যদুনাথ সরকার পলাশীর যুদ্ধবর্ণনার পর ইংরেজের আবির্ভাবকে যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন[১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তাই নানাভাবে আভাসিত।)

(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেখা যায়। এ বস্তুটি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। কেউ বা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী কেউ বা রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন বলে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। এ কথা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রাজশক্তির অনাচার, অত্যাচার, কূটনীতি, শোষণের কথাই নানাভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে যে মুসলনান ইতিহাস আমাদের জানা ছিল তা বঙ্কিম-চন্দ্রের বর্ণনা থেকে আরও বেশি মসীলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে প্রায়শই

১ দ্রষ্টব্য J. N. Sarkar (ed), *History of Bengal Vol. II* (Dacca University.)

অনাচ্ছন্ন ছিল তার প্রমাণ আয়েষা, ওসমান, নূরজাহান, মৃণালিনীর পাঠান সৈনিক, মীরকাশিম, দলনী বেগম, সীতারামের ফকির, মবারক-জেবউন্নিসা-দরিয়া চরিত্রগুলি। আমরা প্রত্যেকটি উপন্যাসের উৎস নির্ণয় করে দেখিয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে যা পেয়েছিলেন তাকেই উপন্যাসে যথাযথ বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি মুসলমানদের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন হতেন তবে মুসলমান চরিত্র তাঁর উপন্যাসে এত উজ্জ্বল, এত বাস্তব হত না। আর হিন্দু চরিত্রের মধ্যেও পশুপতির চিত্র আঁকতে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। গঙ্গারামকে পেতাম না যদি না বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ শিল্পী হতেন। উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পসত্তাই জয়ী হয়েছে। আর শিল্পী হচ্ছেন দলগতবিচারের ঊর্ধ্বে। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে সেই উদারতা ছিল।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত কতগুলি কৌশলের পরিচয় দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কতগুলি চরিত্রের পরিচয় অনেক সময়েই অজ্ঞাত থাকে পরে ঘটনার টানাপোড়েনে তাদের আত্মপরিচয় পাই। বিমলা, মনোরমা, মতিবিবি এই জাতীয় চরিত্র। আবার সাময়িক ভাবে নায়ক নায়িকার পরিচয় গোপন তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি, রূপসী নামে শৈবলিনী, নবীনানন্দ স্বামী নামে শান্তি, দেবী চৌধুরানী নামে প্রফুল্ল, অজ্ঞাত পরিচয়ে সীতারাম, দরিয়ার মোগল শিবিরে নর্তকীরূপ এই ভাবের পরিচয় বহন করে।

ব্যর্থতাজনিত উন্মত্ততা কয়েকটি চরিত্রে দেখি। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংহে দরিয়া এই জাতীয় ভূমিকা। বিষবৃক্ষের হীরাও তাই।

দৈবগণনার প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। মবারক-দরিয়ার জীবন, বীরেন্দ্রসিংহের শেষ পরিণতি, পশুপতি-মনোরমার স্বামীস্ত্রীর মিলনে বাধা, সীতারামের আত্মস্ত জীবনে শ্রীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরিচারিকা পর্যায়ের কতগুলি চরিত্র মনোরম। উপন্যাসের ঘটনার অগ্রগতিতে এদের কারও কারও পরোক্ষ প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। দুর্গেশনন্দিনীতে আশমানী, মৃণালিনীতে গিরিজায়া, চন্দ্রশেখরে কুলসম, কপালকুণ্ডলায় পেষমন্, রাজসিংহে দেবী এবং নির্মলকুমারী এই জাতীয় চরিত্র।

নিশীথরাত্রি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রহস্যময়তার দ্যোতনা দিতে প্রায়ই

উপস্থিত। দুর্গেশনন্দিনীর আরম্ভই নিশীথে, কপালকুণ্ডলার ডাকাতি এবং মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ নিশীথে, (কপালকুণ্ডলার দিনের কথা বিশেষ কিছু নেই) কাপালিকের সাধনাও নিশীথে। বস্তুত কপাল-কুণ্ডলায় প্রকৃতির অন্যান্য শক্তিগুলির সঙ্গে রাত্রিকেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। মৃণালিনীতেও পশুপতির রাত্রিকালে ষড়যন্ত্র, চন্দ্রশেখরে রাত্রিকালে কুলসম-দলনীর গুরগ্‌ণখাঁর গৃহে গমন এবং পরে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় লাভ, শৈবলিনীর রাত্রিকালে বিহ্বল অবস্থা এবং দুঃস্বপ্ন দেখা, সীতারামে নিশীথে সীতারামের দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধ, রাত্রিকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রাজসিংহে নিশীথে জেবউন্নিসার মবারকের সাক্ষাৎকার লক্ষণীয়। এ ছাড়া আরও রাত্রির বর্ণনা আছে। আমরা কয়েকটি মাত্র উদ্ধার করলুম।

মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ দুর্গেশনন্দিনী থেকেই পাই। অভিরাম স্বামী, চন্দ্রশেখরের গুরু, আনন্দমঠে চিকিৎসক, দেবী চৌধুরানীতে ভবানী পাঠক, সীতারামে ফকির এই জাতীয় চরিত্র। রাজসিংহে সন্ন্যাসী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই না। রাজসিংহে সে প্রয়োজনও ছিল না। কেননা রাজসিংহ সংযমী পুরুষ আদর্শ নায়ক।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিরোধ এসেছে প্রধানত নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করে। নায়ক-চরিত্রের পতনের কারণও প্রধানত এই। ওসমান, নবকুমার, হেমচন্দ্র, প্রতাপ, জীবানন্দ, সীতারাম এর উদাহরণ। আনন্দমঠের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন বাঙালি স্ত্রী অনেক সময়েই উন্নতির সহায়ক হয় না সে কথাই যেন অনেকগুলি উপন্যাসে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপকতা কম। নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণনায় তিনি সূক্ষ্ম দিগ্‌দর্শন করেছেন। কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্রতা তাঁর উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প।[১] একটি কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা অনেক সময়েই সাংসারিক জীব হয়ে উঠতে পারে নি।[২] প্রেম-সর্বস্ব চরিত্রগুলির একটি মাত্র দিকের প্রতিই তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। সেজন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে কাছের মনে হয় না। তারা যে জগতে বাস করে, আমাদের কল্পনাই তাদের স্পর্শ করতে পারে।

১ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড

২ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ত্রুটিবিচ্যুতি একেবারে নেই এ কথা বলা যায় না। কিন্তু আদিকর্মিদের বিচার ছিদ্রান্বেষণে হয় না তার সৃষ্টির মনোহারিত্বই আমাদের বিচার্য।)

এবারে উপন্যাসগুলির পরিচয় দিই।

দুর্গেশনন্দিনী

১৮৬৩-৬৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় সরকারী কাজ করছিলেন তখন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেন। খুলনায় আসবার আগে নেগুয়ায় (মেদিনীপুর) তিনি কিছুদিন ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলটি নানা কারণে ঐতিহাসিকদের কৌতূহল জুগিয়ে আসছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইবণী দুর্গে'র কথা আমরা সকলেই জানি। উড়িষ্যার সঙ্গে এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। যতদূর বুঝতে পারি মেদিনীপুর থাকার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যায় পাঠানদের ইতিবৃত্ত জানতে পারেন। এবং মেদিনীপুর অঞ্চলেব নানা দুর্গের নানা কিংবদন্তীও নিশ্চয়ই তিনি শুনেছিলেন। খুলনায় এসে মেদিনীপুরের এই স্মৃতিই বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতে কতকটা প্রেরণা দিয়েছিল এ অনুমান অসঙ্গত নয়। ইতিপূর্বে *Rajmohan's Wife, Indian Field* কাগজে অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ রাখেন। বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দুর্গেশনন্দিনী রচনা করার মূলে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন। দুর্গেশনন্দিনী রোমান্স। তখন স্কট বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শিক্ষিত বাঙালির কাছে যে কয়েকজন বিদেশী লেখক আদরণীয় হয়েছিলেন তার মধ্যে স্কট অন্যতম। বহু আলোচিত এবং বহুকথিত দুর্গেশনন্দিনী প্রসঙ্গে স্কটের আইভ্যানহোর কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করবার পূর্বে আইভ্যানহো পড়েন নি বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিবাদ না করেও এই কথা বলা যায় যে আইভ্যানহো এবং দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে অনেক। এ সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আইভ্যানহোর ছায়া দুর্গেশনন্দিনীতে আছে। সদৃশ বিষয়গুলি নিয়ে অনেকেই আলোচনা অরেছেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ই প্রথমে এই সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী লেখবার প্রত্যক্ষ প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁরই এক আত্মীয়ের নিকটে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী রচনার পশ্চাতে যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা উদ্ধারযোগ্য—

> আমাদের খুল্লপিতামহ একশত আট বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ...তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত, উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের কথা। ...তাঁহার নিকট `বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছেন, যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি লোকমুখে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল। মেজঠাকুরদাদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন, এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎ সিং তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়সক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল।১

চব্বিশ বৎসর বয়সে সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে গ্রন্থ রচনা করলেন প্রকাশমাত্রই তা বাঙালির হৃদয় মন লুঠ করে নিল। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর ইতিহাস মুখ্যত পেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাও সাহেবের রচিত ইতিহাস থেকে। সে ইতিহাস তখনকার দিনের প্রচলিত ইতিহাসের মতোই। নানা গালগল্প ও কিংবদন্তীর দ্বারা ডাও সাহেব ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন। উপন্যাসের পক্ষে ইতিহাস খুবই কাজে লেগেছিল। এ ছাড়া সেকালে পরিচিত স্টুয়ার্টের *History of Bengal* বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য প্রেরণাস্বরূপ হয়েছিল।

ইতিহাসের সামান্য তথ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার দ্বারা উপন্যাসের পাত্রে বিস্তৃত করলেন। দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে এ কথা বলতে পারি বাংলাদেশের পুরাকীর্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। দেশচর্চার সুপরিচিত বাণীটি এই উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে, যদিও তা ক্ষীণ। পূর্বে যে অনুমান করেছি তার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোক্ত মন্তব্য তুলে দিচ্ছি। গড়মান্দারণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

১ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল, এই জন্যই তাহার নাম গড় মান্দারণ হইয়া থাকিবে। নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত, এক স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দারা পার্শ্বস্থ একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির দুই দিক্ বেষ্টিত হইয়াছিল; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টালিকা আমূলশিরঃ পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত, দুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ দুর্গমূল প্রহত করিত। অদ্যাপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন, দুর্গের নিম্নভাগমাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে, অট্টালিকা কালের স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে এ কথা বুঝতে পারি যে গড় মান্দারণের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। আর একটু খেদ অথবা আক্ষেপও ধ্বনিত হয়েছে। এই আক্ষেপটুকু মূল্যবান্। অতীতের প্রতি আমাদের যে আগ্রহ থাকে এবং মৃত অতীতকে জানবার জন্যে যে অদম্য কৌতূহল জাগ্রত হয় তাই থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়।

মান্দারণ এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল।[২]

এই সৌষ্ঠবশালী নগর এবং তার অধিকারীকে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে স্পষ্ট করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে'— বলা বাহুল্য, কালের করাল স্পর্শ থেকে ধূলিরাশির মূক বেদনাকে বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে বাঙ্ময় করেছেন। এইখানেই বঙ্কিমের কল্পনাপ্রবণতার মূল্য।

স্টুয়ার্টের ইতিহাসে মানসিংহের যুদ্ধযাত্রার যে ইতিহাস পাই বঙ্কিমচন্দ্র তার একটু ব্যত্যয় করেছেন। স্টুয়ার্টে আছে মানসিংহ ৯৯৮ সালে অভিযান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ৯৯৬ সালে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের কথা অবতারণা করেছেন। এবং তা স্টুয়ার্টের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ মাত্র। কেবল জগৎসিংহকে সেনাপতিত্বে বরণ (৪র্থ পরিচ্ছেদ, নবীন সেনাপতি) অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাপ্রসূত। জগৎসিংহ এই গ্রন্থের নায়ক। সুতরাং সমরোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই তাকে শৈলেশ্বরের মন্দিরে বীর সৈনিকরূপে চিত্রিত করেছেন। অসহায় স্ত্রীলোককে নিরাপদে রাখবার জন্যে ইংলণ্ডের নাইটরা যে ভাবে

১ দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
২ প্রথম সংস্করণে এই অংশ ছিল না। কিন্তু এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

খ্রীস্টানদের আশ্রয় দান করতেন এখানেও সেই রূপই পাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদটি রোমান্সের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মানসিংহের পুত্র রাজপুত জাতির নানা গুণে ভূষিত হয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। সমস্ত মোগল সেনাপতিরা যখন পঞ্চদশসহস্র কিংবা দশসহস্র সেনার কমে বাংলা দেশে পাঠান আক্রমণে অগ্রসর হতে চায় নি তখন জগৎসিংহ মাত্র পঞ্চসহস্র সেনা নিয়ে অভিযানে অগ্রসর হলেন। আমাদের মনে হয় রাজপুতবীরের এই গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র টডের রাজস্থান থেকে পেয়েছিলেন। টড বহু রাজপুত বীরের বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে প্রয়োজনীয় এই অংশটি রচনা করতে বীরপ্রসবিনী রাজস্থানের কথা স্মরণ করেছেন।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠান চরিত্র অঙ্কনের উৎস নির্ধারণ করি। পাঠানদের মধ্যে ওসমান এবং কত্‌লু খাঁই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওসমান বিমলার বিপদে সাহায্য করেছিল। সে সাহায্যের কারণ বুঝতে পারি। মাহরু (বিমলা) ওসমানকে একবার দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। উপকারীর প্রতি ওসমানের কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। নিজের প্রাণকে পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত করে সে বিমলার কর্তব্যে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু জগৎসিংহকে সে আশ্রয় দিয়েছিল কেন ? আয়েষার প্রতি প্রেমই এই কাজের জন্যে দায়ী এমন মনে করি না। বস্তুত ওসমান একজন বীর সৈনিক। তার এই আচরণের সঙ্গত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। শত্রুকে আতিথ্যদান করা ওসমানের চরিত্রে মহত্ত্ব এনে দিয়েছে সত্য, কিন্তু বিজেতার বিজিতের প্রতি এই আচরণ উপন্যাসের দিক থেকে কতটা কার্যকারণসম্মত, বঙ্কিমচন্দ্র তার জবাব দেন নি। মনে হয় পাঠানজাতির যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন তাই বঙ্কিমকে ওসমানচরিত্র এইভাবে পরিকল্পিত করতে সাহায্য করেছিল। যেজন্যে পাঠানের পক্ষে এ জাতীয় আচরণ স্বাভাবিক এ কথা পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা সবিস্তারে বলেন নি। পাঠান জাতি সম্বন্ধে সেকালে যে তথ্য বঙ্কিমের জানা ছিল তা উদ্ধার করছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে 'আফ্‌গান বা পাঠান জাতি' প্রবন্ধে এই তথ্যগুলি আছে,

> পাঠানদিগের প্রধান ধর্ম অতিথিসপর্যা; তৎসাধনে তাহারা সর্বদা অনুরক্ত থাকে, সহস্র অনিষ্ট ঘটিলেও কোনক্রমে তৎকর্মে বিরত হয় না। ...তাহাদিগেরও প্রধান পৌরুষ অতিথিসেবা ১

১ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২ পর্ব শকাব্দ ১৭৭৫, ১৮ খণ্ড

জগৎসিংহ কত্‌লু খাঁর অতিথি আয়েষা এবং ওসমানের আহত জগৎসিংহের প্রতি আচরণ তাদের জাতির ঐতিহ্য অনুযায়ীই হয়েছে বলে মনে করি। পাঠান জাতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বাধীনতাস্পৃহার কথা বলেছেন তাও ইতিহাসসম্মত। বিবিধার্থ সংগ্রহে আছে,

পরন্তু ইহারা স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর নহে, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগ এতদ্দজাতীয়-দিগের প্রধান ধর্ম। ১

পাঠানজাতির স্বাধীনতাস্পৃহা যেমন ছিল তেমনি তাদের চরিত্রের আর-একটি বিশেষত্বের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়।

আমরা সকলেই তুল্য এবং তুল্যতা রক্ষার্থে সর্বদা কলহ, ও শত্রুভয় ও পরস্পর রক্ত-মোক্ষন করিয়াও সুতৃপ্ত আছি, কিন্তু কদাপি পরাধীনতা সহ্য করিতে পারি না। অপিতু পরাধীনতার শৃঙ্খল পুষ্পহারের তুল্য লঘু হইলেও কি তাহা ভদ্রলোকের গ্রাহ্য। ২

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠানদের স্বাধীনতার স্পৃহার কথা যেমন বলেছেন তেমনি এই কলহপ্রবণতাকে প্রকারান্তরে নিন্দা করেছেন। ওসমান জগৎসিংহের কাছে যে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল তা নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত পাঠান জাতির 'রক্ত মোক্ষণে সুতৃপ্ত মনোভাবটি' বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানের চরিত্রে আরোপ করেন নি। তাতে করে চরিত্রটির মহত্ত্ব বেড়েছে। দ্বিতীয় আর-একটি কারণ উল্লেখ করতে পারি এবং সেইটিই মুখ্য। ওসমান জগৎসিংহকে বলেছে—

ইতিপূর্বেও ত আক্‌বর সাহা উৎকল জয় করিয়াছেন, কিন্তু কত দিন তথাকার করগ্রাহী ছিলেন? এবারও জয় করিলে, এবারও তাহা ঘটিবে। না হয় আবার সৈন্য প্রেরণ করিবেন; আবার উৎকল জয় করুন, আবার পাঠান স্বাধীন হইবে। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে; কখনও অধীনতা স্বীকার করে না; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখন করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম। তবে আর রাজপুত পাঠানের শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া কাজ কি? ৩

বঙ্কিমচন্দ্র আত্মকলহে ভারতবাসীর জীর্ণ ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখেছিলেন। কলহে দিনের পর দিন ভারতবর্ষের সুখশান্তি অন্তর্হিত হচ্ছিল। হিন্দু আমলেরও সেই ইতিহাস। রাজপুত জাতির জীবনসন্ধ্যার কারণও তাই। সুতরাং ওসমান জয়সিংহের কাছে যে প্রস্তাব করেছিল তাতে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিচক্ষণতার অপরূপ চিত্র পাই। পাঠান এবং মোগল দ্বন্দ্বে সাধারণ প্রজা-

১ বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, ১৭৭৪ বৈশাখ, ৮ম সংখ্যা
২ ঐ
৩ দুর্গেশনন্দিনী, ২য় খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ

সাধারণের বিনষ্টি, দেশের ক্ষতি। অতএব পরস্পরের সম্প্রীতির মধ্যেই ভারতবর্ষের যথার্থ শুভ। বিবাদ বিসম্বাদ যে জাতিকে অধঃপতিত করে তা মৃণালিনীতে সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতেই এই মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্যটিকে প্রকাশ করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে কেবল পাঠান রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের চিত্র আঁকেন নি, প্রসঙ্গত বাঙালির বাহুবল প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির হীনমন্যতার, নিশ্চেষ্টতার প্রতি মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন। তারই ফলে গড় মান্দারণের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করলেন। দুর্গস্বামীর বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালেন বীরেন্দ্রসিংহ।

'পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে' ওসমানের এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের। একালের বাঙালিকে বঙ্কিম সচেতন করে দিতে চেয়েছিলেন। আবার অন্য দিকে বাঙালিও একদা যে সাহস শক্তির অধিকারী ছিল সে-বস্তুও বীরেন্দ্রসিংহ চরিত্রে সুস্পষ্ট। অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষ নিতে বলেছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মানসিংহ সম্বন্ধে বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা প্রসন্ন ছিলেন না। একমাত্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর কমলাদেবী উপন্যাসে মানসিংহের প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসে বীরেন্দ্রসিংহের জবানিতে সে কথা বলেছেন। মানসিংহ আকবরের দাস। সুতরাং যে রাজপুত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করে তাকে বীরেন্দ্রসিংহ সমর্থন করতে পারেন নি। তবে সূক্ষ্ম বিচারে মানসিংহের প্রতি বীরেন্দ্রের আচরণের একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা যেতে পারে। বীরেন্দ্র এবং বিমলা যখন মানসিংহের অন্তঃপুরে আলাপে ব্যস্ত তখন মানসিংহই সেখানে বাধাস্বরূপ হয়েছিলেন। অবশ্য মানসিংহ এমন কোনো অসঙ্গত আচরণ করেন নি যার দ্বারা বীরেন্দ্র ক্রোধান্বিত হতে পারেন। তথাপি বীরেন্দ্রের মতবাদের সঙ্গে মানসিংহের মতবাদের পার্থক্য ছিল। কত্‌লু খাঁর নির্মম বিচারে বীরেন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড হল। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যটি অঙ্কন করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার অসাধারণ বিকাশ দেখিয়েছেন। এক দিকে বীরেন্দ্রের মৃত্যুভয়হীন সাহসিকতা অন্য দিকে যবনস্পৃষ্ট কন্যার মুখদর্শন না করার সংকল্প তাঁকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দান করেছে। বীরেন্দ্রের মৃত্যুদৃশ্যটি মহৎ গৌরবে ভূষিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই মৃত্যু দেশের এবং জাতির ও ধর্মের জন্যে মৃত্যু।

বিমলার আবির্ভাবটি চকিত এবং চমকপ্রদ। রোমান্সের বিস্তার এবং মহিমাও তাতে সংহত হয়েছে।

জগৎসিংহ যে-ভাবে পাঠানশিবিরে বন্দী হয়েছিলেন তাও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার মৌলিকতার দাবি রাখে। স্টুয়ার্ট লিখেছেন, পাঠানরা জগৎ-সিংহকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বন্দী করে (Surprised his camp, took him prisoner)। বঙ্কিমচন্দ্র আকস্মিকতার ব্যাপারটি রেখেছেন, কিন্তু বিমলার অনবধানতার সুযোগটি উপন্যাসে বিস্তৃত করে ইতিহাসের পঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এক দিকে জগৎসিংহের প্রেমের দুর্বার আকর্ষণ অন্য দিকে বিমলার ত্রস্ত মনোভাব এই দুইই জগৎসিংহের বিপদ ডেকে এনেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্যকে অবিকৃত রেখেও বঙ্কিমচন্দ্র গল্পরসের জোগান দিতে পেরেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে চরিত্রকল্পনা রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক গল্পটিতে যে রোমান্স রস পরিবেশন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন-কি সফল স্বপ্নের আরম্ভটিও দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম পরিচ্ছেদে কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয়েছে। রোশিনারার প্রভাব রয়েছে আয়েষা চরিত্রে। জগৎসিংহ শিবজীর অনুরূপ। রামদাস স্বামী অভিরাম স্বামীর রূপ নিয়েছে। তবে জগৎসিংহের মধ্যে শিবজীর কূটনীতিপরায়ণতার ছাপ নেই, রামদাস স্বামী নিছক সন্ন্যাসী পুরুষ। অভিরাম স্বামীর শশিশেখর ভট্টাচার্য রূপটিতে মানবিকতার স্পর্শ রয়েছে। রোশিনারার প্রেম ব্যর্থ, অয়েষার প্রেমও ব্যর্থ।

তিলোত্তমা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। গ্রন্থে তার আবির্ভাব কয়েকবার মাত্র। যে-কয়েকবার তাকে পাই প্রায় প্রত্যেকবারই তাকে ভীতচকিত অসহায় রূপেই দেখি। নরনারীর সহানুভূতিকে সে এক মুহূর্তেই জয় করে নেয়। তিলোত্তমা চরিত্রের সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়েছেন তার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রচলিত রূপবর্ণনা প্রকরণ বঙ্কিমচন্দ্রও গ্রহণ করেছেন। তিলোত্তমার জন্যেই জগৎসিংহের বিপদ এসেছিল। একি সেই পৌরাণিক কাহিনীরই অনুস্মৃতি ? বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত তিলোত্তমার মধ্যে সেই স্বর্গীয় দ্যুতি আরোপ করেছেন। আয়েষার সামনে এসে সে প্রগল্‌ভা হয়। সে প্রকৃতির সযত্নে লালিত,

বাল্যকালে মাতৃহারা, পিতার স্নেহে বহুকালবঞ্চিত। এই নারীর অপার্থিব সৌন্দর্য আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আয়েষাও রোমান্সরাজ্যের। কিন্তু সে একটু প্রগল্‌ভা। আর একটু তৎপর। আবেগকে সে রুদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু আয়েষার রূপ ইউরোপীয় উপন্যাসের নারীচরিত্রের অনুরূপ হলেও পাঠান নারীর পক্ষে এইরকম আচরণ খুব স্বাভাবিক নয়। বিবিধার্থ সংগ্রহে আফ্‌গান রমণীদের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উক্ত প্রবন্ধে আছে পাঠান নারীর স্বাধীন এবং গোপন প্রণয় একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। পাঠান নারীসমাজ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও আছে সেই প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথা মনে রেখেছিলেন। কিন্তু আয়েষার মধ্যে পাঠান বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা নারীর চিরন্তন আদর্শই প্রবল হয়েছে। বাঙালি চরিত্রবৈশিষ্ট্যও সে একেবারে বর্জন করে নি। এতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয় তাতে সন্দেহ নেই। তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ ব্যাপার চলে এসেছে অনেককাল। পাঠক আয়েষাকে দেশজ করে পেয়েছিল বলেই দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

জগৎসিংহ এবং ওসমানের ভূমিকায় নাইটদের অনুস্মৃতি আছে। জগৎসিংহ এবং ওসমানের দ্বৈতযুদ্ধে, প্রেমের বর্ণনায়, নারীর পবিত্রতা রক্ষায়, সাহসিকতায় এই দুটি চরিত্র পাশ্চাত্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির সমতুল্য। জগৎসিংহ একরঙা। তার ভূমিকাও কাহিনীর দিক থেকে সংকুচিত, তথাপি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, জগৎসিংহ চরিত্রে বঙ্কিম যে গুণগুলি আরোপ করেছেন সেগুলি তার ইতিহাস পড়ে পাওয়া। আর এ কথা ভুললে চলবে না যে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস। সুতরাং প্রথম রচনার উচ্ছ্বাস এতে আছে। দুর্গেশনন্দিনী দোষত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু এই উপন্যাসেই বঙ্কিমের প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসগুলির অপরূপ চরিত্রচিত্রণের আভাস পাই এই উপন্যাসে। তিলোত্তমা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জগৎসিংহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। তার ব্যাকুলতা এবং প্রেমের তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু দুর্বল ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে এই দৃশ্যটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে পাঠকের দ্বিধাকম্পিত মনোভাবকে বঙ্কিম তীব্রভাবে আঘাত করেছেন, জগৎসিংহ কর্তৃক তিলোত্তমার অবমাননার দ্বারা। কিন্তু এইটিই স্বাভাবিক।

জগৎসিংহ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে এই দৃশ্যটিতে। তিলোত্তমার চরিত্রেও কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। রাজপুত জাতির চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই দৃশ্যে প্রকাশিত হয়েছে। জগৎসিংহের চরিত্রে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, বোধ-করি বঙ্কিমচন্দ্র ঘাতপ্রতিঘাতময় চরিত্র আঁকতেও চান নি। কিন্তু জগৎসিংহ চরিত্র পরবর্তীকালে অনেক ঔপন্যাসিককে মুগ্ধ করেছিল। ঐতিহাসিক উপ-ন্যাসের type চরিত্রের সূত্র জগৎসিংহ ভূমিকায়। জগৎসিংহের মতো ওসমান চরিত্রটি নির্দ্বন্দ্ব নয়। ওসমান পাঠান, প্রেমের ঈর্ষাকুটিল মনোভাব তার মধ্যে দেখা যায়। আয়েষার কাছে প্রেম নিবেদন এবং আয়েষা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আয়েষার জগৎসিংহের প্রতি প্রেম নিবেদন ওসমানকে উদ্‌বেজিত করেছিল। সুতরাং ওসমানের আচরণের মধ্যে মানবোচিত ভূমিকা সুস্পষ্ট। ওসমান চরিত্রটি বঙ্কিম সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। পূর্বে সে কথা উল্লেখ করেছি। পুনরায় একটি দৃশ্যের কথা আলোচনা করি। জগৎসিংহ এবং ওসমানের সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিতে তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে। মানসিংহের পুত্র প্রধান সেনাপতি, সে যথার্থ বীর। অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে বলেছেন পাঠানকুলতিলক। জগৎসিংহ নবীন যুবক, বাহুবলই তার ঐশ্বর্যের চূড়া। ওসমান বীর এবং সাহসী তদুপরি অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ়। প্রকৃত সেনাপতির মধ্যে যে ধীরতা লক্ষিত হয় ওসমানের সংলাপে তাই পাই। লেখক দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ওসমানের সেই ধীর বিচারশক্তির নিদর্শন দিয়েছেন। ওসমান মোবারকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে যে প্রেমের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন তা বাস্তব-অভিজ্ঞতাসঞ্জাত নয়। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলেছেন স্কট 'Fatherly way'তে প্রেমচিত্র অঙ্কন করেছেন। বঙ্কিমের প্রেমদৃশ্য বর্ণনায়ও এই অভিভাবকোচিত মনোভাবের পরিচয় পাই।

বিমলা বঙ্কিমের অভিনব সৃষ্টি। বিমলাকে প্রচলিত কোনো সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না। তিলোত্তমা এবং জগৎসিংহের বিবাহের প্রস্তাবে সে যে দুঃসাহসিক মন্তব্য[১] করেছিল তা তার চরিত্রের অনুযায়ী। অভিরাম স্বামী বিমলাকে পাপীয়সী বলে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু বিমলা স্বাধীন

১ দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ

প্রেমের জয়ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। বিমলা যে দুঃসাহসিক কাজ করেছে তার মধ্যে রোমান্সের কৌতূহল, আকস্মিকতা এবং রহস্য প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে। স্বামীহত্যার প্রতিশোধ সে যে-ভাবে নিয়েছে তাতে করে সাময়িকভাবে তার উন্মাদিনী রূপকে পাঠক সমর্থন করে। বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার চরিত্রের গৌরব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয়বার বিমলার শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে। বিমলা প্রথমেই জগৎসিংহকে অভিবাদন করলে না। শৈলেশ্বরের বিগ্রহকে প্রণাম করে জগৎসিংহকে অভিবাদন করলে। বিমলা চরিত্রের এই আভিজাত্য আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ চলে গেলে নির্জন প্রান্তরে বিমলার আশঙ্কা স্ত্রীজনসুলভ। প্রগল্‌ভা সাহসিকা বিমলার এই দুর্বলতা তার মানুষী রূপটিকে চিনিয়ে দেয়। অন্যান্য বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিমলার প্রভাব গুরুতর।

দ্বিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার স্বপ্নবৃত্তান্তটি লক্ষণীয়। স্বপ্নবৃত্তান্ত বঙ্কিমন্দ্রের উপন্যাসে একটা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বঙ্কিম উপন্যাস রচনা করবার একটা কৌশল হিসেবে স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। দুর্গেশনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত তিলোত্তমার স্বপ্নদেখার পরে বলা। এই উপস্থাপন কৌশলটি অনেক সমালোচকের প্রশংসা পেয়েছে।[১] দুর্গেশনন্দিনীর সূচনা রোমান্টিক। ঝড়, নৈশ অন্ধকার, পথের দুর্গমতা, অপরিচিত স্থানের ভীতি, নির্জনতা সব মিলে রহস্য এবং কৌতূহলের সৃষ্টি করে। সূচনা অংশটির কাব্যসৌন্দর্য বাঙালির হৃদয় জয় করেছিল। একজন অশ্বারোহীর এইরকম নির্জন প্রান্তরে যাত্রার দৃশ্য বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে অনেক ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের রহস্যঘনিমা চিত্রিত করতে এই উপায়টি ঔপন্যাসিকদের খুবই প্রিয় ছিল। নায়িকার রূপবর্ণনায়, অপার্থিব সৌন্দর্যের অবতারণায়, বীরোচিত কার্যাবলীতে, দুর্গের বর্ণনায়, বিমলার দুঃসাহসিকতায়, ওসমান জগৎসিংহের দ্বৈতযুদ্ধে, তিলোত্তমার নিশীথে পাঠান শিবিরে জগৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দৃশ্যে রোমান্সের রস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

বিমলার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র সূচনাতে উদ্‌ঘাটন করেন নি। বলা বাহুল্য,

১ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

গল্পরস জোগান দেবার পক্ষে এইটি উপযোগী হয়েছে। বিমলার সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল বাড়তে থাকে। সে কৌতূহল যখন তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠে তখনই অকস্মাৎ কোনো একটি চরম মুহূর্তে লেখক পাঠকের প্রত্যাশাকে তৃপ্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনা করবার এই কৌশলটিও সকলেই গ্রহণ করেছিলেন। নায়ক-নায়িকার পরিচয়কে অজ্ঞাত রেখে গল্পরসের জোগান দেওয়ার রীতি আমাদের ঔপন্যাসিকদের আর-একটি পরিচিত কৌশল ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ, বিদ্রোহ এবং চণ্ডীচরণ সেন ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি তুলনীয়।

জ্যোতিষগণনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। এই জ্যোতিষ-গণনাকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কৌশলে কাজে লাগিয়েছেন। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহ ইত্যাদি ধরা পড়েছিল মোগলসেনার হাতেই। যে মোগলসেনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রকে মোগলের পক্ষ অবলম্বন করতে বলেছিল সেই মোগলই তাদের বন্দী করল। এই জ্যোতিষগণনাই পরবর্তী রচনায় কত সূক্ষ্মভাবে এবং কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন তার প্রমাণ সীতারাম উপন্যাস। শ্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবে। সেজন্যে সে সীতারামকে ছেড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার ভ্রাতা গঙ্গারামের প্রাণসংহার করেছিল। ট্রাজেডির পরিণতিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জ্যোতিষগণনার ব্যবহার বঙ্কিম-উপন্যাসের একটা পরিচিত কৌশল।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এবং আশমানির চিত্র হাস্যরস জোগান দেবার জন্যে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেন নি। অন্তত দুর্গেশনন্দিনীতে রবীন্দ্রনাথ-কথিত নির্মল বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সে কথা জানতেন। সেজন্যে পরবর্তী সংস্করণে তিনি অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশগুলি বর্জন করেছিলেন।

বঙ্কিমের জীবিতকালে দুর্গেশনন্দিনীর তেরোটি সংস্করণ বার হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ সৌভাগ্য সে যুগে খুব কম ঔপন্যাসিকের ভাগ্যেই জুটেছে। ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের এই উপন্যাসই বাংলা রোমান্সের দ্বার খুলে দিল। এই উপন্যাসটিরই অনুকরণ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি।

কপালকুণ্ডলা

দুর্গেশনন্দিনী বার হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই হয়েছিল। তবে এটা বোঝা গেল বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে রোমান্সসম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের বর্ণাঢ্য চিত্রগুলি আরও উজ্জ্বল, আরও চমকপ্রদ।

উপন্যাসটি বার হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম সংস্করণ থেকে পরে একটি পরিচ্ছেদ (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে) পরিত্যক্ত হয়। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় কাহিনীর পরিণতির একান্ত কারণস্বরূপ একটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। কপালকুণ্ডলার পরিত্যক্ত অংশটি উপন্যাসটির ব্যাখ্যামূলক অংশ। অপ্রয়োজনীয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র এইটি পরিত্যাগ করেন। কপাল-কুণ্ডলা লেখবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীযরের নাটক বেশি পড়তেন। কপাল-কুণ্ডলায় তার ছায়াপাত। কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় মিরাণ্ডার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। মিরাণ্ডা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ পাই শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা প্রবন্ধে।[১] শকুন্তলার আরণ্যক জীবনের কল্পনাদ্বারা কপালকুণ্ডলা প্রভাবিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় কপালকুণ্ডলার গঠনশিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের কাছে বেশি ঋণী। কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের সন্দেহ ওথেলোর ঈর্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্র্যাবেনশিওর অভিশাপ নিয়েই ওথেলো জীবনযাত্রা শুরু কবেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে কাপালিকের ক্রোধকে অদৃশ্য রেখেছেন কিন্তু পটভূমি হিসেবে এর অলক্ষ্য প্রভাব দেখা যায়। ওথেলোকে নিয়ে ইয়াগো ক্যাশিও এবং দেসদিমোনার আলাপ শুনিয়েছিল। ওথেলোর ঈর্ষা তারই ফল। কাপালিক নবকুমারকে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার কথাবলার দৃশ্য দর্শন করালেন। নবকুমারের সংশয়ের ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলার সংযত উত্তর দেসদিমোনার মৃত্যু-কালীন উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং উপন্যাসটির পটভূমি এবং ভাবকল্পনার উৎসে আছে টেম্পেস্ট এবং শকুন্তলা। কিন্তু গঠনশিল্পে বেশি প্রভাব দেখি ওথেলো নাটকের। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যার ফলে এই প্রভাব জোবরা হয়ে লেগে থাকে নি।

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ

কপালকুণ্ডলা রচনার মূলে আরও কিছু প্রেরণা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াতে থাকবার সময় এক কাপালিকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়েরা বলেছেন এই কাপালিকের প্রত্যক্ষ প্রভাব কপালকুণ্ডলার কাপালিক ভূমিকায় আছে।[১] কাপালিক কর্তৃক যদি কোনোও স্ত্রীলোক ষোলো বৎসর সমাজের বাইরে বনমধ্যে প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হয়ে সমাজের সংস্পর্শে আসে তবে তার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নটি নিয়ে ভেবেছেন এবং অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের এবং নাট্যকার দীনবন্ধুর কাছে উত্তরও প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁদের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি।[২] মতিবিবির কাহিনীরও উৎস খুল্লপিতামহের মুখে শোনা কোনো গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর ছায়ায় পরিকল্পিত।[৩] হুগলি কলেজে পড়ার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র একদিন কিভাবে নিবিড় কুয়াশার মধ্যে পড়েছিলেন, কিভাবে মাঝিদের দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল তাই যেন প্রকারান্তরে কপালকুণ্ডলার সূচনায় দেখা দিয়েছে।[৪]

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কাল আকবরের রাজ্যাবসানের ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সময়। এই সময়কার বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র যা দিয়েছেন তা মোটামুটি তথ্যনিষ্ঠ। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের একটা লক্ষণীয় দিক আছে। সেইটি হচ্ছে দস্যুদের অত্যাচারের সংবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র মতিবিবিকে দস্যুহস্তে ফেলেছেন, কপালকুণ্ডলা খ্রীস্টিয়ান দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়ে পরিত্যক্তা। এমন-কি মতিবিবি বিবাহের পর পাঠান কর্তৃক বন্দী। কাহিনীটির আরম্ভ হচ্ছে পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচার কাহিনী দিয়ে। দস্যুদের এই অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনীগুলি কপালকুণ্ডলায় একটা ভীতিবিহ্বল পরিবেশের সৃষ্টি করে। কপালকুণ্ডলার উপন্যাসের সৌন্দর্য-বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচকগণ বলেছেন যে এর সৌন্দর্য ভীমকান্ত রূপের সঙ্গে তুলনীয়। এক দিকে কাপালিকের ভয়ংকরমূর্তি অন্য দিকে কপালকুণ্ডলার অপার্থিব সৌন্দর্য, এক দিকে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা অন্য দিকে তরঙ্গের

১ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী
২ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ
৩ ঐ
৪ ঐ

গর্জন এই উভয়রূপই পাঠককে মুগ্ধ করে। আমাদের মনে হয় দস্যুদলের উপদ্রবের সূচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই পাঠককে ক্রূর অদৃষ্টের অতর্কিত আঘাতের জন্যে প্রস্তুত করে তুলেছেন।

কপালকুণ্ডলার ঐতিহাসিক অংশ বেশি নয় এবং তা উপন্যাসে প্রাধান্যও বিস্তার করে নি। কপালকুণ্ডলা ঐতিহাসিক উপাখ্যানও নয়। মূল ঐতিহাসিক অংশের বিচারের আগে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কথা বলি। সপ্তগ্রামের প্রাচীন গৌরব তখন লুপ্তপ্রায়। অধিবাসীদেরও সেই অবস্থা। সপ্তগ্রামে নবকুমারের বাসস্থান নির্বাচন করে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের মোহময় রূপটিকে যেমন স্পষ্ট করেছেন তেমনি একটা অতৃপ্তজনিত খেদও ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। নবকুমারের সুকুমার চরিত্রের যে মহত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র সূচনায় বলেছেন তার প্রতি পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করা যে চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য তার প্রতি আমাদের সমবেদনা স্বাভাবিক। কিন্তু নবকুমারের দৃষ্টি আবিল হয়েছিল। সে গৌরব শেষ পর্যন্ত সে হারিয়েছিল। উপন্যাসে নবকুমারের এই পরিবর্তনের জন্য বিষণ্ণতা বিস্তৃত। পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রটির অন্তরঙ্গ যোগ এইখানে।[১] সপ্তগ্রামের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা স্টুয়ার্ট রেনেলের বই থেকে *History of Bengal*এ যেটুকু উদ্ধার করেছেন তা থেকেই নেওয়া। অংশটি উদ্ধার করছি—

> Saatgong or Sattagong, now an inconsiderable village, on a small creek of the Hoogly river, about four miles to the northwest of Hoogly, was, in 1556, and probably the European merchants had their factories. At that time Saatgong river was capable of bearing small vessels, and I suspect that its then course, after passing Saatgong, was by way of Adaumpore, Omptah end Tamlook.

বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন 'এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্যন্ত সর্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত', তাও স্টুয়ার্ট ২৭১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।

কপালকুণ্ডলার ঐতিহাসিক অংশের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অনেকখানি স্থান নিয়েছেন। এমন-কি গ্রন্থের বেশির ভাগ পরিচ্ছেদ মতিবিবির কাহিনীতে

১ কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু তখনও অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের এক নির্জন উপনাগরিক ভাগে নবকুমারের বাস।

পূর্ণ। এতটা স্থান জুড়ে থাকা সত্ত্বেও মতিবিবির কাহিনী কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের প্রধান কথা নয়। তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক বিবরণ কি কারণে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কপালকুণ্ডলার কাহিনী স্বল্পপরিসর। কপালকুণ্ডলার জীবনের যে সামান্য অংশ বঙ্কিমচন্দ্র বেছে নিয়েছেন, তাতে পটভূমির বিস্তার আশা করা যায় না। কাহিনীকে বিস্তৃত করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি যোজনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত নরনারীর সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রবাহে ইতিহাসের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে পড়ে কি ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া ঘটায় কপালকুণ্ডলায় তাও স্পষ্ট হয়েছে। মানুষের নিয়তি নির্ধারণে বাইরের পরিবেশ অনেকখানি দায়ী হয়। ইতিহাস সেরকম একটি বাইরের বস্তু এই উপন্যাসে। যে মতিবিবিকে নবকুমার বিস্মৃত হয়েছিল ইতিহাসের ঘটনাবর্ত সেই মতিবিবিকেই নবকুমারের সান্নিধ্যে এনে দিলে। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার পরিণতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উৎকলিত করি।

> অদৃষ্টের তাৎপর্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য সকলকে গতি-বিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অনিবার্য ফল, মনুষ্যচরিত্র অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মনুষ্যচরিত্রের অনিবার্য ফল, মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল, সুতরাং অদৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিযমের ফল; কিন্তু সেই সকল নিয়ম মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে।[১]

মানসিক ফলগুলির কথা মোটামুটি বুঝতে পারি। উপন্যাসটিতে ইতিহাস হচ্ছে ভৌতিক নিয়ম। বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে পরিচ্ছেদে J. S. Millএর একটি অংশ তুলেছেন। আমাদের মনে হয়, কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র আবিষ্কার ঐ মিলের মন্তব্যের মধ্যেও পাওয়া যাবে।[২]

> Real Fatalism is of two kinds. Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Œdipus holds that our actions do not depend upon our desires. Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined. The other kind, modified

১ কপালকুণ্ডলা, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে। (প্রথম সংস্করণ) পরিত্যক্ত
২ ঐ

Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, by our desires, and our desires by the joint influence of the motives presented to us of our individual character.

মিল কথিত joint influence ইতিকথা অবতারণার কারণটি ইঙ্গিত করে 'কখন কখন যে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্যসকল এরূপ দুর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক কবি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়'। পদ্মাবতীর অতর্কিত আবির্ভাব কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডি ঘনিয়ে তুলতে সহায়তা করেছিল।

কিন্তু কপালকুণ্ডলার ইতিকথার অন্য একটি সার্থকতা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার নৈপুণ্য তাতেই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। আগের আলোচনায় দেখলাম ইতিহাস বাইরের প্রতিনিধিস্বরূপ (Agent)। কিন্তু কপালকুণ্ডলায় ট্রাজেডিকে আরও গভীর আরও সুদূরপ্রসারী এক কথায় গৌরব সমুন্নতি দেবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখা যাবে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাধুর্য কেবলমাত্র তার অসামান্য রূপবৈভবের মধ্যে নেই। তার আচার-আচরণে এমনই একটা শক্তি ব্যঞ্জিত হযে ওঠে যা মানসিক নয়। একটি ক্ষুদ্র প্রাণের জন্যে কাপালিকের ঈর্ষা এবং মতিবিবির চক্রান্তকে প্রথম দৃষ্টিতে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার ট্রাজেডির জন্যে ইতিহাসেব কোলাহলকে সপ্তগ্রামেব জনবিরলতায় এনেছেন এই কারণে যে কপাল-কুণ্ডলার অন্তরঙ্গ ধৈর্য এবং দৃঢ়তা মনুষ্যসম্ভব নয়, এইটে দেখবার জন্যে। মতিবিবি জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নূরজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী, দিল্লীর ওমরাহবৃন্দ তার বশে। সেও শেষ পর্যন্ত সে ঐশ্বর্যসুখ পরিত্যাগ করে কপালকুণ্ডলার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ঐশ্বর্য যার করায়ত্ত, মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত সামগ্রী যখন তার কাছে, তখন সে স্বামীর সন্ধানে সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ঘটনা যদি কেবলমাত্র কোনো গৃহস্থের কুলত্যাগিনী বধূর ঈর্ষা হত তা হলে কপালকুণ্ডলার মহত্ত্ব পেতাম কি? সকলের অগোচরে যে শক্তির অধিকারী করে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার তিলোত্তমা মূর্তি গড়ে তুলেছেন তার পরিণাম-রমণীযতা দেখাতে গেলে রাজকীয় সমারোহের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

রবিকরাকৃষ্ট বারিবাষ্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে, তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না, কেহ মেঘ মনে করে না শেষে

অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্ধকারময়ী করিয়া বজ্রপাত করে। যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান হইল, আমরা এতদিন তিল তিল করিয়া তাহার বারি বাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার গৌরবোজ্জ্বল রূপকে এভাবে মেঘাবৃত করতে চেয়েছেন। নানাস্থান থেকে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছিল। সুদূর দিল্লীর অন্দর-মহলও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে বাংলার ক্ষুদ্র প্রান্তকে ব্যাপকতর ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপরে স্থাপিত করেছেন। রোমান্সের রহস্যমহিমার মধ্যে যে দুরবগাহ অতলস্পর্শ থাকে কপালকুণ্ডলায় তাই ব্যঞ্জিত। কপালকুণ্ডলায় নূরজাহানের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তা কল্পনাপ্রসূত হলেও ইতিহাসের সত্যকে লঙ্ঘন করে নি। বরং ইতিহাসের সম্ভাবনাকে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বিস্তৃত করেছেন। মতিবিবি এবং নূরজাহানের সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা নিপুণ। সেলিমের প্রতি মেহেরুন্নিসার আসক্তি থাকলেও স্বামীকে পরিত্যাগ করতে সে রাজী হয় নি। অবিশ্বাসিনী নারীর পরিণাম ভয়াবহ এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি তাদের নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট ছিল না। এই অসন্তোষই উপন্যাসে ঘটনার জটিল জাল রচনা করেছে। এমন-কি শ্যামাসুন্দরীর কৌতূহল উপযুক্ত সময়ে সংযমিত হতে পারে নি। গ্রন্থমধ্যে একমাত্র নূরজাহানই স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সেদিক থেকে এই নারী পরবর্তীকালে যে বিচক্ষণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল তার ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দিয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ঐতিহাসিকতার বিচার এইখানেই শেষ করি। কপালকুণ্ডলার আলোচনা এবং সৌন্দর্যবিশ্লেষণ বিভিন্ন সমালোচক করেছেন।[২]

মৃণালিনী

দুর্গেশনন্দিনী লেখার পরে বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন নি। সেজন্যে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করার পরও কিছুকাল ফেলে রেখেছিলেন। মধুসূদনের মতো তিনিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যাকরণশুদ্ধির

১ কপালকুণ্ডলা, গ্রন্থ খণ্ডারম্ভে, প্রথম সংস্করণ, পরবর্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত

২ গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব; শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড; শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

তথ্য চেয়েছিলেন। পণ্ডিতেরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা দুর্গেশনন্দিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। উৎসাহিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী ছাপান। প্রথম রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও উপন্যাসটি সাদরে বাঙালি পাঠকসমাজ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। বঙ্কিম এর পর কপালকুণ্ডলা লিখলেন। কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের ভূমিকা একেবারেই গৌণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তখন পর্যন্ত ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাবে প্রভাবিত। সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

> প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভেনহো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন পড়িতাম।[১]

মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণ থেকে পরিত্যক্ত অংশে স্কটের ব্রাইড অফ লেমরমুরের কথা বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। এই থেকেও বুঝতে পারি ইংরেজি উপন্যাসের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মৃত হন নি। সে যাই হোক দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের যে-কথা অস্ফুটভাবে ঘোষণা করেছিলেন মৃণালিনী উপন্যাসে তাই অন্যরূপ নিলে। দুর্গেশনন্দিনীতে বাঙালির হীনমন্যতার প্রতি বঙ্কিমের কটাক্ষ আছে। মৃণালিনীতে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ চলে গিয়েছে। এক অপরিসীম বেদনা নিয়ে তিনি মৃণালিনী লিখেছিলেন। উপন্যাসটিকে সকল সমালোচকই বঙ্কিমের উৎকৃষ্ট রচনা বলেন নি। সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের তথ্যবিরলতা বঙ্কিমের কাছে দুস্তর বাধা হয়েছিল। সে বাধা অপসারণ করতে তখন পর্যন্ত কোনো সার্থক ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে নি। সে কাজ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিয়েছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার শুভসূচনার দ্বারা। মৃণালিনীর মর্মবেদনা বঙ্গদর্শন প্রচারের মূলে কথঞ্চিৎ সক্রিয় ছিল এ কথা জোর করে বলতে পারি। বাঙালির ইতিহাস চাই কেন? কলঙ্ক অপনোদনের জন্যে।

মৃণালিনী বার হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। মিন্‌হাজউদ্দিনের সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বাঙালি জাতিকে সঙ্কুচিত করেছিল। এই ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হতে পারেন নি। অথচ ইতিহাসের ব্যত্যয় করা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কল্পনার আশ্রয় নিলেন। পশুপতির ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত কাহিনী উপন্যাসে জুড়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের একটা

১ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী

অসম্পাদিত সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মৃণালিনীর প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়েছে।[১] এই পরিত্যক্ত অংশে বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ার খিলিজীর ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। কুতুবউদ্দিনের কাছে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে বখ্‌তিয়ার মগধ জয় করার পর আহ্লাদ উৎসবে গজযুদ্ধের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। স্টুয়ার্টের *History of Bengal*-এ সে বর্ণনা আছে। বঙ্কিম তার অনুসরণ করেছেন। বখ্‌তিয়ারের চেহারার বর্ণনাও স্টুয়ার্ট অনুযায়ী। পার্থক্যও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ারের বীরত্ব হেমচন্দ্রের উপর আরোপ করেছেন। এমন-কি হস্তীকে নিহত করার পর বখ্‌তিয়ার যে উপহার পান তা তার অধীনস্থ কর্মচারীদের বিতরণ করেন —স্টুয়ার্টের ইতিহাসে তাই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল হেমচন্দ্রের বীরত্ব প্রদর্শন করা। সুতরাং হেমচন্দ্র অলক্ষে থেকে তীর ছুঁড়ে হস্তীবধ করেছিল সেরকম কথা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।[২]

বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে আর একটি বিষয় সুকৌশলে উত্থাপিত করেছেন। তখন বাংলার অরাজকতার যুগ। হিন্দুগৌরবের অধঃপতনের সময় পুরোহিত-তন্ত্রের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়। আত্মবলে অবিশ্বাস তখন বাঙালির বৈশিষ্ট্য। জয়দেবের কাব্যে আছে

> ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
> ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
> কেশব ধৃত-কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।

বলা বাহুল্য, ম্লেচ্ছ বলতে সেকালে যবনদেরই সম্ভবত বুঝিয়েছিল। দামোদরের পুরাণ উল্লেখ করে যবনদের আগমনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন সম্ভবত জয়দেবের সাক্ষ্যেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতির রচিত ছড়া পুথিতে অনুপ্রবেশ করানোর যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা যেমনি আধুনিক তেমনি চমকপ্রদ। কার্য-উদ্ধারের জন্যে পশুপতির এ জাতীয় কৌশল অবলম্বন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বহুকাল পরে 'জালালি কলিমা'য় যা লেখা হয়েছিল বঙ্কিমের বর্ণনায় যেন তারই আভাস পাই।[৩]

১ দ্রষ্টব্য মৃণালিনী প্রথম সংস্করণ

২ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী।

৩ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

পশুপতিকে মহম্মদ আলি যে অবস্থাতে পালাতে সাহায্য করেছিল তার সঙ্গে এ বর্ণনার সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়। মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনাকে অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়াতেই কল্পনা করেছেন। শাস্ত্রে গভীর বিশ্বাস এবং পারিষদবৃন্দের তুর্কী আক্রমণের ভয়ে আগে থেকেই পলায়ন মনোভাব মিন্‌হাজের বর্ণনার অনুসারী। কিন্তু মিন্‌হাজের বর্ণনা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই সন্দেহ প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতেই আসে। এইখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব। বঙ্কিমের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।১

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংশয় পরবর্তীকালে আরও দৃঢ় হয়। এখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কতগুলি প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক স্থান উদ্ধার করি।

সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন।২

অন্যত্র বলেছেন,

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্‌ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিন্‌হাজ্‌ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর।.......বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাঁহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই।........সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।৩

১ মৃণালিনী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ
২ বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন
৩ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭

সুতরাং উপন্যাসে যে-কথা অস্ফুট ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই বিস্তৃত করেছেন বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে। উপন্যাস রচনা করার সময়ে ইংরেজকৃত ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও তথ্যের অভাবে তাঁদের ইতিহাসকেই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিম যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তা তাঁর দূরদর্শিতার ফল। এখানে সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। বঙ্গবিজয় কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।[১] প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বখ্‌তিয়ারের আক্রমণ ঘটনাটিতে আস্থা স্থাপন করেন নি। লক্ষ্মণসেনের নানা গৌরবসূচক কার্যাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী কোনো সেনরাজার আমলে সম্ভবত বঙ্গবিজয় করেন। রাখালদাসের উক্তি স্মর্তব্য

> মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন-রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন-রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের সময় কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ..তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না।[২]

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Bengal Vol I* মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনিও মিন্‌হাজের বর্ণনায় কতগুলি গোলযোগ আছে বলেছেন। সে-সব সমস্যার সমাধানও করা যায় না। তিনি বলেন

> The story of the unopposed entry of Muhammad and his eighteen followers into the city raises grave doubts about the truth of the details of the campaign. At a time when Nadiya was apprehending an attack from the Turks, it is difficult to believe that the royal officers would remain ignorant of the movements of Muhammad

১ লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক, প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫।

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ

even when he had crossed the frontiers of the Sena Kingdom, and would readily admit a band of foreigners without any question.১

সুতরাং আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে এবং পরবর্তীকালের প্রবন্ধগুলিতে মিন্‌হাজের বর্ণনা সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তা সত্য। এই প্রসঙ্গে এইটিও লক্ষণীয় যে মিন্‌হাজের বর্ণনার আংশিক সত্যও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন। তা হলে বঙ্গবিজয় কাহিনী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় নি। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে কল্পনা করেছেন তা অনৈতহাসিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিকল্পনাটি একেবারে অলৌকিক কিংবা নিরালম্ব কিনা তাই আমাদের বিবেচ্য।২

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সুতরাং অনুরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সন্ধান করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাবলীর সঙ্গে বঙ্গবিজয় কাহিনীর সাদৃশ্য টেনেছেন। তিনি যেমন সপ্তদশ (মিন্‌হাজ-উদ্দীনের উল্লিখিত অষ্টাদশ অশ্বারোহী) অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনী বিশ্বাস করেন নি তেমনি বিশ্বাস করেন নি পলাশীর যুদ্ধে বাঙালির পরাজয় কাহিনী। সেকথা পরবর্তীকালে বলেছেন,

> বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র।...নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছেন। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত।৩

সুতরাং যে কৌশলে এবং যে হীন ষড়যন্ত্রের সাহায্যে পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজেরা জিতে সেরকম কারণেই বখ্‌তিয়ার বঙ্গবিজয় করেছিলেন, এই বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা। ফলে পশুপতির ভূমিকার অবতারণা। পশুপতির ষড়যন্ত্রের জন্যেই বখ্‌তিয়ার অতিসহজে বঙ্গবিজয় করতে সমর্থ হয়েছিল। মৃণালিনী উপন্যাসের এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন

১ R. C. Majumdar (edited), *History of Bengal Vol-I*

২ বঙ্কিমচন্দ্র বখ্‌তিয়ারের বিংশতি সহস্র সৈন্য নগরের প্রান্তে ছিল একথা বলেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতকে লঙ্ঘন করেছেন।

৩ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন ১২৮৭

বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।[১]

যে যুগে তথ্যবিরলতা কোনোও একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের আসার পরিপন্থী, এবং যে সমস্যার সমাধান অদ্যাবধি হয় নি সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনা যেমন একটি কার্যকারণসূত্রে বিধৃত সমাধান তেমনি ঐতিহাসিক বোধের পরিচায়ক। মৃণালিনীর পরিকল্পনায় এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বড়ো সাফল্য বলে মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃদ্ধ রাজার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনার অনুযায়ী। কিন্তু এখনকার গবেষণায় লক্ষ্মণসেন বিদ্যোৎসাহী এবং রণজয়ী পুরুষ ছিলেন তাই প্রমাণিত হয়েছে। পশুপতি চরিত্রের সঙ্গে কিন্তু মিরজাফরের তুলনা করা যায় না। পশুপতির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, রাজনীতিতে সে দক্ষ। মনোরমার প্রতি তার প্রেমও নিরাবিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তার পতনের কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র পশুপতির এই ষড়যন্ত্রকে ক্ষমা করতে পারেন নি। কৌশলে তিনি পশুপতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাসূত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। মালা পরাইতে মালা খুলিয়া গেল।

পশুপতির সঙ্গে কৃষ্ণমার্জারের তুলনা টানা হয়েছে। এ বিদ্রূপ স্বতঃস্ফূর্ত। বঙ্কিম বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত দণ্ড দিয়েছেন। যুদ্ধ জয়ের পর বখ্‌তিয়ার পশুপতির প্রতি যে আচরণ করেছিলেন তাতেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখান হয়েছে। মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্রের ভূমিকা কতকটা অবাস্তব কতকটা রোমান্স লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র আদর্শ বীর। মাধবাচার্যের যোগ্য শিষ্য সে। কিন্তু এগুলি তাঁর আচরণে চকিতচমক দৃষ্টিতে দেখতে পাই। তার শৌর্যবীর্যের এই চকিতচমক স্ফুরণ আমাদের অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। মাধবাচার্য মৃণালিনীর আকর্ষণ থেকে হেমচন্দ্রকে দূরে রাখাতেই ব্যস্ত। বখ্‌তিয়ার খিলিজীর আক্রমণের পূর্বেও হেমচন্দ্রের নিশ্চেষ্টতা আশ্চর্যজনক। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন মাধবাচার্যের গণনাকেই সার্থক করে তুলতে চান। পশ্চিমদেশীয় বণিক বলতে বঙ্কিমচন্দ্র যে ইংরেজদেরই বুঝিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। অথচ মাধবাচার্য

১ মৃণালিনী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হেমচন্দ্রকেই বুঝেছিল। সুতরাং এই ভ্রান্তির উদাহরণস্বরূপ হেমচন্দ্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। সেজন্যে হেমচন্দ্রের ভূমিকায় পৌরুষ, একনিষ্ঠা, আন্তরিকতা সব থাকা সত্ত্বেও তার সব উদ্যোগ এবং চেষ্টা ফিকে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার উপরে যে গুরুভার ন্যস্ত করেছেন সেই ভার বহনে সে অক্ষম। গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র মনোরমা। মনোরমার চরিত্রে দ্বৈধতা আশ্চর্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। অদৃষ্টের চক্রে সে বিবাহিত হয়েও স্বামীসহবাসে বঞ্চিত। তার জন্যে তার একটা মর্মপীড়া ছিল। নারীর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিকে সে নিরুদ্ধ করতে পারে নি। অথচ পশুপতির মতবাদের সঙ্গে তার মিলও হয় না। পশুপতিকে সে ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ করে কাশীতে বাস করবার পরামর্শ দিয়েছিল। বার বারই মনে হয় মনোরমার জীবনে যে অভাববোধ তাকে পূর্ণতা দিতে পশুপতি অক্ষম। মনোরমা সেজন্যে হেমচন্দ্রের কাছে ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্কের জন্যে লালায়িত। কিন্তু পশুপতির আকর্ষণও সে ত্যাগ করতে পারে না মনোরমার ভূমিকায় বালিকা ও প্রৌঢ় মনোভাবের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের বিশ্লেষণ আশা করা যায় না বলে বঙ্কিম মনোরমার দ্বৈতবৃত্তির উৎসসন্ধান করেন নি।

গিরিজায়ার চরিত্রে বিমলার ছায়া আছে। আবার দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তার ব্যবহার আশমানী ও গজপতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মৃণালিনী উপন্যাসটির আকর্ষণ পশুপতির মাতৃমূর্তির কাছে প্রার্থনা করার দৃশ্যে, ধাতুমূর্তির বিসর্জন পরিচ্ছেদে। মাতৃকামূর্তিকে আশ্রয় করে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করা বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য। পশুপতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছিল। ফলে মাতার আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল। দেশের রাজলক্ষ্মী যখন বিদায় হন তখন মূর্তিও বিসর্জিত হয়। ধাতুর মূর্তি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তাতে বঙ্কিমের শিল্পকুশলতা জয়ী হয়েছে।[১] মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার বীজটি বপন করেন। লক্ষ্মণসেনকে তিনি বলেছেন রাজকুলকলঙ্ক

> সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন।

বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর বঙ্কিমচন্দ্রের খেদোক্তি লক্ষণীয়।

১ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা.

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহস্র যবন আসিয়া নবদ্বীপ প্লাবিত করিল। নবদ্বীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেই দিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত এই উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!

বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষা এবং শুভবুদ্ধিই মৃণালিনীকে জনপ্রিয় করেছিল।

তৃতীয়ত মৃণালিনী রচনা করার কিছুকাল আগে থেকে দেশে স্বাজাত্যবোধ দেখা দিচ্ছিল। জাতীয় ঐক্য, এবং স্বদেশচর্চার বীজটি অঙ্কুরিত করেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে চৈত্র-সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিবেশন হয়। ১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ায় সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই মেলাতেই 'গাও ভারতের জয়' গানটি গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এসবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও মনে হয় এই জোয়ারে তিনি অনুকূল্য করেছিলেন। তা না হলে শিবনাথ শাস্ত্রী এমন কথা লিখবেন কেন

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্রনাথ সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের (১৮৬০-১৮৭০) মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা "ন্যাসনাল পেপার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত, 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহাব সহিত যোগ। বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই।[১]

অনুমান করি বঙ্কিমেব মৃণালিনী জাতীয় তৃষ্ণায় কথঞ্চিৎ বারিসিঞ্চন করেছিল।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক এমন কতগুলি ঘটনা নির্বাচন করেন যেগুলি জাতির চিত্ত সহজেই জয় করে নিতে পারে। রচনার দোষত্রুটি বিষয়ের গুরুত্বে পাঠকের কাছে আর ধরা পড়ে না। MaCculum শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ঘটনানির্বাচনের এই কুশলতার দিকটি উল্লেখ করেছেন। মৃণালিনী উপন্যাস হিসেবে দোষত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিজয় ঘটনা নির্বাচন করে বাঙালির হৃদয়মন জয় করে নিয়েছিলেন। পরাধীনতার গ্লানি জাতিকে পীড়িত করেছিল। বাঙালির সে কলঙ্ক অপনোদন করার জন্য একটা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র তুলে দিয়েছেন। উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট না হয়েও বাজারমূল্যে মৃণালিনী বঙ্কিমের অন্য কোনো

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ

উপন্যাসের চাইতে খাটো ছিল না। মাধবাচার্যের নানাস্থানে ভ্রমণ এবং সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থার কথা বঙ্কিম বিস্তৃত করেন নি। এই পরিকল্পনাটিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর বেণের মেয়ে উপন্যাসে কল্পনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

চন্দ্রশেখর

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে বার হয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে উপন্যাসটি ছাপা হয়। অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিকেও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র নানা পরিবর্তন সাধন করেন। প্রতি সংস্করণে পরিবর্ধন ও পরিবর্জন তো ছিলই।

চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

> চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে, অনেকাংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে।
>
> ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'উল সয়ের' মতাক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ আছে, ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে এই গ্রন্থ খুঁটিয়ে পড়েছিলেন তা রামদাস সেনের গ্রন্থাগারের সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থ দেখলেই বোঝা যায়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের রহস্য-ঘনিমাকেই উন্মোচিত করেছেন। প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-লীলা এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর চমৎকারিত্ব আনার জন্যে তিনি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। চন্দ্রশেখরের ঘটনার কাল মীরকাশিমের সময়। মীরজাফরের পর মীরকাশিম নবাব হলে বাংলা দেশের বিশাল রঙ্গমঞ্চের যে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনীকে তারই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। মীরকাশিম সিরাজদ্দৌলা কিংবা মীরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজের সৈন্যসজ্জা ইংরেজের অনুকরণে করেছিলেন। গোলাম হোসেনের বিবরণ থেকে জানতে পারি মীরকাশিমও নানা বিশ্বাসঘাতক দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণতা অনেক

সময়েই বিশ্বাসঘাতকদের সাফল্য এনে দেয় নি। দেশে তখন সুশাসকের অভাব দেখা দিয়েছে। মীরকাশিম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন সুশাসন ফিরিয়ে আনবার।

(তিনি ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাইতেন না। উপন্যাসে মীরকাশিমের চরিত্রের অপরাপর দিকগুলি বিশেষ পরিস্ফুট নয়। দলনী-বেগমের সঙ্গে তার প্রেমের স্বরূপটিই বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত করেছেন। মীরকাশিমের সঙ্গে কাটোয়ার যুদ্ধ, উধুয়ানালার যুদ্ধ, ইংরেজের নৌকা আটক, আমিয়েটের দৌত্য সবই সয়ের মতাক্ষরীণে পাওয়া যায়) প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিবৃত্তের কাছাকাছি ছিলেন। কাশিম আলি খাঁর শেষ পরিণতি যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন তা মর্মস্পর্শী।

> নবাব কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎশেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরার হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুষ্কার্য করিয়া মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।
>
> গুরগণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উদয়নালা পর্যন্ত যান নাই— নবাবের অগ্রে ফিরিয়াছিলেন। ভাব গতিক বুঝিয়া নবাবের সঙ্গে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ কৌশল করিতেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।
>
> তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইযা পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন বাঙ্গলার শেষ যবন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।[১]

গোলাম হোসেন মীরকাশিমের এই ফকিরি গ্রহণের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মীরকাশিম নবাবী নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাস্রোতের বিপুল আবর্তে তার সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যে মীরকাশিম বার বার বলেছিল 'আমি সিরাজদ্দৌলা নহি' সেই মীরকাশিমের এইরকম শোচনীয় পরিণতি ইতিহাসের অমোঘ নিয়তির ইঙ্গিত দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের কূটনৈতিক বিচক্ষণতার কথাও গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গুরগণ খাঁর সহায়তায় তিনি নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী

১ চন্দ্রশেখর (প্রথম সংস্করণ), পরিশিষ্ট

করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই দুরভিসন্ধি বঙ্কিমচন্দ্র গোপন রাখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণ খাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তা সয়ের মতাক্ষরীণের অনুযায়ী। মীরকাশিমের এই আর্মাণীয় সেনাপতির প্রতিটি কার্যকে গোলাম হোসেন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যান্বেষণে নানা বিদেশী বণিক এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল। এরা রাজানুগ্রহও লাভ করত। গুরগণ খাঁ এইরকম একজন স্বার্থান্বেষী বণিক। সে ছিল বস্ত্রবিক্রেতা। গজে মেপে কাপড় বিক্রি করত। গোলাম হোসেনের সঙ্গে গুরগণ খাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল বলেই তিনি গুরগণকে কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত করেছেন। এ কথাও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর মীরকাশিম বইতে বলেছেন। গুরগণ খাঁ উচ্চাভিলাষী ছিল। সে মীরকাশিমকে প্ররোচিত করেছিল নেপাল আক্রমণের জন্যে। শোনা গিয়েছিল নেপালে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং স্বর্ণপ্রীতিই গুরগণকে আকর্ষণ করেছিল নেপালের দিকে। গুরগণ নিজের কার্যাবলীর দ্বারা এতই ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে মীরকাশিম গুরগণের দাস হয়ে পড়েছিলেন। তাই বলা চলে, বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের চরিত্রে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসসম্মত। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে গুরগণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের রাজনীতির একটি সজীব চিত্রের অবতারণা করেছেন। জগৎশেঠদের সঙ্গে তার গুপ্ত মন্ত্রণা সে যুগের ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। জগৎশেঠদের হাতে রাখতে না পারলে সেকালে কোনো নবাবই সিংহাসনকে সুরক্ষিত মনে করতেন না। গুরগণ মীরকাশিমের সঙ্গে জগৎশেঠদের মনোমালিন্যের সুযোগে নিজের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছিল। পলাশী যুদ্ধের পরে নবাব এবং নবাব অনুচরবৃন্দ সকলেই দেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপন আপন স্বার্থ বেশি দেখেছিল। দেশীয় এবং বিদেশীয় সকলের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের জগৎশেঠের সঙ্গে মন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেই অবস্থাকেই পরিস্ফুট করেছেন। মীরকাশিম-দলনীবেগম আখ্যায়িকায় গুরগণের প্রয়োজন খুব বেশি নয়। সে কেবলমাত্র দলনীর ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রথম গ্রন্থিটি রচনা করেছে। ভ্রাতা এবং ভগ্নীর মধ্যে যে স্নেহের সম্পর্ক থাকে বঙ্কিমচন্দ্র গুরগণের চরিত্রে তা দেখান নি। বস্তুত সয়ের মতাক্ষরীণ গ্রন্থে গুরগণকে অনেকটা এইরকমই দেখানো হয়েছে। কিন্তু নিশীথে ভগ্নীকে এইভাবে বিপদে ফেলে গুরগণের স্বার্থপরতা অঙ্কিত করে বঙ্কিমচন্দ্র

তাকে প্রায় ভিলেন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। এই ঘটনাটি ইতিহাস-সম্মত নয়।

মহম্মদ তকি খাঁর ভূমিকা নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট তকি খাঁ ইতিহাসসম্মত নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে যেমন নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট সিরাজকে সমর্থন করেন নি তেমনি তকির চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। তাঁর ভাষা কিঞ্চিৎ তীব্র। দলনীর প্রতি তার আসক্তি, সৈনিকোচিত কাজে অবহেলা ইতিহাস অনুযায়ী নয়। অথচ সয়ের মতাক্ষরীণে মহম্মদ তকির চরিত্রের এক উজ্জ্বল বর্ণ আলিম্পন ঘটেছে। তকির সাহস, তার বীর্য সে যুগে বিরলদৃষ্ট ঘটনা। সয়ের মতাক্ষরীণে প্রাপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ উদ্ধার করা এখানে সম্ভব নয়।[১] অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট তকি খাঁর সঙ্গে ঐতিহাসিক তকি খাঁর নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এ কথা মানতে ইচ্ছা হয় না। যদি তাই হবে তবে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা স্বচ্ছন্দে উল্লেখ করতে পারতেন। তিনি যখন ঐতিহাসিক চরিত্র গ্রন্থে স্থান দিচ্ছেন তখন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত হতে হবেই। বিশেষত তকি খাঁ নামে যখন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ বর্তমান ছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র তকির নামের আশ্রয় না নিলেও পারতেন। আসলে গল্প-কাহিনীকে সরস করবার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। গ্রন্থে আলি ইব্রাহিম খাঁ কিংবা মীরকাশিমের অন্যান্য অনুচরের তথ্য অবিকৃত রেখেও তকির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কেন এই দুরপনেয় কলঙ্ক লিপ্ত করলেন তার কারণ বোধ করি এইখানে।

দলনীবেগম বঙ্কিমচন্দ্রের অপরূপ সৃষ্টি। চরিত্রটির পরিচয় ইতিহাসে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কল্পনা আয়েষা সৃষ্টি করেছিল তাই আর একপদ অগ্রসর হয়ে দলনীর ভূমিকা চিত্রিত করলে। কুলসমের জবানিতে জানতে পারি দলনীর পূর্ব নাম দৌলতউন্নেসা এবং গুরগণের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে সে বাংলা দেশে এসে পৌঁছেছিল। ভ্রাতা এবং ভগ্নীতে পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল ভ্রাতার কাজে ভগ্নী সহায়তা করবে। প্রথম দাসীরূপে নবাবের অন্দরমহলে প্রবেশ করে সে মীরকাশিমের প্রিয়তমারূপে পরিণত হল। সয়ের মতাক্ষরীণে মীরকাশিমের ভার্যা রূপে মীরজাফরের কন্যার কথাই উল্লেখ আছে। অন্যান্য

[১] বিস্তৃত বিবরণের জন্য *Sier-ul-Muteqherin*এর ৫৭-৫৯, ৩৮৯, ৪০১, ৪২১-৪২২, ৪৩২, ৪৮৪-৪৮৫ পৃ. দ্রষ্টব্য

বেগমের কথাও সেখানে পাই। কিন্তু দলনীর উল্লেখ নেই। কি ভাবে কি উপায়ে দলনী মীরকাশিমের প্রিয়তমারূপে চিত্তজয় করেছিল তার কোনো বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। দলনী নবাবের বেগম হলেও কোমলতাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রথম দৃশ্যে দলনীর চিন্তার মধ্যে দেখতে পাই তার আন্তরিকতা এবং প্রেমের গভীরতা, মীরকাশিমের নারীর স্বভাবসিদ্ধ উদ্‌বেগ। নারীর স্বভাবসিদ্ধ উদ্বেগ নিয়ে সে মীরকাশিমকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। রাজনীতির কুটিলনীতিতে দলনীর প্রবেশের সূচনা হল মীরকাশিমের বাধায়। তার পর দলনীর অধৈর্য এমনই একটা আকার লাভ করল যা তাকে বিপুল ঘটনাস্রোতে বার বার ফেলে দিতে লাগল। অসহায় দলনী যতবারই চেষ্টা করেছে ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে ততই গ্রন্থি দৃঢ় হয়েছে, নূতন গ্রন্থি রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রগুলি নিজেদের বশে থাকে না। ঘটনার অভিঘাতে এপার থেকে ওপারে আন্দোলিত হতে হতে চরিত্রগুলির পরিণতি ঘনিয়ে আসে। ঘটনার গতি যে কত দুর্বার এবং তা যে কত বিচিত্রপথে উৎসারিত হয় দলনীর পরিণতি তার সাক্ষ্য দেয়। দলনীব ভূমিকা ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্রে পিষ্ট মানবাত্মার ক্রন্দন দলনীর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের মনে হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলির উপর ইতিবৃত্তের ঘটনারাজির প্রভাব যদি প্রাণবন্ত করে দেখানো যায় তবে তা ঐতিহাসিক রস পরিস্ফুটনে সাহায্য করে। কেবল কতগুলি তথ্য নয়, ইতিহাস যে মানবজীবনের নিয়ন্তা তাও দেখানো প্রয়োজন। দলনীচিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিল্পসার্থকতা লক্ষণীয়।

প্রতাপ ঐতিহাসিক পুরুষ নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ছায়ায় কল্পিত। প্রতাপের অসমসাহসিকতা, ডাকাতিবিদ্যায় চাতুর্য প্রদর্শন গ্রন্থে দেখতে পাই।[১] তার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র কৈফিয়ত দিয়েছেন। সে যুগে বহু জমিদার ডাকাতিবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল, অনেক জমিদার ডাকাতদের আশ্রয় দিত। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রতাপের ভূমিকায় যুগবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে ইংরেজ প্রতিনিধি কয়েকজন আছেন। এরা হল লরেন্স ফস্টর, আমিয়েট গলস্টন, এনিস ইত্যাদি। তার

১ চন্দ্রশেখর, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যে ফস্টরের বিবরণ কিঞ্চিৎ অধিক। রেশমকুঠির ও কুঠিয়াল দলের দৌরাত্ম্য ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী। যে কজন ইংরেজ সেযুগে ভাগ্যান্বেষণে বাংলা-দেশে এসেছিল তাদের বাঙালির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। সে-কারণে শৈবলিনীকে অপহরণ করবার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলে ফস্টরের চিন্তার মধ্য দিয়ে সে সকল কথা বলেছেন। স্বদেশের মায়া কাটিয়ে যারা এ দেশে এসেছিল তারা বিদেশে নিঃসঙ্গ জীবন পূর্ণ করতে গিয়ে নানা ক্ষুদ্রতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে নি। ফস্টরের লালসার লোলতার যে পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন তাতে অতিরঞ্জন নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটি মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র লালসার পঙ্কে নিমজ্জিত হয় নি। রাজনীতিক পটভূমিব দ্রুত পরিবর্তনেব যুগে আমিয়েটেব প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, অপূর্ব সৎসাহস, গলস্টনেব নির্ভীক মনোভাব যদি না থাকত তবে বাংলা তথা ভারতেব রাজ্য তাদের অধিকাবে আসত না। জাতির সম্মান রক্ষার জন্যে তারা যে-কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে দ্বিধা করত না। বঙ্কিমচন্দ্র সে পরিচয়ও উপন্যাসে রেখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ঘটনার সমাবেশ করেছেন অত্যন্ত বেশি। কাহিনীকে এগিযে নিয়ে যাবার জন্যে এবকম সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। এই-সকল ঘটনাসমাবেশেন মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি স্মরণীয় মুহূর্ত উপন্যাসে প্রকাশ কবেছেন যা ইতিহাসের দিগন্তকে এক মুহূর্তে উদ্‌ভাসিত করে দেয়। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন

> 'চন্দ্রশেখরে' জনসন্‌ ও গলস্টন প্রতাপেব গৃহদ্বাবেব রুদ্ধ কপাটে যে পদাঘাত কবিযাছিল, সেই পদাঘাতই ভাবতে প্রথম যুগেব ইংরেজদের বলদৃপ্ত, মদগর্বিত আত্মাভিমানেব যেন মূর্ত বিকাশ— এই এক পদাঘাতই শত শত লিখিত প্রমাণ অপেক্ষা সুস্পষ্টতরভাবে তাহাদের প্রকৃতির আসল রহস্যটি আমাদেব নিকট প্রকাশ করে।[১]

এইরকম আর একটি চকিত-চমক দীপ্তি চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লক্ষ করি। ফস্টরের প্ররোচনায় শৈবলিনী যখন অপহৃত হল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের অপরিসীম শূন্যতার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

> (চন্দ্রশেখর) সায়াহ্নকালে আপনাব অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত কবিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন— সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন— আবার না পড়িয়াই তাহা

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

বাঁধিলেন— সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নি-প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক উপনিষদ, একে একে সকলেই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। ১

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিজত্ব যে তখন বিপদগ্রস্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন। এক দিকে 'গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশানের ঔদ্ধত্য অন্য দিকে দেশবাসীর বহুযুগসঞ্চিত বিশ্বাসের অবক্রমণ এই দুইটি বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে এই বর্ণনায়। (চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীর-কাশিম-দলনী আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রতাপ-চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী কাহিনী শিথিলবিন্যস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যেন পাশাপাশি দুটি কাহিনীকে সমান বেগে চালিয়েছেন। উভয় কাহিনীর সাধারণ প্রেক্ষাপটটি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়। এ ছাড়া কাহিনীদুটির মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কাহিনীদুটির একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন) সেইটি উল্লেখ করি। কুলসমের সঙ্গে পরামর্শ করে দলনী গুরগণের কাছে পত্র দিয়েছিল। এই পত্রই দলনীকে রাজাবরোধ থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন

এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।২

দুজনের অদৃষ্টকে একসূত্রে গাঁথবার সবচাইতে বড়ো ঘটনা ঘটেছিল যখন ইংরেজরা শৈবলিনী ভ্রমে কুলসম এবং দলনীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। এই ভুলটি না ঘটলে দলনীর অদৃষ্ট হয়তো অন্যরূপ হত। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় থেকে বুঝতে পারি একটি মাত্র ঐতিহাসিক পরিবেশে দুটি নারীর জীবনে যে ভাগ্যবিপর্যয় হয়েছিল তাকেই তিনি স্পষ্ট করেছেন উপন্যাসে। কিন্তু দলনীর কাহিনীর সঙ্গে শৈবলিনী কাহিনীর সাদৃশ্য অথবা বৈপরীত্য কিছু নেই। আবার দলনী কাহিনী উপন্যাসে জায়গাও নিয়েছে বেশি। তবে একটি প্রশ্ন মনে আসে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কাহিনীকে

১ চন্দ্রশেখর, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড

চন্দ্রশেখর, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রধান করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনী না অনৈতিহাসিক কাহিনীটি। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কাহিনীটিই যে প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চন্দ্রশেখর উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে বার হবার সময়ে খণ্ডবিভাগ ছিল না। গ্রন্থাকারে বার হবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থটির খণ্ডবিধান করেন। প্রত্যেক খণ্ডের শিরোনামও তিনি দেন। এই শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারি শৈবলিনী ভূমিকার আদ্যন্ত বিকাশ দেখানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল। পাপীয়সী (প্রথম খণ্ড), পাপ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুণ্যের স্পর্শ (তৃতীয় খণ্ড) এগুলি সবই শৈবলিনী চরিত্র কিংবা শৈবলিনী কাহিনীকে উদ্দেশ্য করে কথিত। এই-সব খণ্ড দলনী-বর্জিত। সুতরাং কাহিনীর সূত্র শৈবলিনীকে অবলম্বন করেই বয়ন করা হয়েছে। নচেৎ পুণ্যের স্পর্শ দলনীও পেত। দলনীর সঙ্গে শৈবলিনীর অপর তফাৎ হচ্ছে এই যে দলনীর মতো শৈবলিনী ঘটনার স্রোতে ভেসে যায় নি। তার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল তা অনুকূল বায়ুপ্রবাহে বৃহদাকার ধারণ করলে। শৈবলিনী ইতিহাসের ঘটনায় নিজ রুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। যদি অনুকূল ঘটনাস্রোত না থাকত তবে শৈবলিনীর পরিণতি কি হত তা বলা যায় না। ইতিহাসের সার্থকতা বোধ করি এইখানে। এইখানে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে শৈবলিনীর প্রেমের তুলনা করা যেতে পারে। কুন্দনন্দিনীর ভীরুপ্রেমের ক্রমবিকাশ বঙ্কিমচন্দ্র ধীরে ধীরে দেখিয়েছেন। কিন্তু শৈবলিনীর প্রেমের বিকাশ (আট বছরের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি) প্রথম খণ্ডেই এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে একটা অসাধারণত্বের ছাপ আছে। রাজনৈতিক ঘটনার উত্থানপতনের মধ্যে শৈবলিনী স্বচ্ছন্দ বোধ করেছে। লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে পলায়ন, সুন্দরীর চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা সত্ত্বেও শৈবলিনীর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। রূপসীর ছদ্মাবরণ, মীরকাশিমের কাছে আত্মপরিচয়, গলস্টন-জনসনকে ফাঁকি দেওয়ার মধ্যে শৈবলিনী ভূমিকার দৃঢ়তা দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর প্রেমকে এক অসামান্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নায়িকাই এতটা তেজোদীপ্ত নয়। এই উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রণয়ের দ্বন্দ্ব ইতিহাসের আকাশে বাতাসে অপরূপ বর্ণসমারোহ সৃষ্টি করেছে। পাপীয়সীর প্রেমের উদ্ভবে ইতিবৃত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে এইভাবে সাহায্য করেছে।

সুতরাং প্রধান কাহিনীর সূত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে আপন

উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন। আমরা দেখছি (দ্রষ্টব্য, উপক্রম) ইতিহাস অনেক সময় কাহিনীর গ্রন্থিবন্ধনে এবং গ্রন্থিমোচনে সহায়তা করে। লেখকের কাছে ঐতিহাসিক তথ্য বাধা না হয়ে বরং অনুকূল উপায়রূপে দেখা দেয়। চন্দ্রশেখর উপন্যাস তার প্রমাণ।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল রোমান্সপ্রবণ। ঐতিহাসিক রোমান্স-রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। ইতিপূর্বে বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিরা উপন্যাস রচনা করে তিনি ইতিহাসের জগৎ থেকে দূরে ছিলেন।

> বিষবৃক্ষ এবং ইন্দিরা লিখিয়া তাঁহার রোমান্স প্রবণ মন যেন একটু হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের কামনা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। ১

চন্দ্রশেখর উপন্যাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য সর্বৈব সত্য। প্রতাপের মধ্যে বীরত্বের যে অগ্নি প্রজ্বলন বঙ্কিমচন্দ্র করলেন, তাই প্রথমে মহেন্দ্র এবং পরিশেষে সীতারামে পূর্ণ পরিণতি পেলে।

আনন্দমঠ

আনন্দমঠ ১২৮৭ সালের চৈত্রমাস থেকে বঙ্গদর্শনে বার হতে থাকে। ১২৮৯ সালে চৈত্র মাসে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হল। প্রথম চারটি সংস্করণে আনন্দমঠের ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম। পরে ঐতিহাসিক বিবরণ যথাযথ রাখবার জন্য উত্তরবঙ্গ নির্বাচন করা হয়। আরও একটি পরিবর্তন লক্ষণীয়। বঙ্গদর্শনে উপক্রমণিকায় ছিল

> প্রতিশব্দ হইল, "এ পণে হইবে না।"
> "আর কি আছে? আর কি দিব।"
> তখন উত্তর হইল, "তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব।"

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবর্তন করলেন তা এই,

> প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"
> প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"
> "আর কি আছে? আর কি দিব?"
> তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

১ [illegible] সংস্করণ, সম্পাদকের ভূমিকা

ভক্তি কথাটি স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরিবর্তন গভীর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। আনন্দমঠের প্রতিপাদ্য এই ভক্তিমহিমা-খ্যাপন। প্রথমে যা ছিল তাতে স্বদেশচর্চার মূল মন্ত্রটি উদ্গীত। কিন্তু স্বদেশচর্চা যদি উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয় কিংবা স্বার্থপ্রণোদিত হয় তবে তা বিপথগামী হতে বাধ্য। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদে স্বাধীন চেতনার বিকাশে প্রথমোক্ত রূপের বিস্তার। অনেক সময়েই স্বদেশচর্চা পরপীড়নের নামান্তর। অবশ্য এ কথা বলি না যে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ সর্বদাই পরপীড়ন কিংবা উচ্ছৃঙ্খল ছিল। বড়ো বড়ো দেশপ্রেমিকের কথা স্মরণ করলে তা কখনোই বলা যায় না। সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বদা বিপথ-গামী হয়েছে তাও ঠিক নয়। কিন্তু ভারতীয় চেতনায় সর্বকার্যের মূলে ঐশীমহিমার শুভ অস্তিত্ব স্মরণ করা হয়। চিত্তশুদ্ধি এর মূল কথা। সুতরাং আত্মবিসর্জন গৌরব বটে যদি সে বিসর্জন ভক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়। আনন্দমঠের মূল বক্তব্যটি বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই দিয়েছেন, গীতা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধার করে।[১]

সুতরাং যে প্রবল প্রেরণার বশে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল স্বদেশপ্রেম এবং গীতোক্ত উপদেশ। ইতিপূর্বে মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে বলেছিলেন, 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে'। সে কাব্যের গৌরব তাতেই বেড়েছে। সেখানে নীতির প্রশ্ন আসে নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জাতির চিত্তকে পরানুকরণস্পৃহা থেকে স্বদেশমুখী করেছিলেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশগীতি রচনা করলেন, কিন্তু তাঁর নায়ক তেমন কিছু শক্তিশালী ছিল না। মধুসূদন যথার্থ বীরের গলায় মালা পরিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বীরত্বের সঙ্গে নীতিবোধ জুড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানদৃষ্টিতে স্বদেশচর্চার যে আদর্শটি পাই তা আনন্দমঠেই পরিস্ফুট। মৃণালিনী উপন্যাসে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির বাহুবলের অভাবের জন্যে খেদ প্রকাশ করেছেন। পরে 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে ভারতবাসীর বাহুবলের অভাব

১ কিন্তু হে পার্থ! যাঁহারা আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া আত্মযোগে আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাদৃশ সাধক সকলকে আমিই অচিরে মৃত্যুপূর্ণ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতে সকল্প বিষয়াত্মক মনস্থির কর যদিও আমাতেই নিবেশিত কর দেহান্তে আমাতে বাস করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। হে ধনঞ্জয়। যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ হও তবে অভ্যাস যোগে আমাকে পাইতে প্রযত্ন কর।

আছে— এ কলঙ্ক অপনোদন করেছেন। আনন্দমঠে এই বাহুবলেরই প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন। তবে সে বাহুবল যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, ভক্তি উৎসারিত না হয় তবে তার দ্বারা সংগঠনমূলক কোনো কার্য সম্ভব নয়। এইটিও আনন্দমঠের অন্যতম ফলশ্রুতি।

আনন্দমঠের রচনার উৎস পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নির্ণয় করেছেন।

> বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। কি প্রকারে তিল তিল করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন।১

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র পিতামহের কাছে শোনা গল্পটি বলেছিলেন। সম্ভবত কৈশোরের স্মৃতি আনন্দমঠ রচনা করতে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাক্ষ্যে জানতে পারি আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্র হুগলিতে অবস্থানকালে[১] রচনা করেছিলেন। জয়দেবের একটি গান 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিল। আনন্দমঠে তার প্রভাব আছে। 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গানটি সম্বন্ধেও পূর্ণচন্দ্র একই কথা বলেছেন। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র থেকে উদ্‌ধৃতি দেওয়াতে বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র সেই স্তোত্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার যে-বীজ বপন করেছিলেন তা অঙ্কুরিত হলেও ফুলে ফলে শোভিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক কালের ইতিহাসের শিক্ষাকে এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজরাই যে যুদ্ধে জিতবে, ইংরেজি শিক্ষাই যে বাংলাদেশে স্থাপিত হবে সে কথা বলেছেন। মৃণালিনীতে পশ্চিমদেশীয় বণিক কর্তৃক ভারতবর্ষের 'কলঙ্কমোচন হবে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আনন্দমঠেই এই সিদ্ধান্তকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিস্ফুট করলেন সম্পূর্ণরূপে।

> ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউক, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।২

আনন্দমঠের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র দেশের অরাজকতার চিত্র দিয়েছেন।

১ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

২ আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ

এর জন্যে দায়ী ইংরেজের বণিকবৃত্তি। সুতরাং বণিকবৃত্তি ত্যাগ করে দেশে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারলে ভারতবর্ষের মঙ্গল।

> ইংরেজ এক্ষণে বণিক্— অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

পরে বলেছেন,

> শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা।[১]

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজ শাসনকে নানাদিক থেকে কল্যাণমূলক বলে মনে করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজচেতনার এই spiritকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন।

> ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম — স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আনন্দমঠে উপন্যাসের প্রয়োজনেই কেবল নয় লেখকের গভীর বিশ্বাস হতেই ইংরেজ প্রশস্তি উদ্রিক্ত হয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আনন্দমঠের সন্তান সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব। কিন্তু বৈষ্ণব বলতে সচরাচর যা বোঝা যায় সেই অর্থে এরা বৈষ্ণব নন। মাতৃকাপূজা এদের মধ্যে ছিল কিনা বলা শক্ত। কেননা দেবী যা ছিলেন দেবী যা হয়েছেন এবং দেবী যা হবেন এগুলি সবই দেশের কথা। সন্তানরা বিষ্ণুভক্ত। তাঁদের যুদ্ধোন্মাদনায় 'হরে মুরারে' গীতের প্রেরণা, দেশমাতৃকার স্তব তাদের সাহস বাড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের জবানিতে বলেছেন, 'সন্তানেরা বৈষ্ণব'। মহেন্দ্র এ শুনে প্রশ্ন করল

> ইহ বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।

সত্যানন্দ বলেন

> সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন

১ ভারতবর্ষ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে— উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়— কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন— তিনি অনন্তশক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়— সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।[১]

সত্যানন্দ যখন কারাগারে তখন সন্তানগণ যে উৎসাহে শত্রুর বিনাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন সেখানেও একই ভাবের প্রকাশ দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এই যে ব্যাখ্যা দিলেন তা ভেবে দেখবার যোগ্য। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। চৈতন্যদেব যে 'মর্কট বৈরাগ্য'কে ঘৃণা করতেন তাই নানাভাবে সমাজের ছিদ্রপথে প্রবেশ করছিল। শক্তি অপেক্ষা রসের সাধনায় জাতি যে মুক্তিকামনা করেছিল তাতে সমাজ লাভবান হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। সে কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক জীবনে বৈষ্ণবতার যে-স্রোত লক্ষ করেছিলেন তারই সমালোচনা করেছেন। লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবতত্ত্বকে অবজ্ঞা করেন নি, কিন্তু শক্তিময় বিষ্ণুর উপাসনার মধ্য দিয়ে জাতি তার অন্য অংশকেও দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করুক বঙ্কিমচন্দ্র এই চেয়েছিলেন। আনন্দমঠের এইটিও অন্যতম ফলশ্রুতি।

আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত রচনা করার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলেছেন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[২] 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের পূর্বাভাস পাই কমলাকান্তের দপ্তরের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে। নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার মূর্তি রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ সংগীতের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চন্দ্রশেখর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান রাজত্বের অবসানকালের ঘটনার

১ আনন্দমঠ, বঙ্কিমশতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা, নারায়ণ (বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা),

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথা ঐতিহাসিক, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাও তাই। ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাকালে বলেছি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ইত্যাদি দেশের বুকে যে ক্ষতচিহ্ন রেখে যেত কবিবৃন্দ তাকে বার বার স্মরণ করেছেন। জাতির দুর্ভাগ্য যে করুণস্বরে এই সময় কবিতায় উদ্গীত হত বা মর্মস্পর্শী। বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে তথ্যের জন্যে হান্টারের *Annals of Rural Bengal Vol I* -এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। তার কথাও বঙ্কিমের স্মৃতিতে ছিল। পূর্ববর্তী কবিরা দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে বর্ণনার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম ঐতিহাসিক তথ্যকে অতিক্রম করে কল্পনাবলে দুর্ভিক্ষের নগ্ন বীভৎসকে ফুটিয়েছেন। ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম না ঘটিয়েও বঙ্কিম যে নিখুঁত বাস্তবচিত্র দিয়েছেন তা তাঁর প্রতিভার শক্তির পরিচয় দেয়। আবার এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে স্নেহ-মমতা-দয়া-প্রেমের যে উত্থান পতন লক্ষ করি তাও বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। দুর্ভিক্ষের মুখোমুখী হয়ে স্তম্ভিত মানবাত্মার বিস্ময় অনুভব করি এই দৃশ্যগুলিতে। হান্টার তার বইতে John Shore-এর যে কবিতাংশ তুলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করি—

> Still fresh in memory's eye the scene I view,
> The shrivelled limbs sunk eyes, and lifeless hue ;
> Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
> Cries of despair and agonizing moans.
> In wild confusion dead and dying lie :—
> Hark to the Jackal's yell and vulture's cry,
> The dog's fell howe, as midst the glare of day
> The riot unmolested on their prey,
> Dire scenes of horror, which no pen can trace
> Nor rolling years from memory's page efface [১]

একজন ইংরেজের চোখেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার যে স্বরূপ আমরা লক্ষ করি তাতেই এটা স্পষ্ট যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশবাসীর চিত্তে বহুদিন জাগরূক ছিল।

যে সময়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় তার কিছুকাল আগে থেকেই সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের কথা শোনা যেত। মোগল বাদশাহেরা এই সমস্ত সন্ন্যাসী ফকিরদের অবাধ বিচরণে বাধা দেন নি। বরং ঐতিহাসিক তথ্য

১ W. Hunter, *Annals of Rural Bengal, Vol-I*

থেকে বুঝতে পারি বাদশাহরা এদের কিঞ্চিৎ সমীহ করে চলতেন। এই সমস্ত ফকির এবং সন্ন্যাসীরা কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করতে পর্যন্ত এরা দ্বিধা করত না। পরিশেষে ইংরেজ এই সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের দমন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। বাংলাদেশে কুচবিহার, দিনাজপুব, রঙ্গপুব, বগুড়া, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলে এদের গতিবিধি ছিল অবাধ। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এরা যদিও ধর্মীয় আবরণে নিজেদের কার্যবিধি পরিচালিত করত তথাপি এদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এদের শক্তি ও সাহস এতই অপরিসীম যে গ্রামবাসীরা পর্যন্ত তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসে বিরোধী শক্তিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করত না। সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের গতিবিধি এত দ্রুত ছিল যে ইংবেজ সৈন্য এদের অনুসরণ করে ধরতে পারত না। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের দুর্দশার কাহিনী থেকে তা বুঝতে পারি। তিনি যখন সৈন্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে গেছেন তখন শত্রুর কোনো সন্ধান পান নি, পরে দেখা গেল তারা মযমনসিংহ অঞ্চলে। টমাস ডগলাস, এডওয়ার্ড এদের আক্রমণ কবে নিহত হযেছিলেন। গোড়ার দিকে এদের উৎপাত কম ছিল কিন্তু ১৭৭২-১৭৭৪ সালে আক্রমণ তীব্র হয।[১] সুতরাং আমরা বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক তথ্য থেকে উপন্যাসের যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার মধ্যে তিনি প্রচুর পরিবর্তন সাধন করেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের উচ্চ আদর্শ সন্ন্যাসী-সম্প্রদাযের মধ্যে ছিল না। দেশপ্রীতি কিংবা গীতোক্ত ধর্মের বিন্দুমাত্র স্পর্শ তাদের চরিত্রে দেখা যায় না। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নবাব এবং ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ছিল। যাঁরা মনে করেন বঙ্কিম ভ্রান্ত আদর্শ প্রণোদিত হযে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের শক্তি ও সাহসকে অযথা বড়ো করে দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। রায় সাহেব যামিনীমোহন সরকারী রিপোর্ট থেকে এই সন্ন্যাসী এবং ফকির-সম্প্রদায়ের যে ইতিবৃত্ত সংকলন করেছেন তাতেই প্রমাণিত হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অলীক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক যে ভাববস্তুটি এদের উপর আরোপ করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দীর পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

১ Rai Saheb Jamini Mohan Ghosh, *Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal*

আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনা কালে দেখেছি অনেক লেখকই সমসাময়িক চেতনা অতীতের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করে জাতির পিপাসা মেটাতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সেই রূপের সার্থক উদ্ভাবয়িতা। আনন্দমঠের পরিকল্পনাতে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রকে আর একদিক থেকে প্রভূত সাহায্য করেছে। অনেকেই বলেছেন আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও আনন্দমঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি। ঠিক কথা। কিন্তু ইতিহাসের অবতারণা হল কেন? প্রথমত বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক জীবনে তেমন কোনো মহাপুরুষ বা আদর্শ প্রেমিকের সাক্ষাৎ পান নি যার দ্বারা তাঁর ভাবপ্রকাশের সুযোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত তিনি যে অতীতের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শ স্থাপন করেছেন তার সঙ্গত কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই কাল ছিল অরাজকতার। এই অরাজকতাই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। সন্তান-সম্প্রদায়ের উদ্ভবের তাদের বীরত্বের ক্রমবিকাশটি বঙ্কিমচন্দ্র দেখান নি সত্য কথা। কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহের কারণটি নিরূপণ করার চেষ্টা করছেন। আনন্দমঠে সন্তান-সম্প্রদায়ের বাসস্থান যে জঙ্গল-পরিকীর্ণ জায়গায় নির্বাচন করা হয়েছে তাও অযথার্থ নয়। সত্যই সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে দেশে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তাই ধূমায়িত হয়ে বিদ্রোহে পরিণত হল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জ্বালা এবং দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির অসন্তোষকে একসূত্রে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেশপ্রেমের যে বীজ বপন করেছেন তা আধুনিক কালের ঐতিহাসিক অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মহারাণীর শাসন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে দ্বৈতশাসনের অবসান। এই অবসানের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান বিদ্রোহ কল্পনা করেছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন,

> ৮৮ বৎসর পরে সিপাহী ব দ্রোহের ফলে যেমন ব্রিটিশ কোম্পানীকে সরিয়ে সরাসরি ভারতশাসনভার গ্রহণ করেছিলেন সেরূপ ১৭৭২ সালে কোম্পানীর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা স্থলে নিজেই শাসন করিবেন স্থির করলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালেই এমন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।[১]

১ ইতিহাস, ১০ম খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এই নামে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ইতিহাস পত্রিকায় পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। কৌতূহলী পাঠককে প্রবন্ধ দুটি পড়তে অনুরোধ করি। The number of spinners was greatly reduced by the

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র সন্তান-সম্প্রদায়ের যে বিশেষত্ব আরোপ করেছেন তা কেবল সন্তানদের জন্যেই। সাধারণের মনোবৃত্তিকে দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। জনতার দৃশ্যগুলিতে লুটেরা সম্প্রদায়ের যে কোনো উচ্চাদর্শ ছিল না, তারা যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হত সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সুতরাং আনন্দমঠে ইতিহাস গৌণ বটে কিন্তু ইতিহাসই যে বঙ্কিমের পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ইতিহাসের কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠককে W. Hunterএর *Annals of Rural Bengal, Vol. I* এবং যামিনীমোহন ঘোষের *Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থদুটি থেকে সহজেই বোঝা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র কেন সন্তান-সম্প্রদায়কে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। বাঙালির বাহুবলের অভাব আছে এ তিনি বিশ্বাস করতেন না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে বহু বাঙালি জমিদার ডাকাতদের আশ্রয় দিত সে সংবাদ সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়। মহেন্দ্রের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ইতিহাসের নজিরেই পরিকল্পিত। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপের সমরস্পৃহার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রের চরিত্রে তাকেই পরিস্ফুট করেছেন। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন যুগপরিবেশটি অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথমে বীরভূমকে ঘটনাস্থল নির্বাচন করে এবং পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে ঘটনাসংস্থান পরিবর্তিত করাতে উপন্যাসের ভৌগোলিক বিবরণ কিছু পরিমাণে সংশয়িত। সেজন্যে আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে স্থানীয় বিবরণ কিঞ্চিৎ কম। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বর্ণনা, রেশম কুঠির বিবরণ এবং অরাজকতার সংবাদ ইত্যাদিতে কালগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ। বিশেষত গোরুর গাড়িতে টাকা পাঠানোর ঘটনাটিতে সেযুগের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

famine of 1770, with the result that the yarn was 25 p. c. dearer than formerly. * The famine of 1770 could not interrupt this moneymaking at the expense of the Company and the weaver. * The famine of 1770 gave a great blow to the cotton weaving industry of Bengal. The spinners the weavers and the cotton growers died in large number. The cultivation of mulberry suffered very much as a consequence of the famine of 1770.— N. K. Sinha : *Economic History of Bengal. Vol. I.*

সত্যানন্দ আদর্শমহিমার প্রতীক। শান্তি রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। কিন্তু সে পুঁথির জগতের লোক নয়। ধনুকে ছিলা পরানো, কিংবা ইংরেজ সৈন্যের কাছে তার অকুতোভয়তা চমকপ্রদ এবং রোমাঞ্চকর সন্দেহ নেই তথাপি জীবানন্দের প্রতি তার আসক্তি এবং জীবানন্দের আকর্ষণে আনন্দসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার মধ্যে শান্তির মানবিক গুণ রক্ষিত হয়েছে। ভবানন্দের পদস্খলন চিত্র যেমন স্বাভাবিক এবং অনুতাপ-জনিত আত্মবিসর্জন তেমনি মর্মস্পর্শী। চরিত্র-পরিকল্পনায় আনন্দমঠের বিশেষত্ব খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথ সে দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসু যে পত্র লেখেন বাংলার পাঠক আনন্দমঠকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছিল। চন্দ্রনাথ বসু বলেছেন

> আনন্দমঠের কার্য সচরাচর সংসারধর্মের কার্য নয়— আনন্দমঠের ছবি সংসারধর্মের ছবি নয়।' আনন্দমঠের কার্য একটি বিশেষ কার্য, সচরাচর বা every-day lifeএ মানুষ যে কার্য করে না সেই কার্য। অর্থাৎ প্রবল স্বদেশানুরাগে প্রধাবিত হইয়া স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা— এই কার্য। আনন্দমঠের পাত্রগণের আর কোন কার্য নাই— তাহারা যতক্ষণ আমাদের সামনে আছে ততক্ষণ তাহাদের সেই একমাত্র কার্য— সেই কার্যই তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, চেষ্টা, চরিত্র, চিন্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই একমাত্র কার্য তাহাদের সমস্ত জীবনের পরিধি পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে— সে কার্যও যা, তাহাদের জীবনও তাই। সেই একমাত্র কার্য তাহাদের একমাত্র জীবন, একমাত্র ব্রত। যদি অনেকগুলি ব্যক্তির এই রকম একমাত্র জীবন একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে সেই অনেকগুলি ব্যক্তি কি একটিমাত্র ব্যক্তিস্বরূপ হইয়া উঠে না? ইতিহাসে তো তাহাই দেখিতে পাই।[১]

চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমশিষ্য। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রেরও আনন্দমঠ সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা ছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অভিযোগকে অস্বীকার করতে পারা যায় না। আনন্দমঠ উপন্যাস নিশ্চয়ই। কিন্তু কাহিনী বা চরিত্র-পরিকল্পনায় আনন্দমঠ উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বঞ্চিত। একটা Idea-র বস্তুরূপ আনন্দমঠ উপন্যাস।

দেবী চৌধুরাণী

আনন্দমঠ রচনা শেষ করেই বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ আনন্দমঠের সমাপ্তি ছিল এইরকম—

১ ১২৯১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৯৪৪

বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সেকথা পরে বলিব।

সত্যানন্দকে চিকিৎসক বুঝিয়েছিলেন আর বিদ্রোহে কাজ নেই। ইংরেজ দ্বারা হিন্দুর জ্ঞানাত্মক ধর্মের বহির্বিষয়ক জ্ঞান ভারতে প্রচারিত হলে পুনরায় হিন্দুধর্ম স্থাপিত হবে। তবে সত্যানন্দ যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন তা সহজে নেবে নি। বঙ্কিমচন্দ্র তারই কথা দেবী চৌধুরানীতে প্রকাশ করলেন। ভবানী পাঠক, রঙ্গরাজ, নিশি এবং প্রফুল্ল বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ভাবনার প্রতীক।

কিন্তু আমাদের মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানীর ভূমিকা করেছিলেন 'ক্ষুদ্রকথা' রাজসিংহ বড়ো গল্পে। ডাকাত মানিকলালকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ১২৮৪-১২৮৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু জনমত কিছুটা বঙ্কিম-বিরোধী ছিল। তথাপি ডাকাত মানিকলাল তার লঘুচিত্ততা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসামান্য প্রভুভক্তি, দেশসেবার আদর্শ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১২৮৮ সালে। তার আগেই আনন্দমঠ বার হতে আরম্ভ হয়েছে বঙ্গদর্শন কাগজে। বীজটি উপ্ত হয়েছিল 'রাজসিংহে'। বস্তুত 'ক্ষুদ্র কথা' রাজসিংহের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানিকলাল। তারই চূড়ান্তরূপ রঙ্গরাজ এমন-কি ভবানী পাঠক। ডাকাতের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় ধারণা গড়ে উঠেছিল সম্ভবত বাহুবলের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে।

রায়সাহেব যামিনীমোহন ঘোষের *Sannyasi and Fakir Raiders of Bengal* গ্রন্থে সন্ন্যাসী ফকিরের উপদ্রবের কথা আছে। সে উপদ্রব সম্পূর্ণ মিটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। দেশে যখন শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল তখন ডাকাতির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনী আমরা চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাস আলোচনায় উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রও দেবীসিংহের কথা বলেছেন সবিস্তারে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সব ডাকাতদের কথা বলেছেন তারা দেবীসিংহের অত্যাচার নিবারণে কতটা সক্ষম হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকাতসম্প্রদায় ডাকাতিবিদ্যার নৃশংসতাটুকু বর্জন করেছে। ফলে অনেক সময়েই এদের ডাকাত বলে মানতে ইচ্ছে হয় না। দস্যু মানিকলালের যেমন রাজসিংহের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন হয়েছিল অথবা রবীন্দ্রনাথের

বাল্মীকিপ্রতিভার দস্যু রত্নাকরের যেমন শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকাতদেরও সেরকম মনোভাব লক্ষ করি। এদের আচার-আচরণে ডাকাতিশাস্ত্রের নিদর্শন নেই। কেবল রঙ্গরাজের আবির্ভাবে মাঝে মাঝে এদের স্বরূপটি চিনিয়ে দেয়। কিন্তু সেও ভবানী পাঠকের মন্ত্রে কিঞ্চিৎ নির্জীব। সেই তুলনায় মানিকলাল সজীব। দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকর্ম যে কিঞ্চিৎ ভাঁটার দিকে এ থেকেও তা বোঝা যায়।

সত্যানন্দ যে আগুন জ্বেলেছিলেন তা যে অনেকদিন পর্যন্ত নেবে নি তার কারণ কোম্পানিশাসন তখন পর্যন্ত দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। এক দিকে দিল্লীর রাজনৈতিক পটভূমিতে শূন্যতা অন্য দিকে নবাবী আমলের ভগ্নদশার একটি বাস্তব চিত্র দিয়েছেন আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয় দেবী চৌধুরানীর ঐতিহাসিক ভূমিকায়।

> মির কাসিমের বর্দ্ধিত হারের জমা আদায় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইল। তখন সরকারী তহসিলদারগণ প্রজাদের মারপিট এবং নিজেদের উদর পূরণের জন্য লুট আরম্ভ করিয়া দিল।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী কর্মচারী ছিলেন। মারপিটের কিছু কিছু সংবাদ তিনি জানতেন। সয়ের মতাক্ষরীণ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। বাঙালির এই দুর্ভাগ্যের বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেছিল নিশ্চয়ই। উপক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ব্যক্ত করেছি। এই কারণেই আনন্দমঠ লেখার পরেও দেশের অবর্ণনীয় দুঃখ বলবার আগ্রহ তিনি বোধ করেছিলেন। ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেন তিনি। W. Hunterএর *Statistical Account*-এ কিছু সংবাদও পেলেন। সামান্য তথ্য থেকে তিনি কাহিনী রচনা করলেন। সরকারী কাগজপত্র থেকে জানা যায় ভবানী পাঠক নামে একজন ডাকাত তার অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে ডাকাতি করত। লেফটেন্যান্ট ব্রেনান ভবানী পাঠককে নিহত করেন। একজন রানী ডাকাত ছিল দেবী চৌধুরানী। সে বজরায় বাস করত। তার অনেক বরকন্দাজ ছিল। সামান্য এই তথ্যকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করা যায় কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যায় না। আর ইতিহাসের প্রভাবও দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে চরিত্রগুলির উপর বিশেষ দেখা যায় না। স্থানকালপাত্র সেই যুগের। আধুনিককালের

১ দেবী চৌধুরানী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

সাহিত্যের পরিভাষায় এই কারণে অনেকে দেবী চৌধুরানীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী রচনার সময়ে ধর্মবিষয়ক চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। হেস্টিসাহেবের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে যে বাদানুবাদ হয় তারও কিছু প্রভাব এই উপন্যাসে থাকবার কথা। অনুশীলনতত্ত্বের ভাষ্য হিসেবেও ওই উপন্যাস-গুলি বিবেচ্য। এতে উপন্যাসটির সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় না। দেবী চৌধুরানীর মহৎ প্রেরণা অন্যত্র। দেবী চৌধুরানীতেও বঙ্কিমচন্দ্র গীতা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। উপন্যাসে প্রফুল্লের শিক্ষারম্ভ এবং শিক্ষাসমাপ্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শান্তি এই শিক্ষা পেয়েছিল পরোক্ষভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেবীর শিক্ষাকে সুস্পষ্ট আকার (systematic) দিলেন। ইংরেজের সৈন্য আক্রমণ করার পূর্বে দেবীর নিশির সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। প্রবন্ধগুলিতে তিনি যা বলেছেন তারই সারসংকলন করেছেন দেবীর উক্তিতে। প্রফুল্লের শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র জঙ্গলে সমাধা করেছেন। লোকালয়ে সে শিক্ষা যে সম্ভব নয় সীতারামে শ্রী তার প্রমাণ। ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল বোধ করি এইখানে। ব্রজেশ্বরের তিন স্ত্রীর মধ্যে প্রফুল্ল ছিল হতভাগ্য। ঘটনার টানাপোড়েনে সেই দেবীতে রূপান্তরিত হল। নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করলে। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে দেশচর্চার বীজ কেবলমাত্র দেশ উদ্ধারের ক্ষেত্রেই বপন করা হয় নি বরং প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত কবার প্রচেষ্টাতেও ব্যবহৃত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন নিষ্কাম ধর্মের গ্রহণের মধ্য দিয়ে যেমন বীরত্ব, শৌর্য একটা আদর্শভূমিতে স্থাপিত হয় সেরকম পারিবারিক বিশুদ্ধিও রক্ষিত হয়। শান্তি-জীবানন্দ আসক্তি ত্যাগ করতে পারে নি, ভবানন্দ কল্যাণীর মোহে মুগ্ধ। উচ্চাদর্শের মধ্যে এইগুলি ছিদ্রপথ। এই রন্ধ্রপথেই শনি প্রবেশ করে। আনন্দমঠে হয়েছিলও তাই। দেবী চৌধুরানীতে তার একটা সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রফুল্ল ফিরে এল বটে। কিন্তু তখন সে নিষ্কাম ধর্মের প্রতীক।

ধর্মতত্ত্বই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বস্তু। সে সম্বন্ধে দ্বিধার কারণ দেখি না। কিন্তু এই উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমের কোনো ভূমিকাই কি নেই? প্রফুল্লর সাংসারিক জীবনের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ, স্বামিগৃহে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে

একরাত্রি বাস তার নারীজীবনের ব্যাকুলতাকে স্পষ্ট করেছে। নিষ্কামধর্মের শিক্ষার মধ্যেও সে মাছ খেতে ভোলে নি। এ সংস্কার যে পুথিগত নয় বরং স্বতঃস্ফূর্ত সে কথা আমরা ভুলি নি। নিশির সঙ্গে সংলাপের মাঝে মাঝে অর যে চকিত মূর্তিটি দেখি তাতে অশ্রুসজল প্রফুল্লই ধর্মের তত্ত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ জীবনে এসে দাঁড়ায়। বঙ্কিম প্রফুল্লর নিষ্কামধর্মের আদর্শকে স্থাপিত করবার সময়েও বাস্তব পরিবেশটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন সে কথা বুঝতে পারি। ব্রজেশ্বরের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পিতৃধর্ম এবং স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণের দোলায় মথিত রূপ দেখাতে চেয়েছেন। হরবল্লভ সেকালের জমিদার। দেবীসিংহের পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হরবল্লভ। তার প্রফুল্লর প্রতি নির্দয় আচরণ, দেবীসিংহের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পুত্রকে সাগর-বৌয়ের বাড়ি অর্থ সংগ্রহের জন্যে পাঠানো, ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রফুল্লর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নিশির কাছে কাপুরুষোচিত আচরণ ইত্যাদি বঙ্কিম পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। প্রফুল্লর ধনলাভ ঘটনাটি পাশ্চাত্য উপন্যাসের আদর্শ অনুযায়ী। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তৎকালীন যে রূপটি বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়েছেন তাও লক্ষণীয়। বৈষ্ণব ধর্মের এই অবক্রমণের দিকটিকেই আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিম কিঞ্চিৎ সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভবানী পাঠকের আহ্বানে হঠাৎ দস্যুদের আবির্ভাব বঙ্কিম বর্ণনা করেছেন নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে। নিশীথে গুহার মধ্যে একলিঙ্গের মন্দিরে প্রফুল্লর প্রবেশ ঘটনাটি মাধবীকঙ্কণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবীর নৌযুদ্ধ যে একেবারে অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে সে কথা আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকায় উদাহরণ সহযোগে বলেছেন। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসেও যে বাঙালির বাহুবলের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ আছে সে কথা জানতে পারি বঙ্কিমের ঈষৎ ষষ্টি প্রশস্তিতে। কিন্তু লাঠির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শক্তিরও যে একটি কল্যাণের দিক আছে সে কথা বঙ্কিম দেবীর দরবার প্রসঙ্গে বলেছেন।

দেবী চৌধুরানী লেখবার সময়ে কিংবা তার আগে বঙ্কিমচন্দ্র রংপুর অঞ্চল ঘুরে এসেছিলেন এই সংবাদটি উপন্যাসে পাচ্ছি। কোনো জীবনীতে এ সংবাদ পাই নি। অংশটি উদ্ধার করি—

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল— বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি— কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি— ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনও অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল— কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের ত কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্‌কে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্বে আর কখন তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই "ভাল মানুষ" হইত। ডাকাইতিতে তখন কোন নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।[১]

এই দীর্ঘ উক্তি থেকে আমরা জানতে পারছি বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী লেখবার আগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ডাকাইত সম্বন্ধে বঙ্কিমের কোনো মোহ ছিল না। কেননা স্বয়ং বিচারকের আসনে বসে তিনি ডাকাইতদের শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু সেকালের ডাকাইতি সম্বন্ধে তাঁর ভিন্ন ধারণা ছিল। এ কালের পাঠকের জন্য তিনি তাই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে আর একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন।[২] প্রফুল্ল যে প্রচুর ধন পেয়েছিল তার কারণ নীলাম্বর নামে এক রাজা পাঠান অত্যাচার ভয়ে তাঁর ধনসম্পত্তি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই ধনই প্রফুল্ল লাভ করেছিল। কিংবদন্তীমূলক এই কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্র জেনেছিলেন এইটি ঐ কাহিনী উদ্ধার থেকে অনুমান করতে পারি।

দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-অতীতকে স্থান দিয়েছেন তা খুব দূরের নয়। তথাপি ত্রিস্রোতা নদীর বর্ণনায়, দেবীর দরবারের বিশাল জনতার দৃশ্যে, সেকালের বজরার নিখুঁত চিত্রে, দেবীর ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি অঙ্কনে, রোমান্টিক পরিবেশটি বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করেছেন। সেকালে দেবী চৌধুরানীর ভয়ে জনসাধারণ যে কিরূপ ভীত ছিল তার একটি উদাহরণ পাই সাগর-বৌয়ের পরিচারিকার আচরণে। দেবী চৌধুরানীর

১ দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ
২ দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ

কীর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পাতায় স্থান দিয়ে সে যুগের পাঠকদের কৌতূহল মিটিয়েছিলেন। পাঠকদের যে এ-সব ইতিহাস জানবার আগ্রহ ছিল সে কথা বুঝতে পারি এ সময়ের বিখ্যাত ডাকাত শাহ্ মজনু সম্বন্ধে রচিত একজন কবির রচনা থেকে। পঞ্চানন দাসের মজনুর কবিতাটি (১২২০) যামিনীমোহন ঘোষ তাঁর গ্রন্থে সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন।

সীতারাম

সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস।[১] উপন্যাসটি প্রচার পত্রিকায় ১২৯১ সালে ধারাবাহিক বার হতে থাকে। সীতারামও অনুশীলনতত্ত্বের অন্যতম ফল মাত্র। চন্দ্রশেখর থেকে দেবী চৌধুরানী পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যে অংশটির উপর আলোকপাত করেছেন তা হচ্ছে ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরবর্তী ঘটনা। সীতারামের ঘটনাস্থল বাংলাদেশেই বটে, কিন্তু কাল পরিবর্তিত। মুর্শিদ-কুলী খাঁর রাজত্বে সীতারামের আবির্ভাব। সে কালের বিশিষ্ট পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধ্যানাদর্শকে রূপ দিতে চাইলেন। চন্দ্রশেখরে তিনি বাঙালি বীরের ভূমিকা দেখিয়েছেন বটে কিন্তু সেখানে প্রণয়দ্বন্দ্বই মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল। আনন্দমঠেই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশচর্চার উদার আশ্বাস ধ্বনিত হল। বাঙালির বীরত্বের নিদর্শনও স্থাপিত হল। কিন্তু দেবী চৌধুরানীতে বঙ্কিম তত্ত্বচিন্তায় এত বেশি আবিষ্ট যে বাঙালির বীরত্বের ভূমিকা থাকলেও তা মনোযোগের অভাবে তেমন পরিস্ফুট হয় নি। আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের কর্তব্য ছিল রাজ্য স্থাপন নয় দেশের অনাচার অবিচার দূর করা। দেবী চৌধুরানীর মর্মবাণীও এক দিক থেকে তাই। কিন্তু তা অপরিস্ফুট সুতরাং বঙ্কিম তাঁর Ideaকে তখন পর্যন্ত রূপ দিতে পারেন নি। সেজন্য তিনি আরও একটু অতীতে দৃষ্টি স্থাপিত করলেন। পাঠান-আমল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সংশয় ছিল। তেমন কোনোও বাঙালি বীরের সন্ধানও তিনি পান নি। এ ক্ষেত্রেও প্রতাপাদিত্যকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা চলত কিন্তু তার প্রবল বাধা প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় গ্রন্থ। সুতরাং ইতিহাসে যে বীর নিজের রাজ্য সংরক্ষণে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন, যিনি কিছু পরিমাণে নবাবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন

১ 'পুনঃ প্রণীত' রাজসিংহকে বাদ দিলে

তাঁকেই বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সঙ্গে প্রবল ধর্মীয় চেতনা এবং দেশচর্চার বীজটি যুক্ত করে দিয়ে বঙ্কিম তাঁর অভীপ্সার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সন্ধান করলেন। কথঞ্চিৎ তৃপ্তি এজন্য বলছি যে সীতারাম উপন্যাসেও তিনি পরিকল্পনাটিকে সার্থক করতে পারেন নি। সে সার্থকতা এসেছিল রাজসিংহ উপন্যাসে। এ যেন অনেকটা মধুসূদনের মতো আক্ষেপ। মধুসূদন একটি রীতিমত মহাকাব্য রচনার জন্যে বিষয়বস্তু খুঁজেছিলেন কিন্তু পান নি। রামচন্দ্রকে গ্রন্থের নায়ক করতে পারলেন না কেননা রামচন্দ্রের অনুচরবৃন্দ বানর। মাইকেল যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও যেন এক-একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাইকেলের কাব্য ট্রাজেডির সুরে ধ্বনিত হয়েছে, বঙ্কিমের সীতারামও তাই।

সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব প্রচার করতে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। গীতার শ্লোক উদ্ধারই তার প্রমাণ। এমন-কি সীতারামের শেষ যুদ্ধে যোগদান গীতার বাণী স্মরণ করেই। শ্রী-জয়ন্তী গীতার তত্ত্বরূপের দ্বারা পরিকল্পিত। প্রফুল্লর সঙ্গে জয়ন্তীর সাধর্ম্য দাবিও করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে।

> এখন, যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুই জনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।[১]

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন যদি আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুরানীর অন্যতম ফলশ্রুতি হয় তবে সীতারামের ফলশ্রুতিও তাই।

দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিষ্কাম ধর্মের দীক্ষা দেবার পূর্বে একবার বলেছিলেন প্রফুল্ল পুরুষ হলেই ভালো হত। বঙ্কিমচন্দ্র এ উক্তির দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা বলা কঠিন। তবে একটি পুরুষের মধ্য দিয়ে নিষ্কামধর্মের অভাবে কি প্রলয় ঘটতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তার চিত্র এঁকেছেন সীতারাম উপন্যাসে। ধর্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো কর্মে সাফল্য লাভ করা যেমন ধর্মের মহিমাকে সূচিত করে তেমনি ধর্মবোধের অভাবে কোনো চরিত্রের পতন হলে ধর্মের অভ্রান্ততাই প্রমাণিত হয়। দেবী চৌধুরানী প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত, সীতারাম দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্তস্থল।

১ সীতারাম, প্রথম সংস্করণ

সীতারাম উপন্যাস রচনার পূর্বে হেস্টিসাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাদ-প্রতিবাদের কিছু কিছু বস্তু পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতিষে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অপরিসীম আস্থা ছিল তারও প্রমাণ পাই জয়ন্তী-শ্রী-চরিত্র জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ব্যাপারে। এমন-কি জয়ন্তী-শ্রীর মন্ত্রপূত ত্রিশূলও বঙ্কিমের হিন্দুধর্মের প্রতি অসীম বিশ্বাসের ফলেই পরিকল্পিত।

বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে সীতারামের রাজ্য জয় উপলক্ষে তৎকালীন দেশের যে পরিচয় দিয়েছেন তা প্রায় সত্য। এমন-কি মুসলমান ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করেছেন। স্টুয়ার্টের *History of Bengal*এ এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-কাল-পাত্র সৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন মুর্শিদ-কুলী খাঁ সিরাজদ্দৌল্লার চাইতেও নিষ্ঠুর ছিলেন। এ কথা অতিরঞ্জন নয়। মুর্শিদ-কুলী খাঁ যখন দিল্লীর বাদশার আদেশক্রমে কার্যত বাংলার সর্বময় কর্তা হয়ে উঠলেন তখন শোষণের নূতন নূতন কৌশল তিনি আবিষ্কার করতে লাগলেন। স্টুয়ার্ট যে বিবরণ দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য।[১]

নবাব হয়েই মুর্শিদ-কুলী হিন্দু জমিদারের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন। তিনি জমিদারদের কড়া নজরে রাখতেন এবং আমিনদের দ্বারা প্রত্যেক কৃষকের কাছ থেকে কর আদায় করতে লাগলেন জমিগুলিকে পুনরায় মাপার বন্দোবস্ত করলেন। জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের জমি দেবার বন্দোবস্ত করলেন। কেবলমাত্র বীরভূমের জমিদার আদম আল্লা মুর্শিদ-কুলী খাঁর অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিলেন। কানুনগো দর্পনারায়ণকে মুর্শিদ-কুলী কৌশলে নিজের অধীনে নিয়ে এলেন এবং পরিশেষে তাকে রাজকার্য থেকে পদচ্যুত করেছিলেন। কিঙ্কর সেন নামে এক কর্মচারীকে তিনি রাজকার্যে অবহেলার জন্যে মহিষের দুধে লবণ মিশ্রিত করে খেতে দেবার শাস্তি দিয়েছিলেন। কিঙ্কর সেন তাতেই মারা যান। হিন্দু জমিদারদের পাল্কীতে চড়া নিষিদ্ধ ছিল। ইচ্ছে করলে তারা ডুলি কিংবা চৌপাইতে আরোহণ করতে পারতেন। টাকা আদায়ের জন্য তিনি বাঙালি কর্মচারীদেরই নিযুক্ত করতেন। কেননা তিনি জানতেন যে বাঙালি কর্মচারীদের

১ দ্রষ্টব্য, Stewart, *History of Bengal*, pp 414-416

শাস্তি দেওয়া সহজ এবং ওরা পালাতেও পারত না। যদি কোনো কর্মচারী টাকা দিতে না পারত তবে নবাব তাকে এবং তার পরিবারকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করতেন। নবাব কাউকেই বিশ্বাস করতেন না। রাজস্বের তদারকি তিনি নিজেই রোজ করতেন। যদি তিনি দেখতেন যে কোনো জমিদার কর দিতে গাফিলতি করছে তবে নবাব তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীকে প্রেরণ করতেন। সেই কর্মচারী যাতে কাজ শেষ করার আগে খাওয়া দাওয়া না করে সেজন্যে দুজন কর্মচারী তার সঙ্গে যেত। আবার সে দুজন কর্মচারী ঘুষ খেয়ে সত্য কথা না বলতে পারে ভেবে নবাব তাদের পেছনে গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। নবাবের আদেশে জমিদারদের পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, সারাদিন রোদে জমিদারদের রেখে দেওয়া হত, নগ্ন করে মারার ব্যবস্থা ছিল, এবং শীতকালে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়া হত। নবাবের আত্মীয় এবং কর্মচারী রেজা খাঁ পুকুর কেটে তাতে দুর্গন্ধ জমা করে জমিদারদের সেখানে ডুবিয়ে রাখতেন। শোনা যায় যে নবাবের আদেশে জমিদারদের পায়জামা পরিয়ে দেওয়া হত। এবং তার মধ্যে বিড়াল ঢুকিয়ে দিয়ে যন্ত্রণা দিত। বাংলার জমিদারদের এই অত্যাচার নিপীড়ন করে বৈশাখ মাসের দিকে দিল্লীতে বাদশার কাছে নবাবের দেয় টাকা পাঠানো হত। রাজস্ব এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে তা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। একশোটির উপর গোরুর গাড়িতে দিল্লীর বাদশার কাছে বাংলার নবাবের কর যেত। সঙ্গে থাকত তিনশো অশ্বারোহী পাঁচশো পদাতিক সৈন্য। একজন ধনাধ্যক্ষও এই টাকার সঙ্গে যেত। টাকা ছাড়া দিল্লীর বাদশা এবং মন্ত্রীদের জন্যে নবাব হাতী, পাহাড়ী ঘোড়া, কাপড়চোপড় এবং বাংলার নানা মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী পাঠাতেন।

স্টুয়ার্ট যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে বিশেষ কিছু আতিশয্য নেই। সহজেই অনুমান করতে পারি মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে ভূম্যধিকারীদের কি কি দুরবস্থা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের ইতিহাসের যে তথ্য জানতেন পরবর্তীকালের গবেষণায়ও তা সমর্থিত হয়েছে। আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারাম উপন্যাসের ভূমিকায় সে যুগের বিস্তৃত ভূমিকা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাজী প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এই প্রসঙ্গটিও তাঁর ইতিহাস থেকেই পাওয়া। কাজীরা যে মধ্যযুগ থেকেই কিঞ্চিত স্বাধীন এবং

উগ্রপন্থী হয়ে উঠেছিলেন তা চৈতন্যদেবের কাজীদমন প্রসঙ্গ থেকেও অনুমান করতে পারি। যদুনাথ সরকার কাজীদের স্বেচ্ছাচারিতার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকায়।[১] আওরঙ্গজেব কেবলমাত্র হিন্দুদের উপরেই রাজশাসনের কঠোরতা নামিযে দিয়েছিলেন তাই নয়। সিয়া বোরা সম্প্রদায়ের উপরেও শেষ জীবনে নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ডকে লঘু পাপে গুরুদণ্ডরূপে অবিশ্বাস্য ঘটনা বলা যায় না। কেননা কাজীরা হামেশাই এমন দণ্ড দিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে সীতারামের বিষয়ে একটি প্রশ্ন আগেই সমাধান করে নিতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের গরমিল দেখতে পেযেছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন অবলম্বন করে স্টুয়ার্ট যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন তার প্রতিবাদ করে J. Westland সীতারাম সম্বন্ধে নূতন উপকরণের সাহায্যে ১৮৭৪ সালে তাঁর গ্রন্থে[২] সত্য ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন। J. Westland সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। কিছু কিছু অঞ্চল তিনি প্রত্যক্ষ করে সীতারামের ইতিহাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও খুলনা থাকার সময়ে সীতারামের রাজ্য দেখে এসেছিলেন। সীতারাম সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতে পেযেছিলেন।

> রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাঁহার নিকট হইতে অনেক গল্প গুজব শুনিযা লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২।৩ মাস বঙ্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্ত হইয়া মাগুরায় থাকেন। তাঁহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।[৩]

এই গল্পগুলির মধ্যে কোনো কোনো গল্প যে বঙ্কিমচন্দ্র শুনেছিলেন সে কথা আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু Westland সীতারাম সম্বন্ধে যে বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন সেখানেও দেখতে পাই তিনি নানা গালগল্পকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিকের জিজ্ঞাসা এবং যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থরচনায় স্টুয়ার্টের বিবরণ অপেক্ষা Westlandএর গ্রন্থকেই প্রামাণ্য করেছেন। বস্তুত Westlandএর বিবরণী জানাবার আগে সীতারামকে কেবল একজন সাধারণ

১ বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ, সীতারাম
২ *Report on the District of Jessore etc. 1874. pp 25-38*
৩ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র, ২য় খণ্ড

জমিদার রূপেই আমরা দেখতে পাই। যাঁর পেশা ছিল ডাকাতি। স্টুয়ার্ট বলেছেন, সীতারাম ছিলেন একজন উচ্ছৃঙ্খল জমিদার। তিনি কয়েকটি ডাকাত পুষতেন, তাদের কাজ ছিল রাস্তায় নদীতে ডাকাতি করা। ফৌজদারের ক্ষমতাকে না মেনে তারা লোকের গোরু পর্যন্ত চুরি করত। আবু তোরাব সীতারাম-দমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নবাবের কাছ থেকে কোনোও সাহায্য পান নি। পরে নিজের চেষ্টায় পীর খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে দুশো সৈন্য দিয়ে সীতারাম-দমনে পাঠান। পীর খাঁ বিফল হন। আবু তোরাব অতর্কিতে সীতারামের হস্তে নিহত হন। পরে নবাব বক্স আলি খাঁ নামে একজনকে পাঠিয়ে সীতারাম-দমন করেন। বলা বাহুল্য, স্টুয়ার্টের বিবরণে সীতারাম সম্বন্ধে উল্লসিত হবার কিছু নেই। কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতিনের (যার উপর স্টুয়ার্ট নির্ভর করেছিলেন) বিবরণ বঙ্কিমের কাছে গ্রাহ্য হয় নি। না হবারই কথা। বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ইতিহাস চেয়েছিলেন। পরবর্তী গবেষণা তাঁকে সাহায্য করলে প্রচুর। Westland সে জন্যে বঙ্কিমের কাছে গ্রাহ্য। তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র Westlandকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। সে বিচারের আগে Westlandএর বিবরণ কিছু কিছু উদ্ধার করি। Westland সীতারাম সম্বন্ধে দুটি বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম বিবরণে দেখি সীতারামের হরিহরনগরে ছোটো একটু তালুক ছিল। একদিন তিনি তাঁর তালুক দেখতে বার হলে ঘোড়ার পা আটকে যায়। অনুচরদের তিনি সে জায়গা খুঁড়তে বলেন। একটু খোঁড়ার পর একটি ত্রিশূল দেখতে পেলেন, পরে আরও খুঁড়ে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আবিষ্কার করলেন। সেই থেকে সীতারামের ভাগ্য ফিরে গেল। তিনি প্রচুর লোকজন ডাকিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। মহম্মদ খাঁর নামে রাজধানীর নাম রাখলেন মহম্মদপুর। সেনাপতি মেনাহাতীর সাহায্যে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠলেন। পরে দুর্গনির্মাণ করে তিনি তাঁর শক্তি সামর্থ্য পেলেন।

দ্বিতীয় বিবরণে জানা যায় যে এই অঞ্চলে বারোটি প্রদেশ ছিল। বারোটি প্রদেশের বারোজন জমিদার ছিল। সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে সীতারাম এই সমস্ত জমিদাররা কর ইত্যাদি ঠিকমত দিচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। এই ব্যাপারে সীতারাম এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যে তিনি অতি শীঘ্রই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এবং দ্বাদশ জমিদারকে

নিজের দলে আনতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। এখন নবাব সীতারামের কাছে রাজস্বের দাবি জানালেন। সীতারাম প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের প্রতিনিধি। সুতরাং নবাবকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলেন। সম্রাটকে তিনি রাজস্ব দেবেন জানালেন। কার্যত তিনি কাউকে রাজস্ব দেন নি। নবাব সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সীতারাম মহম্মদপুরে দুর্গের ভিতরে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছেন। তাঁর সৈন্যদলে আছে মেনাহাতী, বখ্‌তিয়ার খাঁ, মূচড়া সিং এবং গাভুর ডলন। এরা নবাবের সৈন্যকে রুখল। তখন নবাব আবু তোরাবকে পাঠান। এবারেও মেনাহাতি আবু তোরাবকে হত্যা করে নবাবসৈন্য বিতাড়ন করলে। নবাব এবারে সিংহরাম সাকে পাঠালেন। সিংহরাম মেনাহাতীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দী করল। কিন্তু মেনাহাতীকে মারতে পারল না। মেনাহাতীর শরীর মন্ত্রপূত। মেনাহাতী তাকে মারবার কৌশল বলে দিল। নবাবসৈন্য মেনাহাতীকে মেরে ফেলল। সীতারাম এই সংবাদে বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যুও আসন্ন। তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। পরে বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

Westland অতঃপর সীতারামের নানা কীর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। সীতারামের দুর্গ ছিল চতুষ্কোণ। রামসাগর, সুখসাগর নামে দুটি দীঘি তিনি খনন করেন। রাজার কাচারী, দোলমন্দির, কোষাগার, সিংহদরজা, শিবমন্দির, তোশাখানা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির ইত্যাদি সীতারামের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রথযাত্রা এবং নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদির বর্ণনায় বুঝতে পারি লোকে তখন মোটামুটি সীতারামের রাজত্বে ভালোই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র Westlandএর ইতিহাস পড়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। সীতারামের কীর্তিগাথা এতই জনপ্রিয় ছিল যে কেবলমাত্র এই বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয় হলেন। স্বদেশের ঠাকুরের পুজা যে জনচিত্তে আত্মমর্যাদাবোধ এনে দিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। Westlandএর ইতিহাসে আছে ঢাকার নবাবের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র নবাবের কথা না বললেও বুঝতে পারি তিনি মুর্শিদ-কুলী খাঁর কথাই বলতে চেয়েছেন। মেনাহাতীকে ধরা সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই মেনাহাতী ধরা পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন শ্রেষ্ঠ

গল্পকার ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ঘটনায়। সামান্য এই প্রবাদকে অবলম্বন করে তিনি গঙ্গারাম-রমা কাহিনী রচনা করেছেন। রমা-গঙ্গারাম কাহিনীটি সীতারামের রাজ্যপতনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। মেনাহাতীর পতনও তাই মৃন্ময়ের কার্যে যে সাহস শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে তা মেনাহাতীর দ্বারা পরিকল্পিত বলে এমন হতে পেরেছে। ইতিহাসের ইঙ্গিতকে বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন সীতারাম দিল্লী গিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন

উপন্যাসের দিক থেকে এইটি অসামান্যতা এনে দিয়েছে। সীতারামের অনুপস্থিতিতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলার যে সুযোগ ঘটল সীতারাম থাকলে হয়তো তা নিবারিত হতে পারত। দ্বিতীয়ত প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরের ফর্মান আনবার জন্য দিল্লী গিয়েছিলেন এ সংবাদ আমরা জানি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সাদৃশ্যেই এই কল্পনা করেছেন। তৃতীয়ত Westlandএর ইতিহাসে আমরা জানি যে সীতারাম দিল্লীশ্বরের প্রিয়জন ছিলেন। সুতরাং এই ইঙ্গিত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যা কল্পনা করেছেন তাতে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বিশেষ কিছু হয়েছে বলে মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রচুড়ের যে কল্পনা করেছেন তা যদুনাথ গাঙ্গুলীর সাদৃশ্যে।

প্রথম সংস্করণে চাঁদ শাহ ফকিরের কাহিনী কিছু বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী সংস্করণে কাহিনীর মূল বক্তব্যটিকে অবিকৃত রেখে বঙ্কিম চাঁদ শাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছেন। প্রথম সংস্করণে চাঁদ শাহ ফকিরের ভূমিকা উদার। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সুরও সুস্পষ্ট আকারে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে।

> বাবা! শুনতে পাই, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্ট করিয়াছেন; যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।১

১ সীতারাম, প্রথম সংস্করণ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারামের রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তখন ফকির মক্কা প্রস্থান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের কথা বললেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাই করতে চেয়েছিলেন।

রিয়াজ-উস্-সালাতিন, স্টুয়ার্ট এবং Westland সকলের তথ্য থেকেই দেখতে পাই সীতারামের সঙ্গে নবাবসৈন্যের দুবার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমবার সীতারাম জয়ী হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবারের যুদ্ধ মহান গৌরবে স্থাপন করেছেন। সীতারামের প্রতিষ্ঠাও ঘটে এই যুদ্ধের দ্বারা। সীতারাম যে ভাবে রাজ্য স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসসম্মত ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যকে এমন কৌশলে বর্ণনা করেছেন যে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে নি, তা একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের মহিমা পেয়েছে। এ কথা অস্বীকার করি না যে গঙ্গারাম-উদ্ধার ব্যাপারে সীতারামের ব্যক্তিগত প্রযোজন ছিল বড়ো। তথাপি এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন এবং সমষ্টিগত প্রয়োজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সামঞ্জস্যবিধান করতে পেরেছেন। মুর্শিদ-কুলী খাঁর রাজস্বের সামান্য বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেশে অসন্তোষের যে বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল তাই গঙ্গারামবধ দৃশ্যে প্রজ্বলিত হল। কার্যকারণ শৃঙ্খলাসূত্রে বিধৃত হয়ে দৃশ্যটি বাস্তবতা এবং রোমান্সের অপরূপ সম্মিলনে মনোহর দীপ্তি লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি যে উচ্চাদর্শের দ্বারা চালিত হচ্ছিল সীতারামের উক্ত দৃশ্যটির মধ্যে তারই আংশিক রূপ দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিল। সামান্য একজন ভূস্বামীর এইরকম অভ্যুত্থানের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলের সাহায্যে চিত্রিত করেছেন। আনন্দমঠ এবং দেবী চৌধুরানীতে গল্পরসের জোগান কিঞ্চিৎ কম। ঐ দুটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশচর্চার মহান্ দিকটি নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, প্রফুল্লর মধ্যে নিষ্কাম ধর্মের মহত্ত্ব আরোপ করতেই বঙ্কিমচন্দ্র উল্লাস বোধ করেছেন বেশি। কিন্তু সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আবার স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেলে। 'পুনঃ প্রণীত' রাজসিংহ এবং ইন্দিরা পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের প্রতিভা অম্লান ছিল। সীতারামের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক জাগ্রত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। যে একটি উপকাহিনী এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তারও সার্থকতা বুঝতে কষ্ট হয় না। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গারাম-রমা কাহিনী সীতারামে

উপন্যাসে স্থান পেতে পারে না বলে অভিমত দিয়েছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'ত্রয়ী'কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এবং এই তিনটি উপন্যাসের যে তত্ত্ব তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তা অপরূপ। কিন্তু সীতারামের তত্ত্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিম-প্রতিভার অপর দিক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন বলে মনে করি। তিনি বলেছেন স্ত্রীর প্রতি মোহ যেন allegory হিসাবেও খাপ খায় না।[১] কিন্তু সীতারাম উপন্যাসের সঙ্গে দেবী চৌধুরানীর তুলনা করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। সীতারামের তিন স্ত্রী। শ্রী, নন্দা, রমা। ব্রজেশ্বরেরও তিন স্ত্রী। প্রফুল্ল, নয়ান বৌ, সাগর বৌ। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে নির্বাসন দিয়েছে, সীতারামও তাই। পিতৃবাক্য রক্ষার জন্যই শ্রী সীতারাম-সহবাস বঞ্চিতা। কিন্তু এই দুটি উপন্যাসের মিলটুকু যেমন বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন তেমনি গরমিলও প্রচুর। ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ উপন্যাসে আদ্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তৃত করেছেন। ব্রজেশ্বর এজন্য অনেক সময়েই উচিত অনুচিত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে কার্যকালে কিছুই করতে পারে নি।[২] সীতারাম শ্রীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পূর্বকৃত কার্যের সমালোচনা করেছেন। শ্রীকে তিনি গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়েছেন। শ্রী যতই অপ্রাপণীয় হয়েছে সীতারাম ততই পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই কারণে সীতারাম উপন্যাসের গতি অসামান্য। দেবী চৌধুরানীতে এই গতি নেই। সীতারামের শ্রীর প্রতি মোহ সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে পুরাতন ও নূতনের আকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা, দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর

১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী, নারায়ণ, বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যা

২ সীতারামের পিতা নেই। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার সম্বন্ধে তিনি আপনার অভিমত দ্বারাই চালিত হন। প্রফুল্লর প্রতি ব্রজেশ্বরের সমবেদনা ছিল কিন্তু প্রফুল্লকে সে গৃহে স্থান দিতে পারে নি। কারণ পিতা হরবল্লভ।

প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।১

সীতারাম উপন্যাসে তত্ত্বচিন্তা আছে সত্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোপরি ঔপন্যাসিক। সীতারামের দোলাচলচিত্ততা, তাঁর মহৎ পিপাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক নিপুণভাবে এঁকেছেন। ইতিহাসে সীতারামের পতনের যে কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কারও ঐকমত্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে সীতারামের পতনের যে কারণ আবিষ্কার করেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য এবং কার্যকারণ শৃঙ্খলা-সূত্রে বিধৃত। গঙ্গারাম-রমা উপাখ্যানও সীতারামের পতনের পথটিকে প্রশস্ত করে।

রমার চরিত্রে দলনীবেগমের ছায়াপাত ঘটেছে। স্বামীর মঙ্গলের জন্য, প্রেমের তীব্র আকর্ষণের জন্য দলনী রাজনীতির জটিল আবর্তে আপনার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছিল। রমাও সীতারামের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করাবার চেষ্টা করেছিল। তার সংসার ছোটো এবং তার কল্পনায় সমুদ্রের অসীমতা বা গভীরতা নেই। সীতারামের মঙ্গলের জন্য সে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র রমার চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদে। শেষ পর্যন্ত রমা যে দুঃসাহসিক কাজ করেছে তা উপন্যাসটির গতিকে বন্ধুর করে তুলে মানবরহস্যের সরুমোটা চিহ্নগুলি চিনিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। গঙ্গারামের মধ্যে যে পাপবোধ ছিল তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের দৃশ্যেই বুঝতে পারি। সুতরাং গঙ্গারামের চরিত্রও যেমন স্বাভাবিক তেমনি রমার অতর্কিত ভ্রান্তপথে পা বাড়ানো ঘটনাটিও বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে যুঁই ফুলের মতো ক্ষুদ্র রমার ভূমিকায়ও বঙ্কিমচন্দ্র পলাশ ফুলের অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত করেছেন বিচারের দৃশ্যে। রমার প্রেমের আতিশয্যই সীতারামকে তার পরিণতির দিকে আর এক পদ অগ্রসর করে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনোও নায়িকারই সন্তান-প্রীতি তেমন নেই। বিষবৃক্ষে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য রস আছে। তা লঘু, স্নিগ্ধ, মনোরম। কিন্তু বাৎসল্য প্রীতি যে মাতাকে কতখানি গৌরব প্রদান করতে পারে রমার ভূমিকা তার প্রমাণ। সন্তানকে কেন্দ্র করে রমার মাতৃহৃদয়ের যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ লক্ষ করা যায় তাতে চরিত্রটির অপরূপ মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে।

১ সীতারাম, প্রথম খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম, রাজসিংহে অত্যাচারের পটভূমিকায় নূতন শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী। সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যাচারের পটভূমিকাটি কয়েকটি ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ঐ পটভূমিকাটুকু না থাকলে সীতারামের অভ্যুত্থান অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হত। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজ্যগঠন তথা রাজ্যবিধির কতগুলি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ-সব বর্ণনার মধ্যে বাস্তবতার পরিবেশন লক্ষণীয। অবশ্য স্কটের মতো এই বর্ণনা বিস্তৃত নয়। তথাপি সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এ-ব্যাপারে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আবু তোরাব সীতারামের রাজ্যে কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী প্রজা আত্মগোপন করে আছে লিখে পাঠালেন। আবু তোরাব যা লিখেছিলেন তা সত্যি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা কৌতূহলোদ্দীপক। সীতারামের বাজ্যে পলাতক প্রজারা সকলেই সাজ বদলে ফেলল। সুতরাং সীতারাম আবু তোরাবের নামের তালিকায় যে-সব ব্যক্তির নাম আছে তাদেব খুঁজে পেলেন না। প্রজাদের এই চাতুরী বাস্তববোধেব দ্বারা অঙ্কিত। ইচ্ছে করলে আবু তোরাবের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সীতারাম আবু তোরাবেব নির্দেশকে মিথ্যা বলে চালাতে পারতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম কলাজ্ঞানের পরিচয় দিযেছেন। জনতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিমেব শিল্পকর্মের প্রশংসা অবশ্যই করতে হয। উড়িষ্যার পথে জয়ন্তী ও শ্রী'র গমনকালে সেখানকার জনবাসীর মন্তব্য কৌতুকজনক। সরল জনবাসীর অলৌকিকতায় বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক। তোরাব খাঁ যখন সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করবে ঠিক করলে তখন প্রজাদের আচরণ একান্ত বাস্তব। রামচাঁদ শ্যামচাঁদ যথার্থ জনতার প্রতিনিধি। জনতার আরও কতকগুলি দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। প্রথম গঙ্গারামের বধ্যভূমির দৃশ্য বর্ণনায়। দ্বিতীয় রমার বিচারের দৃশ্যে, তৃতীয় জযন্তীর বেত্রাঘাতেব দিনটিতে। বিশাল জনসমুদ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র আপনার কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন অথচ সমুদ্রের গর্জন পাঠককে শুনিয়েছেন। রমার পীড়িত থাকা কালে কবিরাজগোষ্ঠীর আচরণকে পর্যন্ত বঙ্কিম স্নিগ্ধ কৌতুকরসের সাহায্যে অঙ্কন করতে ভোলেন নি। সীতারামের রাজ্যের পতন যখন আসন্ন তখন বঙ্কিম রাজ্যবিধি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা ঐতিহাসিক বাস্তবতা এনে দিতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম সংস্করণ সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুগৌরব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে উড়িষ্যার ভাস্কর্যশিল্পের নৈপুণ্য বর্ণনায়। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর খেদও প্রকাশ করেছেন। 'কাল বিগুণ হইলে সকলই লোপ পায়।' দেশচর্চার এই ইঙ্গিতটি লক্ষণীয়।

শ্রী-চরিত্র নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আনন্দমঠের শান্তি, দেবী চৌধুরানীর প্রফুল্ল এবং সীতারামের শ্রী রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। বাস্তব সংসারে এদের সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ। এমন-কি এই জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে পাঠকের বিশ্বাসবোধও পীড়িত হয় কিঞ্চিৎ। শ্রীর চরিত্রে অবাস্তবতা আছে সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবসর নেই। শ্রী সীতারামের চরিত্রে অনেকটা নিয়তির রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সীতারাম উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ড তিনটির নাম যথাক্রমে দিবা-গৃহিণী, সন্ধ্যা-জয়ন্তী, রাত্রি-ডাকিনী। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সীতারামের উপযুক্ত গৃহিণী ছিল না। নন্দা, রমা ব্যক্তিত্বে হেয় নয়, তাদের ত্রুটিও বিশেষ কিছু নেই। কেবলমাত্র সীতারামের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অংশীদার হবার মতো চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাদের ছিল না। উপযুক্ত গৃহিণীর আবির্ভাবে সমস্ত অন্ধকার কেটে যায়, দিবালোকের দীপ্তির প্রকাশ দেখা দেয়। প্রথম খণ্ডে শ্রী-ই সীতারামের উত্থানের কারণ। সুতরাং শ্রী-ই সীতারামের উপযুক্ত গৃহিণী। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রী এবং জয়ন্তীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। তথাপি শ্রী জয়ন্তীর ছায়া মাত্র। শ্রী এবং জয়ন্তীর সহায়তায় সীতারামের রাজ্যজয় হল। কিন্তু কাহিনী তখন সূচ্যগ্রভাগে স্থাপিত। সীতারামের এত বড়ো জয়েও শান্তি নেই কেননা এত বড়ো রাজ্যের ভোগের জন্য শ্রী-র প্রয়োজন। কিন্তু শ্রী নেই। তাই এক দিক থেকে সীতারামের রাজ্যে সন্ধ্যার আলো এবং আঁধার ঘনিয়ে এলো। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ডের ঐ নাম। তৃতীয় খণ্ডে সীতারাম অধঃপতনের মুখে। শ্রী সন্ন্যাসিনী হলেও সীতারামের জীবনে তখন তার প্রভাব অনিষ্টকর। শ্রীকে যখন সীতারাম পেল তখন তাঁর মনে হয়

> বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থিরমূর্তি, অবিচলিতধৈর্যসম্পন্না, অশ্রু বিন্দুমাত্রশূন্যা, উদ্ভাসিতরূপরশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্তিনী, মহামহিমাময়ী, এ যে দেবীপ্রতিমা! বুঝি এ শ্রী নহে! হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে।[1]

[1] সীতারাম, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রমেশচন্দ্র দত্ত

রামবাগান দত্ত-পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম। এই দত্ত-পরিবারে বহু কৃতবিদ্য লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পিতৃব্য শশিচন্দ্রের কথা আগেই বলেছি। শশিচন্দ্র দত্তের প্রেরণা রমেশচন্দ্রের রচনায় কার্যকরী হয়েছিল। প্রধানত শশিচন্দ্রের শিক্ষাতেই রমেশচন্দ্রের বিদ্যাচর্চা অগ্রসর হয়েছিল। এই পরিবারেই তরু দত্ত ও অরু দত্তের জন্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার এই পরিবারে উন্মুক্ত ছিল। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব দত্ত-পরিবারের অনেক লেখকের লেখাতেই পাওয়া যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই রমেশচন্দ্রের বিদ্যাচর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। বিলেতে গিয়ে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় বাঙালিদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। রমেশচন্দ্রের এই বিদ্যাচর্চার আগ্রহ স্কটের সঙ্গে তুলনীয়। সমালোচকেরা বলেছেন স্কট ছিলেন 'Glutton of Books'. বোধ করি রমেশচন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। বিলাতে কেবল যে তিনি নিজের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তা নয় বরং দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিযে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ইতিহাসচর্চার কথা বিদেশীদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই বিষয়গুলি ছিল— *Study of Indian History*; *History, Civilisation and Religion of the Ancient Hindus*; *History, Civilisation, Religion and Literature of the Ancient Hindus (2nd)*; *the Epic and Poetry in Ancient India*, *The Epic and the Epic age of India.* বিষয়বস্তুগুলি দেখলে বোঝা যাবে রমেশচন্দ্র প্রধানত ইতিহাসচর্চাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। বলা বাহুল্য এই ইতিহাসপ্রীতি রমেশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল।[১]

১ বর্ধমানে সরকারি কাজের সময়ে রমেশচন্দ্রকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন সরকারি কাজ অপেক্ষা গ্রন্থপাঠেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল।

যাঁদের লেখা পড়তে রমেশচন্দ্র ভালোবাসতেন তাঁদের কথা তিনি একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

১৯০৫ সালে *Wednesday Review*তে রমেশচন্দ্র লিখেছেন—

Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. I spent days and nights over his novels ; I almost lived in those historic scenes and in those mediæval times which the great enchanter had conjured up. Scott, has thus, in fact created a world of his own— a somewhat idealised, but a vivid and on the whole picture of the mediæval world in Europe.

একটু পরে বলেছেন—

Byron and Sir Walter Scott were my favourite poets forty years ago. ১

এই থেকে বোঝা যায় স্কটের উপন্যাসে যে আদর্শলোক রচিত হয়েছিল রমেশচন্দ্রের কাছে তা গ্রহণীয় বস্তু বলে মনে হয়েছিল। ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততাকেও তিনি স্কটের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। আবার বায়রনের কবিতার দেশপ্রেরণাও রমেশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে স্বদেশপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল তাতে বায়রন গৃহীত হবারই কথা। নবীনচন্দ্র সেন এক কালে বাংলার বায়রন বলে পরিচিত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও আদর্শবাদ আছে, উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতির সবিস্তার বর্ণনারও অপ্রতুলতা নেই।

কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাস রচনা করার পশ্চাতে অন্য একটি গুরুতর কারণের উল্লেখ করতে হয়। রমেশচন্দ্র যে সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আসেন সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যগুরু। বঙ্গদর্শনের সূচনা বাংলা সাহিত্যে একটি যুগান্তর এনে দিয়েছিল। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে একদল নূতন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটল।

কর্মে জ্ঞানে চিন্তায় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন (১৮৭২)। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনা দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যাহাতে আত্মসম্মানবোধ সঞ্চারিত হয় সেই জন্য এই অধ্যবসায়। সেই সঙ্গে সমাজবোধ জাগাইবার চেষ্টাও রহিল। দেশের রাষ্ট্রীয় সংহতির অভাবের প্রতিও তিনি সচেতন ছিলেন। ২

১ I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.

২ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), 'বিশ বছরের আয়োজন'

বঙ্কিমচন্দ্রের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র অন্যতম। রমেশচন্দ্র বাংলায় কিছু রচনা করেন নি বলে সংকুচিত ছিলেন। সেই কারণে বাংলা রচনা থেকে তিনি বিরত ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে সে সংকোচ কেটে গেল। রমেশচন্দ্র বলেছেন—

বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখনা কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—'আমি যে বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি জানি না।' গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'রচনাপদ্ধতি আবার কি—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।' এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগরিত রহিল।[১]

রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং শশিচন্দ্র দত্তের কবিতাবলী ইংরেজিতে। পাঠকের এ-সকল রচনার প্রতি আগ্রহ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি-রচনার এই পরিণামের প্রতি রমেশচন্দ্রকে সতর্ক করে দিলেন। রমেশচন্দ্র গুরুর বাক্য শিরোধার্য করে উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে রমেশচন্দ্র অনুসরণ করেছিলেন রচনারীতিতেও। সাধু পুরুষের অবতারণায়, প্রণয়কাহিনী বয়নে, পাঠককে সম্বোধন করে জ্ঞানগর্ভ উপদেশদানে তিনি গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি একটি গোষ্ঠীর গুরুরূপে দেখা যায় তবে রমেশচন্দ্র সে গোষ্ঠীর অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু রমেশচন্দ্র বঙ্কিমকে পুরোপুরি অনুসরণ করেন নি। কোনো সার্থকনামা লেখকই তা করেন না। 'সমাজ' ও 'সংসারে' যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাই তার নামগন্ধও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতে ছিল না। এখানে রমেশচন্দ্র সেকালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একক।

১ নব্যভারত, বৈশাখ ১৩০০

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কৃতিত্বের দিক হল এই যে তিনি প্রথমে দেখালেন ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসনিষ্ঠা ও কল্পনার যথার্থ মেলবন্ধন স্থাপন করা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকেই জানতে পারি দুর্গেশনন্দিনীর সমাদর সেকালে অত্যন্ত বেশি ছিল। বইটির একাধিক সংস্করণ তার প্রমাণ। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী খাঁটি রোমান্স। রমেশচন্দ্র যা রচনা করেছেন তাও Historical Romance বটে; কিন্তু সেগুলি রোমান্সসর্বস্ব নয়। দুর্গেশনন্দিনীর পর অনেক লেখকই রোমান্সকে আরও তরল করে পরিবেশন করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের রচনা সে দিক থেকে তদানীন্তন বঙ্কিম-অনুসরণকারীদের সতর্ক করে দিলে। সে যুগের পক্ষে এর মূল্য অপরিসীম। রমেশচন্দ্রের স্বদেশচর্চার কথা আগে বলেছি। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান রস হচ্ছে ভৌম রস। দেশপ্রীতির কথা যথার্থসুরে অনুরণিত হয়েছে তাঁর রচনায়। তিনি যে একবার বলেছিলেন— I feel a pride at being thus a martyr to my duty এ কথা খাঁটি সত্য। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক রচনা-রীতিতে বঙ্কিম-রমেশকেই অনুসরণ করে-ছিলেন। রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

> বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যুগ আবার আসন্ন বলিয়া মনে হয়। সে যুগের বাঙালী লেখকগণকে পুনরায় জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাত মন দিয়া পড়িতে হইবে। তাঁহাদের চোখে ইতিহাসের ও শিল্পরীতির অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে। সেই ত্রুটিগুলি এড়াইয়া চলিতে গিয়া পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকগণ নিজেদের নূতন শক্তির আবিষ্কার করিবেন। এক সময়ে রমেশচন্দ্র বাঙালী সাহিত্যিককে দক্ষিণ হাতে ধরিয়া নূতন পথে চালনা করিয়াছেন, তখন আবার বাম হাতে ধরিয়া পুরাতন পথের খালখন্দ এড়াইয়া চলিতে সাহায্য করিবেন। যিনি নূতন পথে চালনা করেন তিনি নেতা, যিনি পুরাতন পথের ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেন তিনি গুরু। রমেশচন্দ্র একাধারে নেতা ও গুরু দুই-ই।[১]

বঙ্গবিজেতা

রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা 'বঙ্গদর্শনে' বার হয়েছিল। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও প্রেরণায় এ গ্রন্থ লিখিত। পারিবারিক জীবনে ইতিহাসচর্চার অপ্রাচুর্য ছিল না। নিজেও স্কট ভালো রকম পড়েছিলেন। সুতরাং গ্রন্থ লেখবার সময় রমেশচন্দ্র প্রধানত ইতিহাসকেই আশ্রয় করলেন। আরও একটি কথা উনিশ শতকে যে-সকল সমাজঘটিত উপন্যাস পেয়েছি (যদিও

১ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত, রমেশ রচনাসম্ভার, 'রমেশচন্দ্র দত্ত'

সংখ্যায় খুবই কম) সেগুলির চাইতে ঐতিহাসিক কাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। এইজন্যেই রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ সে সময়ে জনপ্রিয়তায় ন্যূন ছিল না।

বঙ্গবিজেতার কাহিনীর ঘটনাস্থল বঙ্গদেশ, সময় ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ। বাংলাদেশে হিন্দু রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদের অভ্যুদয় ঘটে। পাঠানরাজত্ব থেকে বাংলাদেশকে মোগল অধীনে আনবার জন্যে দিল্লীর মোগলসম্রাটেরা চেষ্টা করেছিলেন। পাঠানরা সহজে দেশ ছেড়ে দেয় নি। মোগলদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে পাঠানকুল বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজা টোডরমল্ল সর্বসমেত তিনবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তৃতীয়বার বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণ করতলগত করার জন্যে রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে উপনীত হলেন। এবারে বিদ্রোহী স্বয়ং মোগলসৈন্য। কি ভাবে রাজা টোডরমল্ল বাংলার জমিদারদের সাহায্যে এ বিদ্রোহকে দমন করেন এবং বাংলাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন সেই কথাই আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে। আখ্যায়িকায় ঘটনাটি ঘটতে মোট ছয় মাস লেগেছে।

রমেশচন্দ্র Major Stewartএর *History of Bengal* গ্রন্থটি অবলম্বন করেছিলেন। স্টুয়ার্টের বই থেকে ঘটনাটির সারমর্ম নিই।

বাংলাদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই সম্রাট আকবর রাজা টোডরমল্লকে বিদ্রোহ দমনে পাঠালেন। স্টুয়ার্ট আকবরের এই কার্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে বলেছেন—

> The political conduct of Akbar, in employing the Hindoo Chiefs, was attended with the most salutary efforts ; they were always accompanied by a large body either of their own clan, or of Rajpoots (the military tribe), who not only served to support the Moghul troops, now inadequate to retain in subjection so extended an empire, but were also useful as a check upon the latter, when refractory or dissatisfied.

বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্র স্টুয়ার্টের এই মন্তব্যটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রাজার মুঙ্গেরে অবস্থানের কালে ভাগলপুরে শত্রুসৈন্য সমাবেশ হল। রাজাও সৈন্যসজ্জা করতে লাগলেন। রাজার এই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। কারণ ইতিমধ্যেই দুইজন সেনাপতি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলে গেল। রাজাও তখন কৌশল অবলম্বন করলেন। ছোটোখাট যুদ্ধ-বিদ্রোহ চলতে লাগল।

> At length the Raja, by his influence amongst the Hindoo zemindars prevailed upon them no longer to supply the rebels with

provisions ; promising to pay them ready-money for everything they brought to his camp * * The combined effects of similarity of religion and ready-money payments worked so effectually on the zemindars, that famine shortly found its way into the reb.l camp, and compelled the Chiefs to separate, in order to obtain food.

স্টুয়ার্ট যে দুইজন সেনাপতির উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতায় তাঁদের কথা সবিস্তারে বলেছেন। একজন তর্খান খাঁ (Tersoom Khan) আর একজন মাসুম ফেরানজুডি (Masoom Ferunjudy)। বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্র স্টুয়ার্টের ইঙ্গিতকে অবলম্বন করে কাহিনীর জাল বুনেছেন। হিন্দু জমিদারদের উপর টোডরমল্ল যে কৌশলজাল বিস্তার করেন তারই অব্যর্থ ফল ফলল। জমিদার সতীশচন্দ্র যে ভাবে হিন্দু সৈন্যকে টোডরমল্লের পাশে দাঁড় করিয়েছেন তা সম্ভব হয়েছিল টোডরমল্লের হিন্দুত্বের জন্য। টোডরমল্লের আশ্রয়ে হিন্দু জমিদাররা আশ্বাস পেয়েছিল। এই কারণেই বিদ্রোহদমন সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য রমেশচন্দ্র এর মধ্যে আর একটি পক্ষকে এনে কাহিনীতে আবর্ত সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। সেইটি হল সুরেন্দ্রনাথ-সরলার কাহিনী। নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সরলার প্রেমাসক্ত। কতকটা নিজের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের জন্য, কতকটা পিতার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এবং সর্বোপরি সরলাকে লাভ করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইতিহাসের সঙ্গে রমেশচন্দ্র এই কাহিনীটি যোগ করে হয়তো বৈচিত্র্য আনবার প্রয়াস পেয়েছেন। কারণ সুরেন্দ্রনাথের রাজা টোডরমল্লের নিকট ভক্তি নিবেদন কতকটা আকস্মিক বলেই মনে হয়।

বঙ্গবিজেতা রমেশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক বাংলা রচনা। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর বিলাত ভ্রমণ (বাংলা অনুবাদ) ছাপিয়েছিলেন। প্রথম রচনা হিসাবে বঙ্গবিজেতা হয়তো অসার্থক নয় কিন্তু বঙ্গবিজেতায় ত্রুটিবিচ্যুতি প্রায় সর্বত্র। ইতিহাসের তথ্য সমাবেশের প্রাচুর্য উপন্যাসটির আষ্টেপৃষ্ঠে। পাঠক সে জটিল অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্যের জন্য কাহিনী বর্ণনা নিস্তরঙ্গ। সেজন্যে অনেক সময় বর্ণনার একঘেয়েমি গল্পের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। প্রায়ই কাহিনীর গতি রুদ্ধ করে রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে শিথিলবদ্ধ অনেক বস্তু উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রশেখরের আশ্রমের বিস্তারিত বর্ণনা, উপেন্দ্র-কমলা কাহিনী উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের

মধ্যে আমরা প্রায়ই মহাপুরুষ-জাতীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। সেই চরিত্রগুলিও কাহিনীর ঘটনার নিরপেক্ষ সাক্ষী মাত্র। (আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কার্য এ ক্ষেত্রে বিচার্য নয়) কিন্তু বঙ্কিমের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মহাপুরুষদের প্রভাব অন্তঃশীলা ভাবে উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে দেন। কোনো কোনো চরিত্রের উপর মহাপুরুষের প্রভাব এমনই আত্যন্তিক-ভাবে দেখা দেয় যে তাঁদের একটা পরোক্ষ প্রয়োজন সেখানে লক্ষগোচর হয়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের সৃষ্ট চন্দ্রশেখর এই জাতীয় চরিত্র নয়। মহাশ্বেতা নিষ্ক্রিয় (Passive) চরিত্র। সুতরাং তার সার্থকতা উপন্যাসে বিশেষ নেই। সুরেন্দ্রনাথ বিমলা অমলা কমলা সরলার উপর চন্দ্রশেখরের কোনো প্রভাবই দেখতে পাই না। চন্দ্রশেখরের মধ্যে মানবিকতার স্পর্শ নেই, তিনি একটা অশরীরী ছায়া— গ্রন্থকারের হিন্দুধর্মের প্রতি বিশ্বাসের নিদর্শন মাত্র। চন্দ্রশেখর আসলে প্রচারের বাহন। কাহিনী-বর্ণনার মধ্যে সহজ সমাধান খোঁজবার প্রচেষ্টায় রমেশচন্দ্র পরিণতিতে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য উপকাহিনী যোজনা করেছেন। পূর্বে উপেন্দ্র-কমলা কাহিনীর ব্যর্থতার কথা বলেছি। উপেন্দ্রের প্রেমের যে জ্বলন্ত বর্ণনা পাই তা পূর্বপরিচয়ের অভাবে একেবারে বেমানান হয়ে পড়েছে। পরিশেষে উপেন্দ্র-কমলার মিলন অসঙ্গতির মাত্রাকে একেবারে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। রোমান্সে ঘটনার প্রাচুর্য থাকেই। কিন্তু তা বাস্তবকে অস্বীকার করে না। ঘটনা-আশ্রিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসে চরিত্রের বিকাশ দেখানো সম্ভব। যেমন দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। রমেশচন্দ্র এ কাজে অক্ষম।

রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি সর্বাপেক্ষা বেশি পড়েছে সুরেন্দ্রনাথ-বিমলার উপর। বিমলা ইউরোপীয় উপন্যাসের আদর্শে অঙ্কিত। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যেও বিদেশী উপন্যাসের ছায়া বর্তমান। বিমলা রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। সে পিতৃভক্ত, দেবমহিমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণা, স্বার্থত্যাগী ও আদর্শপ্রেমের উপাসিকা। এতগুলি গুণের সমাবেশ করে রমেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত চরিত্রটির মধ্যে সঙ্গতি আনতে পারেন নি। অথচ সরলা-বিমলা-সুরেন্দ্রনাথ এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে যদি আবর্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হত তবে বাংলা সাহিত্যে ত্রিভুজ প্রণয়ের একটি চমৎকার নিদর্শন মিলত। সরলাকে কেন্দ্র করে বিমলার মনের গোপনতম প্রদেশটিকে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু রমেশচন্দ্র এ ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে বিমলাকে

আদর্শলোকের অধিবাসিনী করে তুলেছেন। বিমলার নৌকাযোগে মুঙ্গের যাত্রা এবং সুরেন্দ্রনাথকে আশ্রয়দান কতকটা ম্যাজিকের লক্ষণাক্রান্ত। বিদ্রোহীদের শিবিরে দাসীবেশে বিমলার আকস্মিক আবির্ভাব পাঠকের বিশ্বাসের উপর পীড়ন মাত্র। কেননা এ চরিত্রে এ দুঃসাহসিক কাজের কোনো লক্ষণই ছিল না। কেবলমাত্র রোমান্সের খাতিরেও একে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। বিমলার যে সন্ন্যাসিনীরূপ পাই তা গ্রন্থকারের আদর্শবাদেরই জয় ঘোষণা করছে।

রাজা টোডরমল্লের চরিত্র উপন্যাসে বিস্তৃত নয়। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাঁর উপস্থিতি। টোডরমল্ল বঙ্গবিজেতা। গ্রন্থের নাম যখন রাজাকে কেন্দ্র করেই তখন এ স্বল্প পরিচিতি অবাঞ্ছিত। ইতিহাসের বড়ো বড়ো পরিচিত চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করা কষ্টসাধ্য। কেননা এঁদের সম্বন্ধে আমাদের পূর্বলব্ধ জ্ঞান এত স্পষ্ট যে সেখানে কল্পনার অবকাশ কম। রমেশচন্দ্রও টোডরমল্লের বিস্তৃত পরিচয় দেন নি। অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত, কাল্পনিক চরিত্রকে অবলম্বন করেই গ্রন্থকার ইতিহাসের ইঙ্গিতকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন। তথাপি টোডরমল্লের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার হয় নি। তাঁর স্বজাতির প্রতি প্রীতিপক্ষপাত কতটা কূটচক্রান্তের অধিকারভুক্ত কতটা আন্তরিকতার নিদর্শন এই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। টোডরমল্ল তেজসিংহ রাণা প্রতাপাদিত্য ইত্যাদির মধ্যে যে দুর্মর স্বাদেশিকতার স্ফুরণ দেখতে পেয়েছিলেন নিজের জীবনের আচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি তাকে ধন্য করে তুলতে পারেন নি। টোডরমল্লকে একবার মাত্র আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দেখি। শকুনির উত্তেজনাময় বক্তৃতার সামনে টোডরমল্লের নির্ভীক আচরণের প্রত্যাশা পাঠকদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু টোডরমল্ল শকুনির কাছেও নীরব— বিচারসভা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এমন-কি টোডরমল্লের চরিত্রের সঙ্গতিও ব্যাহত। কারণ টোডরমল্ল প্রকৃত বীর, সাহসী যোদ্ধা, স্বজাতির রক্ষক। এই আদর্শ চরিত্রের এই নীরবতা, তাঁর কাপুরুষোচিত আচরণ বাস্তবতার সমস্ত রেশটুকুকে নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। সুরেন্দ্রনাথ সেকালের জমিদারের প্রতীক। রমেশচন্দ্র বলেছেন সেকালের বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনেকটা ইংলণ্ডের ফিউডাল প্রথার মতো ছিল। ফিউডাল সমাজের প্রভুদের আচরণের মতোই সুরেন্দ্রনাথের আচরণ।

আবার মধ্যযুগীয় নাইট চরিত্রের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও সুরেন্দ্র-চরিত্রে দুর্লক্ষ নয়। বিমলার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সে যখন ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাকে উদ্ধার করে তখন ইউরোপীয় নাইট চরিত্রের বীরত্বের আচার আচরণকেই মনে করিয়ে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ আদর্শ প্রেমিক, প্রকৃত যোদ্ধা, এবং প্রজাবৎসল জমিদার। তার জীবনও নির্দ্বন্দ্ব, নিস্তরঙ্গ। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাগুলিও অনেকটা নিরূপিত। বিশেষ কোনো আবর্তসঙ্কুল অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখতে পাই না। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। ** ধনবান্ জমিদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না; উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন; কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন, সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন।

গ্রন্থের নায়ক চরিত্র আসলে সুরেন্দ্রনাথ। সে-ই টোডরমল্লের যথার্থ সহচর।

শকুনির চরিত্রটি মোটামুটি মন্দ হয় নি। বিদেশি প্রভাব থাকলেও শকুনির কার্যকলাপের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয়টুকু রমেশচন্দ্র বর্ণনার দ্বারাই শেষ করেন নি; বরং তার কপটতা, ঈর্ষাবিদ্বেষকে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন। শকুনি সতীশচন্দ্রকে যে ভাবে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করেছিল তার কিছু অংশ নেপথ্যে, বাকি যে অংশ গ্রন্থে আছে সেখানেও দেখি পাষণ্ডের ধীর সতর্ক পদক্ষেপের মধ্যে চরিত্রোচিত ধর্ম অব্যাহত। সতীশচন্দ্র মুঙ্গের গেলে শকুনির যে স্বগতচিন্তা পাই সেইটি অনেক সময়ই শেক্সপীয়রের ইয়াগোর কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য ইয়াগোর সঙ্গে শকুনির তুলনা অসমীচীন। শকুনি নামটি উদ্দেশ্যমূলক। মহাভারতোক্ত শকুনির ধর্ম আরোপ করাই যেন লেখকের উদ্দেশ্য।

রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতার কাহিনীর সুলভ সমাধান করেছেন। ন্যায়নীতির বিচারে চরিত্র সাজিয়েছেন। পাপ এবং পুণ্যের ফল বন্টনে লেখক সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু মানবচরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের পরিচয় লেখকের কাছে তখনও অজ্ঞাত। মানবমনের গতি যে বিচিত্র এবং জটিল এবং তা যে সব সময়ই ন্যায়নীতির সহজ পথ ধরে চলে না এইটি লেখক বুঝতে পারেন নি। লেখকের আদর্শবাদ এ দিকটির প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা দেখিয়েছে।

কিন্তু বঙ্গবিজেতা উপন্যাসেই রমেশচন্দ্রের শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। সতীশচন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে, মহাশ্বেতার ঈর্ষাদগ্ধ অন্তর উদ্ঘাটনে, শকুনির কপটরূপচিত্রণে রমেশচন্দ্রের কৃতিত্ব নগণ্য নয়। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঙালি বীরচরিত্রের চিত্র দিয়েছেন। ঐতিহাসিকেরা বলেছেন পাঠান রাজত্বে বাংলাদেশে যে শান্তি ফিরে এসেছিল তা মোগল আক্রমণে পুনরায় ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের এই অরাজকতার সময়কে কেন্দ্র করে রমেশচন্দ্র তাঁর কাহিনীর বীজ বুনেছেন।

তবে বাঙ্গালী তখনো মরে নি, ধর্মের নামে তখনো সে প্রাণ দিতে পারত।[১]

রমেশচন্দ্র উপন্যাসে সুরেন্দ্রনাথকে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে দেখেছেন। সুরেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নরহরি সরকারের শিষ্য বৈদ্য চন্দ্রশেখর নয়। মধ্যযুগের কবির কাছে ধর্মের নামে প্রাণদান মহৎ সম্ভাবনায় সূচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রমেশচন্দ্র সেইটি দেখেছেন দেশপ্রেমের পটভূমিকায়। রমেশচন্দ্র বাংলাদেশের জমিদার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও ইতিহাসের অনুকরণে। কেননা জমিদাররা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তখনকার জমিদারদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দেখেছেন অপ্রতিহত ক্ষমতা। আধুনিক গবেষণায়ও রমেশচন্দ্রের এ মন্তব্য স্বীকৃত হবে—

The Zemindars, within their territories were free to rule as they liked : free to rule and, free to oppress.[২]

মুকুন্দরাম মোগল শাসনের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন আত্মপরিচয়-সূত্রে। রমেশচন্দ্র অবশ্য এই অত্যাচারের বর্ণনাকে প্রকটিত করেন নি। তাঁর উপন্যাস এই দিক দিয়ে জমিদারের পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং টোডরমল্লের সঙ্গে জমিদারদের সম্বন্ধ নির্ণয়ে রচিত। বঙ্গবিজেতার প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের মিলনদৃশ্যটি ছিল। পরবর্তী সংস্করণে এ দৃশ্য বর্জিত। হয়তো গ্রন্থের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলে রমেশচন্দ্র একে বর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর *Literature of Bengal* গ্রন্থে কৃত্তিবাস এবং মুকুন্দরামের সময় বিভিন্ন। তিনি নিজে বলেছেন এঁরা সমসাময়িক নন। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে এইটিকে বর্জন করা হয়েছে বলে মনে করি।

১ শ্রীসুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

২ Tapan Kumar Roy Choudhury, *Bengal Under Akbar and Jehangir*

মাধবীকঙ্কণ

১৮৭৭ সালে মাধবীকঙ্কণ বার হল। 'বঙ্গবিজেতা'র সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণ প্রকাশ করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা দুই-ই বেড়ে গেল। মাধবীকঙ্কণের কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের আবির্ভাব চকিত বা অস্পষ্ট নয়। 'বঙ্গবিজেতা'র কাহিনীতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ করি। সবই যেন ধূসরবর্ণে চিত্রিত। কিন্তু মাধবীকঙ্কণে ইতিহাসের চিত্রগুলি সজীব এবং প্রাণবন্ত। এখানে অতীতের আবহরচনায় রমেশচন্দ্র সার্থককাম।

শাজাহানের শেষজীবনে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিরোধ ব্যাপারটি মাধবীকঙ্কণের ঐতিহাসিক পটভূমি। এই বিরোধ মোগল শাসনের একটি বিখ্যাত ঘটনা। পরবর্তী দুই উপন্যাসে রমেশচন্দ্র যে রাজপুত জাতির ইতিহাস অঙ্কন করেছেন তার প্রকৃত সূচনা মাধবীকঙ্কণে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রাজপুতকাহিনীর প্রতি অন্যান্য অনেক ঔপন্যাসিকের মতো রমেশচন্দ্রেরও প্রীতিপক্ষপাত ছিল। বঙ্গবিজেতায় টোডরমল্লের সপ্রশংস উক্তির মধ্য দিয়ে রাজপুতজাতির প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছিল। বঙ্গ বিজেতায় যা বীজাকারে মাধবীকঙ্কণে তার অঙ্কুরোদ্গম, পরবর্তী দুই উপন্যাসে তা ফুলে ফলে শোভিত হয়েছে। এই চারখানি উপন্যাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগসূত্রের এই একটি দিক। স্মরণ রাখা কর্তব্য, একশো বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলেই উপন্যাস চারখানি 'শতবর্ষ' নামে বেরিয়েছিল এও যেমন সত্য তেমনি এইটিও উল্লেখযোগ্য যে এই শতবর্ষে একটি জাতির উত্থানপতনও এই উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত হয়েছিল।

মাধবীকঙ্কণ শাজাহানের সময়ের ঘটনা বটে কিন্তু উপন্যাসটির আসল আকর্ষণ (centre of interest) হেমলতা এবং নরেন্দ্রের প্রেমোপাখ্যান। গ্রন্থের শেষে রমেশচন্দ্র নায়ক-নায়িকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রকৃত নায়ক কে এ প্রশ্নের উত্তরে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় দেখে বোঝা যায় তিনি মোগল সম্রাটদেরও নায়কের মূল্য দিতে স্বীকৃত। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কাহিনীপরিকল্পনা বিচার করেও এ কথা বলা যায়। ঐতিহাসিক ঘটনার তিনটি সূত্র। এক, রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা;

দুই, টডের রাজস্থান; তিন, স্টুয়ার্টের *History of Bengal.* ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে সুজার দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি এবং সিংহাসন লাভের জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা, আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন। অপর দিকে আওরঙ্গজেবের কপটতা, মোরাদকে বশীকরণ, যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজপুত বীরের পরাজয়। মেওয়ার ও মাড়োয়ারের দ্বন্দ্ব এবং রাজপুতজাতির বীরত্বগরিমা গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

স্টুয়ার্টের *History of Bengal*এ সুজার শাসনের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু হতভাগ্য সুজা দণ্ডনীতির বিশেষ ধার ধারতেন না। অস্থিরমতিত্ব তাঁর চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানে সাহসিকতা ও শক্তিমত্তার যথেষ্ট নিদর্শন থাকলেও রণবিদ্যার জটিলতা ও প্রয়োগকৌশল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। এই কারণে সুজা শক্তিশালী হয়েও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। কাহিনীর সমাপ্তিতে রমেশচন্দ্র সুজার ট্রাজেডি বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনা উপন্যাসের মূল অঙ্গ হতে পারে নি। আরাকানীদের দ্বারা সুজা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন, এবং তাঁর অপর দুই পার্শ্বচরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর প্রিয়তমা মহিষী প্যারীবানু সৌন্দর্য এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার জন্য বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আরাকানী রাজা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তিনি নিজে আত্মহত্যা করেন। সুজা সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট বলেছেন—

> He might have filled with credit the throne of a well-regulated and established kingdom but he had not energy or ability to contend with such a revival as Aureungzeb ; nor prudence to remain content with a province, while he thought himself entitled to the empire. No prince was ever more belooked than Shuja ; misfortune, and even death itself, could not deprive him of his friends ; and though his fate was not known in Hindoosthan for some years after his death, yet it filled every eye with tears :

মহম্মদের সুজার বিরুদ্ধে অভিযান এবং তাঁর কন্যার প্রতি আসক্তি পরে সুজার পক্ষ ত্যাগ— স্টুয়ার্ট এই ঘটনাগুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। মীরজুমলার কৌশল অবশেষে সুজার মৃত্যু ডেকে আনল। সুজার ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক শাজাহানের কথা এই প্রসঙ্গে স্বতই মনে আসে।

স্টুয়ার্টের গ্রন্থ রমেশচন্দ্রের অবলম্বন হলেও গ্রন্থের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে

রাজপুতকাহিনী। নায়ক নরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার পর দিল্লীতে যে রাজপুতদের মধ্যে বিরোধসংঘাত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রমেশচন্দ্র মূলত টডের রাজস্থান থেকে সেই কাহিনী নিয়েছেন। রমেশচন্দ্র যশোবন্ত সিংহের বীরত্ব, স্বদেশানুরাগ, রাজপুত জাতির উৎসব এবং যোধপুর মাড়ওয়ারের ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন। মোগল ভ্রাতৃবিরোধে বিশ্বস্ত রাজপুত সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ না করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব দারার পক্ষাবলম্বী যশোবন্ত সিংহকে পরাস্ত করে নিজের ক্ষমতায় আসীন হন। প্রধানত যশোবন্তের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধবর্ণনা এবং মেওয়ার মাড়ওয়ারের রাজনৈতিক বিষয় মাধবীকঙ্কণে স্থান পেয়েছে। টড তাঁর রাজস্থানে রাজপুত জাতির বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রমেশচন্দ্রের পক্ষে রাজপুতের আচার ব্যবহার সংগ্রহ করা অতি সহজ হয়েছিল। যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের কলহ টডের রাজস্থানে অবশ্য বেশি জায়গা জোড়ে নি। রমেশচন্দ্র নিজ কল্পনাবলে এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যেও ইতিহাসের চাঞ্চল্যকে জাগ্রত করেছেন। স্টুয়ার্ট যশোবন্ত সিংহের কথা বলেছেন। অপ্রাসঙ্গিক বলে দীর্ঘ বর্ণনা এড়িয়ে গেছেন। টডের কাহিনীতে ঘটনাটি উপযুক্ত মর্যাদাতে রক্ষিত। উম্‌রার পরে রাজা যশোবন্ত সিংহ মাড়ওয়ারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হলেন। মেওয়ারের রানীর বংশজাত বলে যশোবন্তের কৌলীন্যও রক্ষিত। চাঁদ বরদাই বলেছেন, সেই সময়ে গণ্ডয়ানার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাজা যশোবন্ত সিংহ বাইশটি রাজপুত জাতির সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যশোবন্তকে পাঁচহাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করেন। শাজাহানের অসুস্থতার সময়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে তাতে রাজপুত জাতির ভূমিকাও নগণ্য নয়। টড বলেছেন,

> In the struggle for empire amongst the sons of Shah Jehan, consequent upon their illness, the importance of the Rajpoot princes and the fidelity we have often had occasion to depict, were exhibited in the strongest light.

আওরঙ্গজেব ও মোরাদের সম্মিলিত অভিযানের বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কৌশলের অভাবে এবং কতকটা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করেও যুদ্ধে যশোবন্ত পরাজিত হন। এই যুদ্ধ রাজপুত ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বার্ণিয়ের, চারণকবি,

প্রত্যেকেই রাজপুতবীরের প্রশংসা করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যশোবন্তের কলহ-মিলনের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে টড এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যশোবন্ত তখনকার সময়ের অনেক রাজপুতবীর থেকে উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কার্যের মধ্যেও একটা বৃহত্তর প্রয়োজন সাধনের বীজ নিহিত থাকত। এই বৃহত্তর স্বার্থ সম্ভবত রাজপুত-জাতির ঐক্য সাধন এবং রাজপুতজাতির হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার। যশোবন্ত সিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করে টড বলেছেন—

> Although the Rahtore had a preference amongst the sons of Shah Jehan, esteeming the frank Dara above the crafty Arungzebe, yet he detested the whole race as inimical to the religion and the independence of his own ; and he only fed the hopes of any of the brothers, in their struggles for empire, expecting that they would end in the ruin of all.

নর্মদার যুদ্ধে পরাজয়ের কথা যশোবন্ত কখনোই ভুলতে পারেন নি, ভোলা সম্ভবও ছিল না। প্রতিশোধের স্পৃহা সর্বদাই তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। সুতরাং আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতির ছিল না। রাজনৈতিক ঘটনার আবর্তের এই দুই নায়ক একে অপরের সমর্থন বা শত্রুতা করেছেন। টডের এই উক্তিটি স্মরণীয়—

> If Jeswunt's character had been drawn by a biographer of the court, viewed merely in the light of a great vassal of the empire, it would have reached us marked with the stigma of treachery in every trust reposed in him : but, on the other hand, when we reflect on the character of the king, the avowed enemy of the Hindu faith, we only see in Jeswunt a prince putting all to hazard in its support.

রমেশচন্দ্রও যশোবন্ত সিংহের এই দিকটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন। যশোবন্ত সিংহ হিন্দুজাতির আশা এবং আকাঙ্ক্ষার স্থল। তাঁর পরাজয়ে বৃহত্তর সভ্যতার পরাজয়, তাঁর জয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম উজ্জীবিত হবে এইটি রমেশচন্দ্রের ধারণা ছিল। সে কথা পরে বিস্তৃত আলোচনা করছি। এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। শশিচন্দ্র দত্তও যশোবন্ত সিংহের মহীয়সী পত্নীকে অবলম্বন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যশোবন্ত দেশে ফিরে এলে তাঁর পত্নী রাজধানীর দরজা বন্ধ করে দেন। এবং পরাজিত রাজা দেশে ফিরলে মেওয়ার মাড়ওয়ারের অপমান, এ জন্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই রাজার

পক্ষে শ্রেয় এই কথাই রানী রাজাকে বলে পাঠিয়েছিলেন। এই গৌরবগাথা রমেশচন্দ্র সবিস্তারে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পিতৃব্যের কবিতা হয়তো রমেশ-চন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

তৃতীয় সূত্রের যে উল্লেখ করেছি তার প্রমাণ লেখক নিজেই গ্রন্থের মধ্যে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেশের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে সহায়তা করেছিল। শারদীয়া পূজার বর্ণনা দিতে গিয়ে রমেশচন্দ্র বলেছেন—

> বর্তমান লেখক রাজস্থানে ভ্রমণকালীন শারদীয়া খড়্গপূজা ও শারদীয়া সমারোহ অবলোকন করিয়াছে, সহস্রনগরবাসিদিগের সমাগম ও রাজভক্তি দৃষ্টি করিয়াছে, প্রাচীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন রাজপুতদিগের শরৎকালের আনন্দোৎসব দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করিয়াছে।

লক্ষণীয়, রমেশচন্দ্র 'স্বাধীন রাজপুতজাতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। লেখকের স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগের প্রমাণ এই গ্রন্থে সর্বত্র।

পূর্বে বলেছি মাধবীকঙ্কণে রমেশচন্দ্র ইতিহাসের অনুসরণ করে ইতিবৃত্তের মধ্যে সজীবতার চাঞ্চল্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি কেবল ইতিহাসের ফাঁক পূরণ করেন নি বরং জ্ঞাত তথ্যকে উপস্থাপন করেছেন কৌশলে। রমেশচন্দ্রের রচনারীতিতেও অনেকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ অতীতের প্রতি পাঠকের হৃদয়কে স্নেহসিক্ত করা। এই অতীত তখন আর অতীত রূপেই থাকে না। আমরা তার উপস্থিতি নিজেদের মধ্যে অনুভব করি। অতীতকাহিনী সেখানে বর্তমানের হাসিকান্নার সঙ্গে একটা নিবিড় নৈকট্য লাভ করে। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে এই সাযুজ্যসাধন রমেশচন্দ্রের অন্যতম কৃতিত্ব। ইতিহাসের বড়ো বড়ো চরিত্রের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র নিজের কল্পনাকে ব্যবহার করেন নি। যুগোপযোগী পরিবর্তনও করেন নি। হয়তো রূপান্তরের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নি। ইতিহাসে যশোবন্ত সিংহের, আওরঙ্গজেবের যে পরিচয় পেয়েছি রমেশচন্দ্রের বর্ণনায় তার থেকে কোনো মৌলিক পরিবর্তন বা রূপান্তর দেখতে পাই না। মাধবীকঙ্কণের অন্যতম আকর্ষণ রয়েছে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড চিত্র পরিবেশনের মৌলিকতায়। নরেন্দ্র-হেমলতা কাহিনী রাজপুত-গৌরব-গাথার প্রতিস্পর্ধী হয়ে দেখা দিয়েছে। এইটি গ্রন্থের ত্রুটি বলেই মানব। কিন্তু এই শিথিলতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন পারিপাট্যের মধ্যেই কিয়ৎপরিমাণে রয়েছে। রমেশচন্দ্রও তার থেকে মুক্ত নন।

রাজপুত জাতির গৌরবগাথা রমেশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত বিবৃতির মধ্যেও প্রকাশ করেছেন। গজপতির সার্থকতা অনস্বীকার্য। গজপতির চকিত আবির্ভাব রাজপুত জাতির একটি গুণের দিকে আলোকসম্পাত করেছে। তাঁর আবির্ভাব ক্ষণিক কিন্তু প্রভাব স্থায়ী। রমেশচন্দ্রের সময়ে বাঙালি বীর বলে পরিচিত ছিল না এ কথা সত্য, কিন্তু বীরত্বের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির সতৃষ্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল। রাজপুত গৌরবগাথার মধ্য দিয়ে সে সেই বীরত্বের স্বাদ পেয়েছে। নরেন্দ্রের খেদোক্তিতে সেই কথা শুনতে পাই। রমেশচন্দ্র একটি পরিচ্ছেদে রাজপুত চারণের জ্বালাময়ী ভাষণ উদ্ধার করেছেন। এই ভাষণ আসলে রাজপুতজাতির চারিত্রিক ভাষ্য। যুদ্ধের কোদণ্ডটংকার কিংবা তার উত্তাপ উত্তেজনা অপেক্ষা এই উদাত্ত আহ্বান কোনো অংশেই ন্যূন নয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন ধর্ম এবং জাতি ও দেশের নামে চারণরা সৈনিকদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের অবমাননা রাজপুতগৌরবকে কলঙ্কিত করেছে। বৃদ্ধ চারণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশকে আহ্বান করেছেন। এর মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে পারি। অতীতের মহত্ত্ব বর্তমান জীবনকেও চকিত করে তুলে।

ইতিহাসের তথ্যবিবৃতির পাশাপাশি রমেশচন্দ্র যে কাহিনীগুলি স্থাপন করেছেন সেগুলির বিচার করি।

প্রথমেই ধরা যাক নরেন্দ্র-জেলেখা উপাখ্যানটি। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসেও তেমনি ত্রিভুজ প্রণয়চিত্র অঙ্কনে লেখক ব্যর্থকাম। ত্রিভুজ প্রণয়চিত্রে স্কট রোয়েনা-রেবেকা-আইভ্যানহো-র চলচ্চিত্র কেবল ঘটনা-সংঘাতের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও স্কট যথাসম্ভব দিয়েছেন। আইভ্যানহো একবার রোয়েনা আর-একবার রেবেকা কোটিতে পদচারণা করেছে। এতে একটা আবর্তসংকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে এর বিপরীত পন্থা অনুসৃত হতে দেখি। জেলেখা সম্পূর্ণ রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। তাতারদেশীয় যুবতীর মধ্যে যে একটা আরণ্যক প্রবৃত্তির সংবাদ পাঠকচিত্তের গহনে অনুরণন তুলতে পারত রমেশচন্দ্র তাতার রমণীর সে দিকটিকে অপ্রকাশিত রেখেছেন। একবার মাত্র ছুরিকাহস্তে তাকে দেখতে পাই। কিন্তু সেই অবস্থাটি ঘটনার বিবরণমাত্র, হৃদয়দ্বারা স্পৃষ্ট নয়। জেলেখার দেওয়ানা রূপে নরেন্দ্রের পশ্চাৎগমন এবং তার সেবাপরায়ণা মূর্তি অবশেষে ব্যর্থপ্রেমের আত্মাহুতি একটা ধীর

অকম্পিত আদর্শবাদের ছাঁচে ঢালা হয়েছে। তবু এই চরিত্রটিতে রোমান্সের দীপ্তি লক্ষিত হয়। চরিত্রবিশ্লেষণ নেই কিন্তু তার কার্যাবলীর মধ্যে অসাধারণত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

কিন্তু মোগল-হারেমের বর্ণনায় লেখকের কৃতিত্ব সমধিক। নরেন্দ্রনাথ রোগশয্যায়। চারি দিকে সতর্ক প্রহরীর শাসনে অন্তঃপুরের বিলাসিতার মধ্যে বাহ্যাড়ম্বরের লক্ষণ পরিস্ফুট। নরেন্দ্রের কাছে সমস্ত ঘটনাটি স্বপ্ন কিংবা ইন্দ্রজাল বলে বিবেচিত হয়েছে। মোগল-বিলাসিতার বর্ণনার পশ্চাতে দুটি নরনারীর চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা স্থাপিত করে রমেশচন্দ্র মোগল ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের মধ্যেও অন্তঃসারশূন্যতার রিক্ততার বেদনা ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজান্তঃপুরের এক দিকে ভোগের চরমতা অন্য দিকে অবরুদ্ধ জীবনের আর্তনাদ। সমস্ত পরিবেশটির মধ্যে একটা শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

অপর দিকে লেখক রাজপুত জাতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। সেখানে ঐশ্বর্যের প্রমত্ততা নেই কিন্তু নিরাভরণ সৌন্দর্য রয়েছে। যশোবন্তের রানীর একবার মাত্র আবির্ভাব ঘটেছে। তার মধ্য দিয়েই ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা চিরস্মরণীয় হয়েছে। মাড়ওয়ার ও মেওয়ারের রাজনৈতিক কলহকে কেন্দ্র করে রমেশচন্দ্র দু-একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। স্কট যেমন লোকাচার প্রাচীন ছড়া লোকনীতিকে অবহেলা করেন নি, বরং নিজের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে সেগুলির সাহায্য নিয়েছেন সেইরকম রমেশচন্দ্রও দেশজ কাহিনী, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন গ্রহণ করেছেন ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করবার জন্যে। রমেশচন্দ্র মাধবীকঙ্কণে মাড়ওয়ার ও মেওয়ারের মধ্যে বিরোধটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই ছড়াটির মাধ্যমে—

আক রা ঝোপরা
ফোক রা বার
বাজরা রারোটি
মথ রা ডাল
দেখো হো রাজা, তেরি মাড়ওয়ার। ১

এইটি রাজপুত জাতির দর্পণ। শারদীয়া পূজা পরিচ্ছেদটি বাস্তবধর্মী উপন্যাসে অনাবশ্যক কিন্তু এই উপন্যাসে এর আবশ্যিকতা অনস্বীকার্য।

১ James Tod. *Annals of Rajast'han*

সুতরাং এক দিকে রোমান্সরস পরিবেশনে অন্য দিকে বাস্তবতার অনুসরণ মাধবীকঙ্কণে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণটি প্রকাশিত।

কিন্তু উপন্যাসটির দুর্বলতাও প্রচুর। নরেন্দ্রনাথ-হেমলতা-জেলেখা কাহিনী এবং ইতিবৃত্ত সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত। এই দুইয়ের অন্তরাল কোথাও ঘোচে নি। হেমলতাকে লাভ করবার জন্যেই নরেন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রা। কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ দিশেহারা। নরেন্দ্রনাথের সংকল্পকে চরিতার্থ করবার যে উদ্যম-প্রচেষ্টা সেইটি ঘটনাজালের অতিবিস্তারের জন্য ব্যাহত। যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যে, মোগল-দরবার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে, রাজপুত গরিমার দীপ্ত মহিমা চিত্রণের মধ্যে রমেশচন্দ্র হেমলতার কথা মনে করিয়ে দিলেও নায়ক-চরিত্রের মধ্যে উদ্যমহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। কেবলমাত্র পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে পাঠক নরেন্দ্রের মানসিক অবস্থার পরিমাপ করতে সমর্থ হয়। এতে নরেন্দ্রনাথ কেন্দ্রনিয়ামক শক্তি না হয়ে গৌণ স্থান অধিকার করেছে। কাহিনীর আকর্ষণের মূল কেন্দ্রটিও দ্বিধাবিভক্ত। তবে 'বঙ্গবিজেতা'য় এ ত্রুটি যতটা অধিক এখানে সেই পরিমাণে নয়। উপন্যাসরচনায় রমেশচন্দ্র এখন পর্যন্ত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নন এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। হেমলতা গ্রন্থের প্রারম্ভে সজীব-প্রাণাবেগের অজস্র উৎসারে গতিচঞ্চল। তার নরেন্দ্রনাথের প্রতি আসক্তি চিত্তের তীব্র ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিদায়দৃশ্যে হেমলতার মধ্যে নরেন্দ্রের স্মৃতি জাগরিত থাকলেও পূর্বের আবেগ মন্থর হয়ে এসেছে। তার আন্তরিকতার মাঝখানে একটা ঔদাসীন্যের সুর বেজে উঠেছে। এর কারণস্বরূপ ডক্টর সুকুমার সেনের ইঙ্গিতটিকে বিস্তৃত করা যায়।[১] তিনি বলেছেন কাহিনীটির পশ্চাতে টেনিসনের এনক আর্ডেনের ছায়াপাত ঘটেছে। এনক আর্ডেন— নরেন্দ্র, ফিলিপ— শ্রীশচন্দ্র, অ্যানি লি— হেমলতা। টেনিসনের কবিতাটিও কাহিনী-মূলক। তথাপি এনক আর্ডেনে গীতিকবির ধর্ম অব্যাহত। কতগুলি ইঙ্গিতের সাহায্যে কবি এই তিনটি চরিত্র বর্ণনা করেছেন। এনক আর্ডেনের চরিত্রের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাধর্ম্য বজায় আছে। নরেন্দ্রনাথ শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন, Enoch Arden-ও তাই—

> And Enoch Arden, a rough sailor's lad
> Made orphan by a winter ship-wreck, play'd...

১ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

এনক আর্ডেনের অ্যানি লির কাছ থেকে বিদায়দৃশ্যটিও নরেন্দ্রনাথের হেমলতার কাছ থেকে বিদায়দৃশ্যের অনুরূপ। সমুদ্রউপকূলে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এনক আর্ডেন যখন আবার ফিরে এল একটি মাত্র আশা নিয়ে তখন সে জানতে পারল ফিলিপের সঙ্গে অ্যানি লি বিবাহিত। এনক আর্ডেনের খেদোক্তিতে কবিতার পরিসমাপ্তি। রমেশচন্দ্র এই প্রণালী অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উপন্যাস আর গীতিকাব্য এক নয়। ঔপন্যাসিক চরিত্রের পরিবর্তন নানা বিশ্লেষণের সাহায্যে পরিস্ফুট করবেন। কবি যেখানে কেবলমাত্র বর্ণনার আশ্রয় নেন ঔপন্যাসিক সেইখানে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলবার জন্য পাঠকের নিকট বিশ্লেষণ করতে প্রতিশ্রুত। বিশেষত হেমলতার পরিবর্তনটি যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত। তবে নিছক গীতিধর্মিতার দিক দিয়ে দুটি নরনারীর প্রেমের উত্থানপতন, ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর্ডেনের খেদোক্তি করুণ, নিবিড় এবং তার আর্ত হাহাকার নরেন্দ্রনাথের মাধবীকঙ্কণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ-হেমলতার প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনীর তুলনা করেছেন।[১]

শৈলেশ্বরের ভূমিকায় রোমান্টিকতার চূড়ান্ত রূপ পরিস্ফুট। শৈবলিনী বিরলদৃষ্ট হলেও বর্ণনাকৌশলে সুন্দর।[৪]

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

(১২৮৩ বঙ্গাব্দে মাধবীকঙ্কণ রচনার পর বৎসরই 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' প্রকাশিত হয়।) ১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্রের কিছু কিছু ইংরেজি রচনাও বার হল। প্রথম দুই উপন্যাসেই রমেশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর পর পূর্বের ভীরুতা অনেকাংশে অপসারিত হয়ে যায়।(পূর্বে বলেছি প্রথম দুটি উপন্যাসে ইতিহাস বিশেষ মূল্য পায় নি। অথচ ইতিহাসের প্রতি লেখকের অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। বঙ্গবিজেতায় এবং মাধবীকঙ্কণে প্রণয়-কাহিনীগুলিও যথাযোগ্য মর্যাদায় চিত্রিত হয় নি। আরও একটি কথা মনে হয় যে রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার উৎসাহ বোধ করলেও

১ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

উপাদনের অভাবে তাঁর আশা সফল হয় নি। বাংলার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন নি। ১৮৭৭ সালে ছদ্মনামে বাংলাদেশের প্রাচীন কবিসাহিত্যিকের জীবনী প্রকাশ করলেও প্রাচীন বাংলার সামাজিক রীতি-নীতি, আইন-কানুন সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য লেখক পান নি। তা না হলে বঙ্গবিজেতায় তিনি তদানীন্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে ফিউডাল আখ্যায় অভিহিত করলেও ফিউডালিজমের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত রমেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রায় সকলেই দেশহিতৈষণার বাণী প্রচার করেছেন। বাংলার শৌর্যবীর্য অতীতের বিস্মৃত অধ্যায়। তার কাহিনী স্বপ্নলোকের। ইতিহাস-অনুগতি এই বিরল তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে সম্ভব নয়। দেশকে প্রকৃত বীরত্বে উদ্‌বুদ্ধ করতে গেলে অপেক্ষাকৃত পরিচিত তথ্যের উপরই নির্ভর করা উচিত। পাঠান-মোগল শাসনের সময়ে প্রকৃত বাঙালি বীরের বিদ্রোহ দুর্লক্ষ। ইতিপূর্বে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রান্তীয় রাজকাহিনী স্থান পেলেও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যকে প্রকৃত বীরের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। এই কারণে রাজপুত বীরত্বগাথা অতি সহজে রমেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে নবজাগ্রত মহারাষ্ট্রবীরের কাহিনী সংকলিত। কারণ শিবজীর অভ্যুত্থানেব মধ্যে অনেক বাঙালিই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজী রাজপুত জাতির থেকে দেশপ্রেমের বাণীটি পেলেন। রাজপুত জাতি তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল, পূর্বের বীরত্বগাথা তাদের মনে উৎসাহ জাগায় কিন্তু শক্তির অভাবে তা কার্যে পরিণত হয় না। প্রতাপের বীরত্বকাহিনী রাজপুত জাতির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটালেও আওরঙ্গজেবের কৌশলের কাছে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। সুতরাং শিবজীই রাজপুতপরিত্যক্ত বিজয়গৌরবের উত্তরাধিকারী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও শিবজীর কাহিনীকে অবলম্বন করেছিলেন। তবে ভূদেবের কাহিনীতে রোশিনারা উপাখ্যানের প্রাধান্যের জন্যে ইতিহাসের অন্যতর প্রয়োজনীয়তার দিকটি খানিকটা অবহেলিত। রাজা যশোবন্ত সিংহের কাছে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে শিবজী যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন, জ্বলন্ত ভাষায় রাজা যশোবন্তকে উত্তেজিত করবার যে প্রচেষ্টা শিবজীর মধ্যে দেখতে পাই রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের পূর্বাভাসরূপে তাকে গণ্য করা যায়। ভূদেবের

স্বপ্ন রমেশচন্দ্র শিবাজীকে কেন্দ্র করে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই উপন্যাসে অপর আর-একটি কাহিনীর সার্থকতাও এইখানে। তিলকসিংহের এবং পৌত্র গজপতি সিংহের পুত্র রঘুনাথের যে করুণ মধুর রূপটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তাতেও রাজপুত গরিমাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে রাজপুত ও মারাঠাজাতিকে লেখক একই দৃষ্টিতে দেখেছেন। মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাচীন হিন্দু গৌরবকে পুনরুদ্ধার কাজে যে সমস্ত রাজা আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই লেখকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। রমেশচন্দ্র নিজেও রাজপুত-মারাঠা মিলনসূত্রটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। রমেশচন্দ্রের বাসনা ছিল মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান নিয়ে আর-একটি উপন্যাস রচনা করবার। এই বিষয়েও রমেশচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য দেখি। ভূদেব স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কল্পনাময় ছবি এঁকেছেন। রমেশচন্দ্রের বাসনা অন্যরূপ। তার প্রকৃত রূপ কী হত আমরা জানি না। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ লেখবার প্রত্যক্ষ কারণ কী তা তিনি নিজেই বলেছেন—

> I remember the solitary evenings when I encamped in the midst of the rice-fields of Dakhin Shahbazpur a sea-washed island in the mouth of the Ganges when I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Mahrattas, and spent my nights in dreaming over story of Sivaje.

Duffএর *History of the Mahrattas* গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। এটির প্রকাশকাল ১৮২৬ সাল। সমগ্র মারাঠা জাতির উত্থান ও পতন গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রথম খণ্ডে শিবজীর ইতিহাস। রমেশচন্দ্র এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে শিবজীর পূর্বজীবন বর্ণনা করেছেন।

শিবজীর মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ, জয়সিংহের সঙ্গে সহায়তা, এবং যশোবন্ত সিংহের সহায়তা সবই বর্ণনা করেছেন। জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের কাহিনীও Duff থেকে গৃহীত।

চন্দ্ররাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা শক্ত। তবে শিবজীর প্রথম জীবনের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার মধ্যে চন্দ্ররাওয়ের নাম পাচ্ছি। চন্দ্ররাও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এইটি বংশগত নাম। চন্দ্ররাওকে বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে না পেরে শিবজী কৌশলে রঘুনাথ দ্বারা তাঁকে হত্যা করান। ডফ যে বিবৃতি দিয়েছেন যদুনাথ সরকারও সেই সব

বিষয় উল্লেখ করেছেন। সকলেই মনে করেন শিবজীর মৃত্যুর অল্পকিছুকাল পরে কৃষ্ণজী অনন্ত সভাসদের রচিত শিব-ছত্রপতি-চেন সপ্তম-প্রকরণ-আত্মক-চরিত (১৬৯৪) গ্রন্থের শিবজীর এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ডফ প্রকাশ্য-ভাবে শিবজীর নিন্দা করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যদুনাথ সরকার শিবজীর এই ঘটনাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চান নি। তিনি মনে করেন বাল্যকালের অস্থিরমতিত্বই এর জন্য দায়ী। রমেশচন্দ্রের পক্ষে আধুনিক গবেষণা জানা সম্ভব ছিল না। শিবজী তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ চরিত্র। সুতরাং তিনি বীরের এ কলঙ্ক মোচন করবেন এটা স্বাভাবিক। চন্দ্ররাও মারাঠাবাসী। প্রকৃত যোদ্ধা ও বীর। কিন্তু শিবজীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তার মৃত্যু এইটি রমেশচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। চন্দ্ররাও চরিত্রটির মধ্যে ঐতিহাসিক অনুগতি রেখেও রমেশচন্দ্র অন্য উপায়ে তার প্রয়োজন সাধন করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত দেখতে পাই চন্দ্ররাওকে হত্যা করে রঘুনাথ নামে শিবজীর এক অনুচর। উপন্যাসেও চন্দ্ররাওয়ের মৃত্যুর গৌণ কারণ রঘুনাথ হাবিলদার। রঘুনাথের সঙ্গে চন্দ্ররাওয়ের সম্বন্ধটি স্থাপন করে লেখক চন্দ্ররাওয়ের চরিত্রের মধ্যে কেবল ভিলেন রূপটিকেই প্রকটিত করেন নি মনুষ্যত্বও আরোপ করেছেন। চন্দ্ররাও লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বামী। লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি ভালোবাসা তার রাজনৈতিক জীবনের জটিলতার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয়। ক্রমাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে সে যখন কপটতার আশ্রয় নেয় তখনও লক্ষ্মীবাঈকে সে প্রতারণা করে নি। এইটি চন্দ্ররাওয়ের জীবনের মহত্ত্বের দিক। আর রাজনৈতিক দাবাখেলায় এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কপটতার স্থান যে একেবারে নেই তাও অস্বীকার করা যায় না। চন্দ্ররাওয়ের প্রতি লেখকের যে সহানুভূতি ছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ পাই লক্ষ্মীবাঈয়ের সহমরণ দৃশ্যটিতে। ভ্রাতা রঘুনাথের স্নেহ, ব্যাকুলতা, নিষেধ সবকিছুকে উপেক্ষা করে লক্ষ্মীবাঈ চন্দ্ররাওয়ের অনুমৃতা হয়েছে। লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ এবং সমবেদনা অধিক। সুতরাং এক দিকে ইতিহাসের অনুগতি অন্য দিকে লেখকের কল্পনাপ্রবণতা চরিত্রনির্মাণে সহায়তা করেছে।

শিবজীর পলায়নের দৃশ্য-বর্ণনায় লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক অপমানিত হয়ে বন্দী শিবজী রাজধানীতে আশ্রয় পেলেন। তাঁর পলায়ন-কাহিনী ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। রমেশচন্দ্র পলায়ন-কাহিনীটির মধ্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করবার জন্যে যে নূতন ঘটনাটি যোজনা

করেছেন তা তার রচনাকর্মের নৈপুণ্য প্রকাশ করে। ঘটনাটি যোজনার মধ্যে লেখকের গল্পরস পরিবেশন করবার ক্ষমতার চিহ্ন বর্তমান।' শিবজী পথে মোগল সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হলে রঘুনাথ হাবিলদারের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটনাটির মধ্যে রোমান্সের দীপ্তি এনে দিয়েছে। অথচ কোনো অলৌকিকতার দ্বারা এই অতর্কিত দৃশ্যটি অতিপ্রাকৃতের স্তরে উন্নীত হয় নি। রাজপুত জাতির বিশ্বস্ততা এবং আত্মমর্যাদাবোধ এই দুই-ই যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে রঘুনাথের চরিত্রে।

গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্র অনৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে শিবজীর চরিত্র মুখ্যতম। ডফ শিবজী সম্বন্ধে বলেছেন—

To form an estimate of his character, let us consider him assembling and conducting a band of half-naked mawulees through the wild tracts where he first established himself, unmindful of obstruction from the elements, turning the most inclement seasons to advantages, and inspiring the minds of such followers with undaunted enthusiasm. Let us also observe the singular plans of policy he commenced, and which we must admit to have been altogether novel, and most fit for acquiring power at such a period. **For a popular leader his frugality was a remarkable feature in his character,*' Shivajee was patient and deliberate in his plans ; ardent, resolute, and persevering in their execution

এর পর ডফ শিবজী চরিত্রের কয়েকটি কলঙ্কের দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা শিবজী চরিত্রের অন্যতম দিক। অপর পক্ষে যেখানে কেবল ক্ষমতার দ্বারাই জয়লাভ নিশ্চিত সেখানেও শিবজী কপটতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। এর পরে ডফের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

Let us contrast his craft, pliancy, and humility with his boldness, firmness, and ambition ; his power of inspiring enthusiasm while he showed the coolest attention to his own interests ; the dash of a partizan adventurer, with the order and economy of statesman ; and lastly, the wisdom of his plans which raised the despaired Hindoos to sovereignty, and brought about their own accomplishment when the hand that had formed them was low in the dust.

শেষের উক্তিটি লক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র একেই বড়ো করে দেখেছেন। হয়তো শিবজীকে নিয়ে কাহিনী গড়ার স্বপ্ন এই উক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল। ডফ শিবজী চরিত্রের যে ত্রুটি লক্ষ করেছেন সেগুলি আসলে রাজনৈতিক

দূরদর্শিতারই পরিচয়। রাজনীতি নিস্তরঙ্গ বস্তু নয়। বঙ্কিমপথগামী বলেই রাজনীতির চোরাবালিতে মুহূর্তের ভ্রম জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে। শিবজী রাজনীতি-বিচক্ষণ ছিলেন। সুতরাং প্রয়োজনবোধে কপটতার আশ্রয় নিতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। বিশেষত আফজল খাঁর কাহিনী মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে অনুল্লিখিত। হয়তো রমেশচন্দ্র ডফকে অনুসরণ করেছিলেন বলেই আফজল খাঁ কাহিনীটি নিয়ে বিব্রত বোধ করেছিলেন। তখনকার ইতিহাসচর্চায় কি নিরাসক্ত দৃষ্টির অভাব ছিল বলেই শিবজীর এই আচরণকে ডফ এত বাড়িয়ে দেখেছিলেন? যাই হোক গ্রন্থের মধ্যে জয়সিংহ-শিবজীর যে কথোপকথন দেখতে পাই তা রমেশচন্দ্রের মৌলিক উদ্‌ভাবন-শক্তির পরিচয় দেয়। ইতিহাসে জয়সিংহের সঙ্গে শিবজীর যুদ্ধবর্ণনাও কম মর্যাদা পায় নি। জয়সিংহের সঙ্গে শিবজীর বন্ধুত্বও নিতান্ত রাজনৈতিক। আধুনিক কালের ইতিহাসলেখকও তাই বলেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র এই বন্ধুত্বের মধ্যে এক নবতর ইঙ্গিতের সন্ধান পেয়েছেন। পূর্বে বলেছি রাজপুত জাতির জীবনসন্ধ্যার পর মারাঠার অরুণোদয় শিবজীর মধ্য দিয়ে ঘটল। লেখক একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানেন নি। আওরঙ্গজেবের সংশয়প্রবণতার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল না ফলে বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। জয়সিংহের প্রতি সম্রাটের আচরণ প্রশংসনীয় ছিল না। মৃত্যুর প্রাক্‌কালে জয়সিংহ তা বুঝতেও পেরেছিলেন। আজীবন বিশ্বস্ততার প্রতিদানস্বরূপ তিনি যখন আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে কেবল অবজ্ঞাই পেলেন তখন তাঁর চৈতন্যোদয় হল। জয়সিংহ মৃত্যুকালে সেই সত্যটি উপলব্ধি করলেন। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের থেকে এই ইঙ্গিত পান নি। এটি তাঁর কল্পনাপ্রসূত। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে মৃত্যুশয্যায় শায়িত জয়সিংহের সঙ্গে শিবজীর রাখীবন্ধন স্থাপিত হল। শিবজীর জীবনে এটি চরমতম মুহূর্ত। উপন্যাসটিও এর কয়েক অধ্যায় পরে শেষ হয়েছে। বস্তুত শিবজীর ভবিষ্যৎ জীবনের বীজটি এই দৃশ্যেই সংস্থাপিত। আওরঙ্গজেব অন্যায় আচরণের দ্বারা চারি দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেছেন।

> অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূ ধূ শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে মোগল-সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর, মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর!

শিবজী রাজপুতের আশীর্বাদ শিরোভূষণ করে বললেন—

পূর্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে সামান্য, প্রভাত নহে। মহারাষ্ট্রগণ! অদ্য আমাদের জীবনপ্রভাত
সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জিয়া উঠিল, অদ্য আমাদের জীবনপ্রভাত।

এ থেকে লেখকের আসল অভিপ্রায়টি বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। (রমেশ-চন্দ্রের উপন্যাস-রচনার পশ্চাতে স্কটের প্রেরণা থাকলেও স্কটপ্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন নি। কেননা রমেশচন্দ্রের রচনায় ইতিহাসের ঘটনা অনুগতি ও কালানুক্রমের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর নেই। ইতিহাসের সত্যকে তিনি বরাবর মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। এই কারণে তিনি বিপুল তথ্যরাশির মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট করেন নি। শিবজীর ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য থেকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিক বেছে নিয়েছেন। নূতন সংযোজনা হিসেবে রঘুনাথ হাবিলদারের কাহিনীটি অন্যতম। ভবানী দেবীর কথাটিও ইতিহাসে উক্ত। ভূদেব যেখানে রামদাস স্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন রমেশচন্দ্র সেখানে সরযুবালার পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অন্যান্য আর যে-সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলি ঐতিহাসিক। শিবজীর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ, যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ, জয়সিংহের নিকট নতি স্বীকার, আগ্রায় গমন এ-সবই ঐতিহাসিক। শিবজীর চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের সময়ে। শিবজী অসমসাহসী যোদ্ধা আবার রণনীতিকুশল। শায়েস্তা খাঁর দুর্গ আক্রমণ করবার পূর্বে ছদ্মবেশে শিবজীর সমস্ত পুণা নগরী ভ্রমণ এবং গোপনে যুদ্ধসজ্জা ইতিহাসে লেখে না। রমেশচন্দ্র এই ঘটনাটি দ্বারা শিবজীর জীবনে নূতন আলোকপাত করেছেন। শিবজী যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মারাঠা প্রধানদের নিষেধ মানলেন না। নিজে রণক্ষেত্রে সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। শিবজীর মাতৃভক্তি এবং স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা দেশচিন্তার মহৎ দিকটি তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। রঘুনাথ হাবিলদারের অসমসাহসিকতায় শিবজী যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। হাবিলদারের এই বীরোচিত কার্যের জন্য শিবজীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করে জয়লাভ করবার পর চন্দ্ররাওয়ের অভিযোগে শিবজী বিচলিত হলেন। রঘুনাথ যখন যশের চরমতম শিখরে, তার বহুদিনের সঞ্চিত স্বপ্ন যখন সাফল্যের পথে তখন বজ্রাঘাতের মতো শিবজীর ন্যায়দণ্ড এল। শিবজী চরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিবজী প্রাকটিক্যাল রাজনীতিবিদ।

অধিকাংশ লেখকই কর্মযোগী। উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত পরিকল্পনা লেখকবৃন্দের কল্পনাপ্রসূত নয় এর পশ্চাতে সামাজিক উত্থানের প্রবলতর বেগটিকে লক্ষ করা উচিত। রমেশচন্দ্রও এই প্রবাহের পথ অনুসরণ করেছেন। তিনিও আদর্শ বীরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিবজীর মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে, বৈদিক সভ্যতার অরুণোদয় ঘটবে, স্বাধীনতার মর্মবাণীটি ধ্বনিত হবে এইটিই লেখকের কাম্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ মারাঠাদের পতনের কারণ সুন্দররূপে বুঝিয়েছেন। শিবজী বিভেদ-মূলক ধর্মসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারেন নি।

> ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, সেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলি বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া, এমন-কি, সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরও সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি হয়তো রমেশচন্দ্রের ছিল না। থাকলেও শিবজী চরিত্র-অঙ্কনে এ বিরোধকে বড়ো করে দেখাবার সুযোগ তখন ছিল না। কেননা শিবজীর চরিত্রে যুগের আনুগত্য রক্ষা করা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ দৃষ্টি নির্মোহ নয় তবে অবহেলার বস্তু নয়। স্বপ্নসম্ভাবনা বাস্তবাতিরিক্ত তো বটেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভূদেব, রমেশ ইত্যাদি লেখকবৃন্দ নিছক সাহিত্যপ্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে গ্রন্থ রচনা করেন নি। গ্রন্থগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতা সুস্পষ্ট।

যশোবন্ত সিংহ-জয়সিংহের চরিত্র রাজপুত জাতির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যটিকে চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে। যশোবন্ত সিংহের পরিচয় পেয়েছি মাধবীকঙ্কণে। সেই কারণে এই উপন্যাসে তাঁর স্থান স্বল্প। জয়সিংহের চরিত্রটিতে মোটামুটিভাবে ইতিহাসের অনুগতি পাই। ডফ জয়সিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন নি। করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। ডফের ইতিহাসে জয়সিংহের আচার আচরণের মধ্যে আমরা রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্যটি দেখেছি। শিবজীকে করায়ত্ত করবার পর দিলীর খাঁর নিকট তাঁকে প্রেরণ করার মধ্যে জয়সিংহের রণনীতিকুশলতার পরিচয়। রমেশচন্দ্র জয়সিংহের চরিত্রটির আদর্শ পেয়েছেন টডের রাজস্থান থেকে। দিলীর খাঁর প্রসঙ্গ 'জীবন-প্রভাতে' অনুপস্থিত। জয়সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর গজপতির সাক্ষাৎ

পাই মাধবীকঙ্কণে। গজপতির প্রাণদান জয়সিংহের শিক্ষার ফল। রঘুনাথ হাবিলদার জয়সিংহেরই প্রতিরূপ। জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের উপযুক্ত সেনাপতি। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রামসিংহের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও আওরঙ্গজেব জয়সিংহের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠান নি, জয়সিংহের প্রতিশ্রুতিমত আওরঙ্গজেব শিবজীর উপর সুবিচার করেন নি। তথাপি জয়সিংহের ক্ষোভের মধ্য দিয়েও বার বার বিশ্বস্ততার সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। যশোবন্ত সিংহ যেখানে রাজনীতির চোরাবালিতে বাঁধ বাঁধবার স্বপ্নে বিভোর সেখানে জয়সিংহ দূরদর্শিতার দ্বারা নিজের স্বরূপকে উজ্জ্বল করেছেন। জয়সিংহ মৃত্যুকালেও শিবজীকে আশীর্বাদ করে গেছেন। প্রকৃত রাজপুতের ঔদার্য এবং ক্ষমাগুণ তৎসঙ্গে যোদ্ধার বীরত্ব জয়সিংহের মধ্যে এসে মিলেছিল। রমেশচন্দ্রের পক্ষে এ চরিত্রের কল্পনায় রং চড়ানো সম্ভব ছিল না। টড যেমনভাবে এঁকেছেন তিনিও তাঁকে সেইভাবে প্রকাশ করেছেন। শিবজীর প্রসঙ্গের বিস্তৃতির জন্য জয়সিংহের স্থান সংকুচিত হলেও আমাদের মনে তার প্রভাব চিরস্থায়ী। সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক একটি প্রেমোপাখ্যান মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে স্থান পেয়েছে। রঘুনাথ হাবিলদার ও সরযুবালার প্রেমদৃশ্যটি ইতিহাসের রাজপথ অনুসরণ করে নি। এই প্রেমদৃশ্যের সার্থকতাও বেশি নেই। তবে রাজপুত রমণীর প্রেমের একাগ্রতা, অবিচল নিষ্ঠা সরযুবালার মধ্যে দেখা যায়। ইতিহাসের ঘটনাবলীই তাদের জীবনে বেদনার সঞ্চার করেছে, পরিশেষে মিলনের সরল পথে ঘটনাটির পরিসমাপ্তি। সরযুবালার প্রেমে আবেগ লক্ষ্যগোচর হয়।

আওরঙ্গজেবের ভূমিকাও সুপরিস্ফুট। মাধবীকঙ্কণে এবং মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রমেশচন্দ্র আওরঙ্গজেবের ছলনা, ক্রূরতা কুটিলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে ইতিহাসের অনুগতি আছে পূর্ণমাত্রায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে স্বদেশীপ্রেরণা ছিল। রমেশচন্দ্র নিজে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় সে কথা বলেছেন। আনন্দমঠের আদর্শে রচিত রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসে সেই স্বদেশী-প্রেরণার বীজ দেখতে পাই।

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রমেশচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাব-মুক্ত। পূর্বের উপন্যাস দুটিতে পরিচ্ছেদের কপালটুকি উদ্ধৃতি ছিল ইংরেজ কবির কবিতাংশ। এ উপন্যাসে পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হয়েছে বাঙালি কবির

রচনা। বাংলার কবির মনোভাবের সঙ্গে শিবজীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের নিশ্চয়ই একটা সাদৃশ্য অনুভব করেছিলেন রমেশচন্দ্র।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রমেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বলেছেন এই ভাবে—

> পাঠক! (একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের এইটি ধ্রুবপদ। বীরপ্রসূ রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে, মহারাষ্ট্রের উত্থান-প্রসঙ্গ কেন্দ্র করে কাহিনী রচনা করার সার্থকতা এখানে।) প্রসঙ্গটি একটু লক্ষ করবার মতো। (প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক ভূদেব কেবল নীতিকথা প্রচারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ প্রচার করেছিলেন। ইতিহাসের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা তিনি অন্যপ্রসঙ্গে বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিজ্ঞানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাহিত্যের লক্ষের একটা মিল দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য নীতিজ্ঞান প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় এ বোধও তাঁর ছিল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টিস্ট সত্তা এই নীতিজ্ঞানকে যথাসম্ভব অন্তঃশীলা করবার চেষ্টায় রত। রমেশচন্দ্রও সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী। কিন্তু তাঁর রচনায় নীতিপ্রচার কিছুটা অতর্কিত, কিছু পরিমাণে অবারিত। এই কারণে উপন্যাসগুলির মধ্যে বার বার একই প্রসঙ্গের অবতারণায় পাঠক ক্লান্তি বোধ করে। বঙ্গবিজেতা থেকে 'জীবন-সন্ধ্যা' পর্যন্ত রাজপুত ঐশ্বর্যের স্মরণীয় দিকটিকে প্রোজ্জ্বল করবার বাসনা লেখকের মধ্যে প্রবল। এ প্রবলতা অনেক সময়ে সাহিত্যের ঔচিত্যবোধকে নষ্ট করে দিয়েছে।) মাধবীকঙ্কণে, ('জীবন-প্রভাতে', 'জীবন-সন্ধ্যায়' চারণের গীতগুলি একঘেয়েমি দোষে পাঠকের মনকে পীড়িত করে। চারণের গীতগুলি উচ্চভাবপূর্ণ, আবেদনের নিবিড়তায় এবং গভীরতায় মর্মস্পর্শী সন্দেহ নেই কিন্তু বৈচিত্র্যের অভাবে সাড়া জাগাতে পারে না। এমন-কি টডের বৃহদায়তন রাজস্থান গ্রন্থে রাজপুতজাতির গৌরবগাথাগুলি একই খাতে প্রবাহিত। সেই জহরব্রত, সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই রাজপুত-মোগল-

বিরোধ। সুখপাঠ্য হলেও মানবজীবনের বিভিন্নমুখী লীলাবৈচিত্র্য টডের রাজস্থানে নিতান্তই কম। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে একই বর্ণনার রোমন্থনের জন্য মনে হয় লেখক আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে বন্দী। মাঝে মাঝে দু-একটি সূক্ষ্ম ঘটনা কল্পনাবলে সৃষ্টি করলেও লেখকের ইতিহাসের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্য উপন্যাসের প্রাণধর্মকে বিচলিত করেছে। এই ত্রুটি 'জীবন-সন্ধ্যাতে' অতিমাত্রায় দেখা দিয়েছে।)

রমেশচন্দ্রের ত্রুটির কথা মনে রেখেও এ কথা বলা যায় যে 'জীবন-সন্ধ্যাতে' লেখক অন্যপ্রসঙ্গ অবতারণাতে কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। সেইটি হচ্ছে গৃহবিবাদ। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে লেখক রাজপুতজাতির দুর্বলতার চিহ্নটিকেও ধরতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার ইঙ্গিতটিকেই উপন্যাসের মধ্যে পরিস্ফুট করেছেন। সম্ভবত তিনি এই গৃহবিবাদের বিষময় প্রক্রিয়া আধুনিক সমাজে জানাতে চেয়েছেন। কারণ দেশের কল্যাণচিন্তা রমেশচন্দ্রের আজীবন সাধনা, দশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টার লক্ষ্য।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা বার হল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। বঙ্গবিজেতায় টোডরমল্লের কাহিনী অনুসৃত কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে সুরেন্দ্রনাথের বীরত্ব; মাধবীকঙ্কণে যশোবন্ত সিংহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত তথাপি মূল আকর্ষণ নরেন্দ্রনাথ-হেমলতা প্রসঙ্গ; 'জীবন-প্রভাতে' শিবজীই কেন্দ্রীয় এবং নায়ক চরিত্র। সুতরাং রাজপুত-কাহিনী রমেশচন্দ্র এখনও লেখেন নি। অথচ তাঁর মতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত রাজপুত বীরত্ব নিয়ে। 'জীবন-সন্ধ্যাতে' রমেশচন্দ্র সে চেষ্টায় ব্রতী হলেন। ঐতিহাসিক উৎস তিনি নিজেই গ্রন্থশেষে দিয়েছেন। রাণা প্রতাপ সম্বন্ধে টডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষণীয়। তিনি হলদীঘাটের যুদ্ধকে থার্মপলির যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। টড মনে করেন থুকিডিডেসের মতো ঐতিহাসিকের অভাবেই প্রতাপের কাহিনীটি কেবলমাত্র স্থানীয় ইতিবৃত্তে সীমাবদ্ধ, উপযুক্ত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটলে রাজপুত বীরের এই কাহিনীটি পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেতে পারত। টডের রাজস্থানে প্রতাপ-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। আকবর কৌশলে অনেক রাজপুতবীরকেই নিজের পক্ষভুক্ত করতে সমর্থ হন। মানসিংহ এঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্য দিকে প্রতাপের সাহায্যার্থে অন্যান্য রাজপুতবীররা মিলিত হন। রমেশচন্দ্র প্রতাপের বীরত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজপুত জাতির 'স্বামীধর্মে'র প্রশংসা

করেছেন এবং সম্ভবত তাঁর উপন্যাসের অন্তর্নিহিত শিক্ষাটিও তাই। তা না হলে সমবেতভাবে রাজপুত জাতির 'স্বামীধর্মের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন দৃষ্টি রমেশচন্দ্র বিস্তৃতভাবে বলতেন না। দ্বিতীয়ত এ কথা পরিষ্কার যে প্রত্যেক চরিত্রের বীরত্বের উৎসও এই 'স্বামীধর্মের আনুগত্যের মধ্যে। এমন-কি কৃচ্ছ্রসাধনা, লাঞ্ছনাভোগও একই উৎস হতে উৎসারিত। উপন্যাসটির অপর একটি প্রসঙ্গ রাজপুত জাতির অন্তর্বিরোধ। তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহের কলহটি আসলে রাজপুত জাতির চিরন্তন বিরোধেরই জের। রমেশচন্দ্র উপন্যাসের একস্থানে জ্ঞাতিবিরোধের বিষময় ফল সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন।

> হায়! হায়! জ্ঞাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই। জ্ঞাতিবিরোধের জন্য অন্ত রাজপুতকুলতিলক মানসিংহ রাজপুতকুলতিলক প্রতাপসিংহের ভীষণ শত্রু!

এর পর রমেশচন্দ্র টডের রাজস্থান থেকে মানসিংহ-প্রতাপসিংহের কাহিনীটি সংকলন করেছেন। মানসিংহ মোগলদের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, মোগলের অন্নে বর্তমানে আশ্রিত। সুতরাং মানসিংহ এবং প্রতাপসিংহের একাসনে আহার নিষিদ্ধ। এ বিরোধের মূল উৎপাটিত হলে রাজপুত ইতিহাস হত অন্যরূপ। কিন্তু শ্রেণীগত কৌলীন্যের কাছে জাতীয় স্বার্থ পদদলিত। উপন্যাসে এই যেমন একটি দিক আছে অন্য দিকে টডের ইতিহাসে নেই এমন একটি উপকাহিনী যুক্ত করে জ্ঞাতিবিরোধ সত্ত্বেও প্রয়োজনবোধে রাজপুত যে ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কাছে বলি দিতে পারে তাও উল্লেখ করেছেন। তিলকসিংহের পুত্র তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহ পরস্পরের শত্রু। তেজসিংহ দুর্জয়সিংহের জন্যই মাতৃহারা, পর্বতবাসী, ভীলদের আশ্রিত। তাঁর অন্তরাগ্নি প্রতিশোধ-স্পৃহায় প্রজ্বলিত। তথাপি চারণীদেবীর আদেশে সাময়িক ভাবে বিরোধ ভুলে গিয়ে তিনি দেশের স্বার্থে আপনাকে নিয়োজিত করেছেন। সুতরাং এক দিকে শ্রেণীগত কৌলীন্যের মর্যাদা অন্য দিকে জাতিগত স্বার্থরক্ষা রাজপুত জাতির এ-দুটি বিশেষ লক্ষণের উপর রমেশচন্দ্র জোর দিয়েছেন।

প্রতাপের কাহিনীতে ঐতিহাসিক বিচ্যুতি বিশেষ নেই। একটি জায়গায় রমেশচন্দ্র মূল সত্যের থেকে সরে এসেছেন। এ রূপান্তর সম্ভাবিত ঘটনার দিক থেকে সুন্দর। টডের রাজস্থানে আছে রাত্রিতে পর্বতকন্দরে কন্যার ক্রন্দন দেখে প্রতাপের ধিক্কার আসে। আজীবন যুদ্ধ করেও

তিনি পরিবারের সুখ শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। এই কারণে আকবরের নিকট সন্ধিভিক্ষা করেন। উপন্যাসে রমেশচন্দ্র কাহিনীটির মধ্যে উচ্চভাবপূর্ণ ঘটনার আরোপ করেছেন। দেবীসিংহের পুত্রের মৃত্যুর মধ্যেই প্রতাপ নিজের ব্যর্থতা অনুভব করেন। আবার প্রতাপকে রমেশচন্দ্র কেবলমাত্র তাঁর আদর্শবাদের যন্ত্ররূপেই ব্যবহার করেন নি। তা হলে মানসিংহ প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত থাকতে পারত। বৈরীভাব রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য। প্রতাপও তার থেকে মুক্ত নন।

দীর্ঘ দুশো বছর নিশ্চিহ্ন পদক্ষেপে চলে যাবার পরে নূতন করে জাতীয় চেতনাসমৃদ্ধ ইতিহাসের সূচনা ঘটেছে। এই নবজাগ্রত জাতীয়তা-বোধকে ধরবার জন্যই তিনি উপন্যাস প্রণয়ন করেছেন। রাজপুত জাতির উদাহরণ তাই প্রয়োজন। রাজপুত জাতির শক্তির রন্ধ্রপথে দুষ্টগ্রহ প্রবেশ করেছিল। পূর্বে এ বিষয়ের আলোচনা করেছি। তেজসিংহ দুর্জয়সিংহ কাহিনীটিকে রমেশচন্দ্র এরই জন্যে এত গুরুত্ব দিয়ে, এত বিস্তৃত ভাবে পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। তেজসিংহ যখন তার ভালোবাসার ধনটিকেও হারালেন তখন আর জীবনের প্রতি কোনো মায়া, কোনো মমতা থাকল না। তাঁর জীবনে এইটি হল চরমতম মুহূর্ত। দুর্জয়সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার এইটি উপযুক্ত সময়। ভীল, রাঠোর সৈন্য নিয়ে দুর্জয়সিংহের বিরুদ্ধে তিনি যাত্রা করলেন। ভীষণ সমরে দুর্জয়সিংহ পরাজয় বরণ করলেন। তেজসিংহ বহু সৈন্যক্ষয় করে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। কিন্তু তেজসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বলেই কি বিজয়বার্তাটি পাঠকমনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় তেজসিংহের বিজয়বার্তার মধ্যে শোকের আর্তধ্বনিটিও করুণ, নিবিড়। বিষাদের যবনিকা সেই মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত হল। রাজপুত ইতিহাসের বীরত্বগরিমার পশ্চাতে ভবিষ্যৎপতনের সুরটি নিহিত হল।

> মহাকোলাহলে মেদিনী ও আকাশ কম্পিত হইল, রাঠোর সৈন্য অষ্টাদশ বর্ষ পরে সূর্যমহলে প্রবেশ করিল।

রাঠোর ও চন্দাওয়াৎ কুলের শৌর্যবীর্য বর্ণনা করা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র এই যুগকে কেন যে বন্ধ্যা বলেছেন তার কারণ সম্ভবত এখানে। ঐতিহাসিকের নির্মোহ দৃষ্টি রমেশচন্দ্রের ছিল। এই কারণে রাজপুত-ইতিহাসকে তিনি নিজের দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ

হয়ে তিনি গ্রন্থরচনা করেন নি। আমাদের দুর্বলতা-প্রদর্শনও তাঁর গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবল স্রোতের মুখে ক্ষীণ। দ্বন্দ্বসংঘাতের বিশেষ পরিচয়ও নেই। ভীলবালিকার পত্রটি গভীর প্রাণাবেগে স্পন্দিত। তার প্রেমের অভিব্যক্তি কোথাও মাত্রাতিরিক্ত নয়, রমেশচন্দ্র এই প্রেমকে বিকশিত করবার সুযোগ দেন নি। এর জন্য রমেশচন্দ্রকে বিশেষ দায়ীও করা চলে না।

নারীচরিত্রের মধ্যে পাচ্ছি পুষ্পকুমারী, ভীল বালিকা, রাণা প্রতাপ-সিংহের মহিষী। টডের রাজস্থানে রাজপুত রমণীর প্রসঙ্গ নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। তবে ইতিহাসে প্রতাপসিংহের মহিষীর বিশেষ পরিচয় নেই। রমেশচন্দ্র কল্পনাবলে এই চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন। এর মধ্যে আদর্শবাদের ছাপই সুস্পষ্ট। তেজসিংহ কর্তৃক উদ্ধার পেয়ে রানী পর্বত-কন্দরে আশ্রয় পেলেন। সেখানে পুষ্পকুমারীও ছিল। চারণীদেবীর অনুরোধে রানী কতকটা আশ্বস্ত হলেন। চারণীদেবীর রানীকে আশ্বাস দান এবং তেজসিংহের বীরত্বকথনের সময় পুষ্পকুমারীর উদ্বেলিত হৃদয় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ তখনও বার হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে স্পষ্টত ব্রিটানিয়া দেবীর আবির্ভাবকে ঘোষণা করেছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম নেই। মহারানী চারণীদেবীকে প্রশ্ন করলেন—'তুর্কীর বিজয়, না শিশোদীয় বিজয়'? উত্তরে চারণীদেবী বললেন—

> মহারাজ্ঞি! আমার বয়স অধিক হইয়াছে, নয়ন ক্ষীণ; ভবিষ্যৎ আকাশ যতদূর দেখিতে পাই, মেওয়ার তমসাচ্ছন্ন, রাশীকৃত মেঘের পর রাশীকৃত মেঘ; অন্ধকারের পর নিবিড় অন্ধকার। রাজপুত বহুদিন তুর্কীর সহিত যুঝিতেছে; তৎপর রাজপুত দক্ষিণবাসী হিন্দুর সহিত যুঝিতেছে; তাহার পর এ কি! মহাসমুদ্র হইতে শ্বেত তরঙ্গের উপর শ্বেত তরঙ্গ আসিয়া মেওয়ার ও সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতেছে। এ কি প্রলয় উপস্থিত! বৃদ্ধার নয়ন ক্ষীণ, আর দেখিতে পায় না।

এ ভবিষ্যৎবাণী কোনো চমকের সৃষ্টি করে না। কিন্তু লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে কথা বলতে চেয়েছেন তার পূর্বাভাস এখানে পাচ্ছি। শ্বেত তরঙ্গ বলতে যে ইংরেজদের কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তবে উক্তিটিকে অন্য দিক থেকে বিচার করলে রমেশচন্দ্রের মানসপ্রকৃতি বোঝবার সুবিধা। বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায়ও বটে রমেশচন্দ্রের

ক্ষেত্রেও ইংরেজ শাসনকে কখনও কুনজরে দেখা সম্ভব ছিল না। বরং এই দুই চিন্তানায়কের এ বিষয়ে অনুকূল মনোভাবের পরিচয় পাই। তাঁদের দৃষ্টিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া বাতুলতা। কেননা যথার্থ প্রগতিশীলতা বলতে উনবিংশ শতাব্দীতে নিশ্চয়ই ইংরেজ-বিরোধিতাই একমাত্র লক্ষণ ছিল না। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা যে নূতনের বাণী নিয়ে এসেছিল তাকে স্বীকরণের মধ্যেই জাতির উন্নতি নিহিত—এই ধারণাই চিন্তানায়কেরা পোষণ করতেন। রমেশচন্দ্র যে অন্ধভাবে ইংরেজশাসনের স্তবস্তুতি করেন নি তার পরিচয় তাঁর অন্যান্য অভিভাষণে, লেখায় পেয়েছি। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। শুধু এইটি মনে রাখা কর্তব্য যে রমেশচন্দ্র ইংরেজের শাসনকে বোঝা মনে করেন নি, যথার্থ উন্নতির সোপান মনে করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেছেন—

> It may be England's high privilege to restore to an ancient nation a new and healthy life. * * if the science and learning, the sympathy and example of modern Europe help us to regain in some measure a national conciousness and life, Europe will have rendered back to modern India that kindly help and sisterly service which India rendered to Europe in ancient days—in religion, and in civilisation.

সুতরাং রমেশচন্দ্র যখন চারণীদেবীর ভবিষ্যৎবাণী উপস্থিত করেন তখন বিস্মিত হবার কিছু নেই।

'জীবন-সন্ধ্যার' কাহিনীর দুর্বলতার কথা আগে বলেছি। রমেশচন্দ্রের জীবনীকার J. N. Gupta তাঁর *Life And Work Of Ramesh Chunder Dutt* গ্রন্থে বলেছেন—

> Mr Dutt's novels though they abound in stirring scenes, moving interests, and fully developed dramatic situations, yet fail to take rank as works of art because of their lack of organic fusion.

এ কথা ঠিক প্লট-নির্মাণে রমেশচন্দ্র পারিপাট্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। 'জীবন-সন্ধ্যাতে' lack of organic fusion আরও বেশি। কতগুলি খণ্ড চিত্র এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাণা প্রতাপসিংহের যেটুকু পরিচয় পাই তার মধ্যে কেবল কতগুলি যুদ্ধচিত্র, আর দারিদ্র্যের বর্ণনা প্রধান। চরিত্রটির উপরে রমেশচন্দ্রের সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু অতিকথনে তা বাষ্পাকুল। খানখানানের বর্ণনায় (টডের রাজস্থানে এর উল্লেখ আছে) এবং অন্যান্য রাজপুত চরিত্রের সপ্রশংস দৃষ্টির সাহায্যে প্রতাপ চিত্রিত। এতে নাটকীয়-

তার ন্যূনতম অবকাশও ছিল না। রমেশচন্দ্র নিজে প্রতাপ সম্বন্ধে বলেছেন—

> প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা মনে হয়, মহাভারতের বীরাদগের কথা মনে পড়ে। প্রতাপসিংহ সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আকবরশাহের সহিত যুঝিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর পর্যন্ত দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবন দান করিলেন, স্বাধীনতা দান করেন নাই। প্রতাপসিংহের বীরত্বকথা উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর, কিন্তু উপন্যাস নহে।

উপন্যাস অপেক্ষা বিস্ময়কর চরিত্র প্রতাপসিংহের কাহিনী তাই দ্বন্দ্বমথিত নয়। একবার মাত্র তাঁকে ভাবাকুল করেছিল। সেইটিই তাঁর চরিত্রের আকর্ষণীয় বিষয়। সে যাই হোক গ্রন্থকার কাহিনীগুলির ঐক্যসাধন করতে পারেন নি। উপাদানের বহুলতা লেখকের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। ফলে আমরা কতগুলি বীরচরিত্রের মহৎভাব দেখতে পাই, যুদ্ধের বর্ণনা শুনি, ফিউডাল দ্বন্দ্ববিক্ষোভের চিত্তদীর্ণ আখ্যান পাই, পুষ্পকুমারীর গোপনপ্রদেশের চকিত আভাস লাভ করি কিন্তু গল্পের শরবৎ ঋজুগতি সেখানে অনুপস্থিত।

গল্পরসের ব্যাঘাত ঘটলেও এই উপন্যাসে যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি সত্যিই লেখকের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধ-বর্ণনাগুলি প্রধানত অস্ত্রের নামে সৈন্যবাহিনীর বর্ণনায় নীরস হয়। তা ছাড়া বাঙালির মন্থর জীবনে যুদ্ধ-বর্ণনার অবকাশই বা কোথায়? রমেশচন্দ্রের পক্ষে কৃতিত্বের কথা এই যে তিনি বাঙালির সেই কলঙ্ক অনেকখানি মোচন করেছেন। মধুসূদন যেমন প্রকৃত বীর-কাব্যের আদর্শে যুদ্ধের কোদণ্ড টঙ্কারকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন রমেশচন্দ্রও বিভিন্ন যুদ্ধ-বর্ণনায় পরিবেশ সৃষ্টির চমৎকারিত্বে এবং অস্ত্রের শিঞ্জিনীর মধ্যে মানবীয় ভাবাবেগের পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তেজসিংহ এবং দুর্জয়সিংহের যুদ্ধ-বর্ণনাটি এই দিক থেকে সার্থক। এ যুদ্ধের জন্য পাঠকের মনেও অদম্য আগ্রহ এবং ভয়কম্পিত হৃদয়ের দুরু দুরু ধ্বনি শোনা যায়। কেননা তেজসিংহের যুদ্ধের প্রস্তুতি, তাঁর হাহাকার, তাঁর প্রতিশোধ স্পৃহাকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যার ফলে যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে পাঠক পূর্বাহ্নেই একটা ধারণা করে নেয়। প্রকৃত যুদ্ধের জন্য সাগ্রহে পাঠক অপেক্ষা করে। রমেশচন্দ্রও যুদ্ধ-বর্ণনার ফাঁকে বীরদ্বয়ের উত্তাপ উত্তেজনাকে অনুভব করেছেন ও তা পাঠকের হৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন।

তা ছাড়া 'জীবন-সন্ধ্যাতে' রমেশচন্দ্র স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকেও প্রকাশিত করেছেন। তেজসিংহ ভীলদের আশ্রিত। ভীলদের পার্বত্যপ্রদেশের একটি সুন্দর চিত্র রমেশচন্দ্র অঙ্কন করেছেন। এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ঐতিহ্য, রাজপুতদের সঙ্গে ভীলদের সম্বন্ধনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। রাজপুত সৈন্যদের শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই না, কিন্তু দু-একটি স্থানে তারও স্বল্প আভাস আছে। পরিবেশ সৃষ্টি করতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রমেশচন্দ্র 'জীবন-সন্ধ্যাতে' রাজপুত জাতির পতনের কথা বিশেষ বলেন নি। তথাপি এর নাম দিয়েছেন 'জীবন-সন্ধ্যা'। কারণ বোধ হয় এই। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেবারের স্বাধীনতার জন্য অন্য কোনো যোদ্ধা আর এত শ্রম স্বীকার করেন নি। দ্বিতীয়ত জ্ঞাতিবিরোধ যার জন্য রমেশচন্দ্রকে আক্ষেপ করতে শুনি।

রমেশচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানতে পারি মারাঠাদের কাহিনী নিয়ে তিনি আর একটি উপন্যাস রচনা করবার বাসনা করেছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। আমাদের মনে হয় 'জীবন-প্রভাতে'র পর আর মহারাষ্ট্র-কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার সার্থকতা রমেশচন্দ্র দেখেন নি। কারণ তার বক্তব্য 'জীবন-প্রভাতে' সূত্রাকারে উল্লিখিত। রমেশচন্দ্র যে ভীল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্বন্ধনির্ণয় করেছেন সেইটি বিস্তৃত হয়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ গ্রন্থে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা থেকে 'বিদায়' নেবার সময় স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মর্মকথাটি বলেছেন। নবীন লেখকদের ভারতীর আসরে টেনে এনে তিনি ভারতীগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। ভারতীর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে নূতন করে পরিবেশন করা। দেশচর্চার এই ব্রত স্বর্ণকুমারী সযত্নে পালন করেছেন। উপন্যাস রচনায়ও তাঁর এই মনোভাব আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতীর প্রচ্ছদপটের অন্তর্নিহিত দ্যোতনাও এইটি।

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে রাজস্থানের ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাস স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত ইতিবৃত্তের মধ্যে তিনি নিজের কল্পনা সংযোগ করেছেন। উপন্যাসগুলিতে দুটি বস্তু প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথমত দেশমাতৃকার সেবা, দ্বিতীয়ত আদর্শ রাজার আচার আচরণে নিবৃত্তিপথের সাধনার কথা। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের সমাজের এই দুই শিক্ষাই স্বর্ণকুমারী সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক নন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচনায় যে ইতিহাস জ্ঞানের প্রয়োজন আছে এইটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে তিনি দীপনির্বাণের ভূমিকায় এবং মিবাররাজের সূচনায় ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণ সাহিত্যের পক্ষে হয়তো অপরিহার্য নয়। তথাপি স্কট আইভ্যানহোর ভূমিকায় যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন স্বর্ণকুমারীর আদর্শও তাই ছিল।

সাধারণত রাজপুত-কাহিনী যে-সমস্ত ঔপন্যাসিকদের বিষয়বস্তু হয়েছে সেখানে রাজপুত-মোগল দ্বন্দ্বই লেখকদের বর্ণনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর দীপনির্বাণ সেই সাধারণ ধারার অন্তর্গত। কিন্তু মিবাররাজ অথবা বিদ্রোহ উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী রাজপুত-ইতিহাসের অন্য একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সেইটি হচ্ছে রাজপুত-ভীল দ্বন্দ্ব। অক্ষম লেখকদের রচনায় রাজপুত-মোগল দ্বন্দ্ব সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হয়েছে সেজন্য সেই সমস্ত উপন্যাস বিশেষ সার্থকতা পায় নি। স্বর্ণকুমারী

রাজপুত-ভীল দ্বন্দ্বটিকে তার কাহিনীর উপজীব্য করাতে এই সঙ্কীর্ণতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। স্বদেশচর্চার বাণীটি রাজপুত ভীলের সংগ্রামের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ায় পাঠক তাকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অশ্রুমতী নাটকে ভীলদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী সেই বিষয়কে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে অপর একজন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করতে পারি। হরিসাধনবাবু বিরোধটি স্থাপন করেছেন মোগল পাঠান বৈরিতার মধ্যে। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা তাঁর উপন্যাস-গুলিতেও নেই।

স্বর্ণকুমারীর রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব পুরোমাত্রায়। সে কথা যথাস্থানে বলেছি। চরিত্রনির্মাণে এবং রচনারীতিতে তিনি ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে অল্প বয়সেই প্রমোশন পেয়ে ভারতীর আসরে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন সে কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংরেজি উপন্যাস তখন উৎসাহের সঙ্গে বাড়িতে পড়া হত। স্বর্ণকুমারী সে রস থেকে বঞ্চিত হন নি নিশ্চয়ই। সেই কারণে স্কটের উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য স্বর্ণকুমারীর লেখায়ও দেখা যায়।

দীপনির্বাণ

দীপনির্বাণ প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালে (১৪ ডিসেম্বর ১৮৭৬)। তখন রমেশচন্দ্রের বঙ্গবিজেতা বার হয়েছে। বঙ্গবিজেতায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের খাঁটি সুরটি মোটামুটি ধ্বনিত হয়েছিল। বঙ্কিমের মতো কল্পনাশক্তি না থাকলেও তথ্যনিষ্ঠা যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান এই সত্যটি রমেশচন্দ্র বুঝেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীও এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। দীপনির্বাণ রচনার সময় লেখিকার বয়স মাত্র একুশ। সুতরাং উপন্যাসটির মধ্যে প্রৌঢ় জীবনের অভিজ্ঞতা আশা করা অন্যায়। তবে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত উক্তি থেকে জানতে পারি ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিক পরিবেশ স্বর্ণকুমারীর উপর প্রভাব ফেলেছিল। এমন-কি এক সময়ে তিনি প্রমোশন পেয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্রের

সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনায় যোগ দিতেন। সুতরাং এই বইটিতে কেবল কাঁচা হাতের রচনার স্বাক্ষর রয়েছে এইটি বলা ঠিক নয়। রচনাকৌশল হয়তো তেমন উচ্চশ্রেণীর নয় কিন্তু তখনকার দিনের উপন্যাসের বিচারে এর যে একটি স্থান ছিল তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটির যে সমালোচনা বার হয়েছিল তাতে বুঝতে পারি সেকালের শিক্ষিত বাঙালির কাছে বইটি সমাদর পেয়েছিল।

দীপনির্বাণের উপর রমেশচন্দ্রের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেননা তখনও রমেশচন্দ্রের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা এবং মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত অপ্রকাশিত। অতএব যদি প্রভাবের প্রশ্ন উঠে তবে বঙ্গবিজেতার নাম করতে হয়। সে প্রভাব কেবল মাত্র দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে— বিষয়বস্তু কিংবা রচনাকৌশলে নয়।

আসল কথা যে সময়ে দীপনির্বাণ রচিত হয় সেই সময় বাংলাদেশে টডের রাজস্থান বহুল পরিচিত। সেই সময়ে কয়েকখানি নাটকও টডের রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত হয়েছে। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান তো বটেই। বঙ্কিম-চন্দ্রের রাজসিংহ তখনও বার হয় নি। স্বর্ণকুমারীও টডের রাজস্থান অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করলেন। দ্বিতীয়ত স্বর্ণকুমারীর জীবনে এই সময়ে বিপ্লবের কিংবা আন্দোলনের ঢেউ কতখানি পৌঁছেছিল জানি না কিন্তু হিন্দুমেলার আঁচ তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই। কিন্তু হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যপ্রেরণা জেগেছিল সে কথা তো আমরা সকলেই জানি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকেই জাতীয়তার সূত্রপাত। সেইটি দেখা দিয়েছিল প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায়। সুতরাং জাতীয়তার উদ্‌বোধনের একটি অঙ্গ ছিল প্রাচীন শৌর্যবীর্য-গাথা উদ্ধারে, তাদের নব পরিবেশনে। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে তাকেই নূতন করে অনুভব করা গেল। স্বর্ণকুমারী দেবী এ 'ন্যাশন্যাল' জোয়ারে নিজেকেও যুক্ত করেছিলেন। কর্মে কতটা জানি না কিন্তু চিন্তায় তিনি এঁদেরই সগোত্র। দীপনির্বাণ তার প্রমাণ। পরাধীনতার বেদনা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও স্পর্শ করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে গ্রন্থটি উপহার দিতে গিয়ে লেখিকা তাঁর অন্তরের বেদনাকে আমাদের গোচর করেছেন।

আর্য-অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার!
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত-ভানু ঘন মেঘজাল—
নিভেছে সোণার দীপ, ভেঙ্গেছে কপাল।

অতএব আর্য-অবনতি কাহিনী রচনা করা লেখিকার উদ্দেশ্য। এর মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ করাই লেখিকার কাম্য।

লেখিকার বিষয়বস্তু নির্বাচনে মৌলিকতার অবসর কম। তবে টড সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের যুক্ত অভিযানকে অভিনন্দিত করেছেন। টডের বর্ণনায় পাই—

What nation on earth would have maintained the semblance of civilisation, the spirit or the customs of their forefathers during so many centuries of overwhelming depression, but one of such singular character as the Rajpoot. Though ardent and reckless, he can, when required, subside into forbearance and apparent apathy, and reserve himself for the opportunity of revenge. Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind of a people withstanding every outrage barbarity can inflict, or human nature sustain, from a foe whose religion commands annihilation. Bent to the earth, he rises buoyant from the pressure, and makes calamity a whetstone to courage.

বিদেশীর এই শ্রদ্ধা তখনকার যুগে বিরলদৃষ্ট। স্বর্ণকুমারীকে টডের এই উক্তি প্রভাবিত করবার সম্ভাবনা।

গ্রন্থে উল্লিখিত সমরসিংহ, কিরণসিংহ, কল্যাণ, পৃথ্বীরাজ, চাঁদকবি (কবিচন্দ্র) ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সমরসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করেছেন টড। তখন হিন্দুদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদও পুরোমাত্রায়। বিদেশী আক্রমণেও জয়চন্দ্রের চৈতন্যোদয় হয় নি। কুলমর্যাদা এবং ঈর্ষা একে অপরের উন্নতির প্রতিবন্ধক ছিল। সমরসিংহের শৌর্যবীর্যের প্রসঙ্গ চাঁদকবির বর্ণনায় পেয়েছি। সমরসিংহ ছিলেন পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি। সেইটি দীপনির্বাণে অনুল্লিখিত। এর কারণ লেখিকা কিছু দেন নি। সম্ভবত আত্মীয়তার সূত্রে পৃথ্বীরাজকে সাহায্যদান একটি সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা। দেশমাতৃকার সেবার জন্যই যে সমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা এইটি দেখানোই স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্য ছিল। সমরসিংহকে আমরা গ্রন্থে কেবল রাজা রূপেই দেখি না তাকে যোগীন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

The style of address and the appeal of Samarsi betoken that he had not laid aside the office and ensigns of 'Regent of Mahadeva'. A simple necklace of the seeds of the lotus adorned his neck, his hair was braided, and he is addressed as Jogindra or Chief of ascetics.

এই তথ্যটি লক্ষ করবার মতো। যা ছিল কেবলমাত্র প্রশংসা ও শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন তার পশ্চাতে লেখিকা একটি গূঢ়ার্থ আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কিরণসিংহের জন্ম, তার নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ইত্যাদি কাহিনীর উদ্‌ঘাটনে যে নূতনত্ব সূচিত হয়েছে তার উৎস এই তথ্যটি। যোগীন্দ্রনাথের সার্থকতা স্বর্ণকুমারী যে ভাবে দেখেছেন তা বাস্তবানুগ। কল্যাণ-বিজয়-উষাবতী, কিরণ-শৈলবালা, চাঁদকবি-প্রভাবতী লেখিকার সংযোজন। গ্রন্থের মধ্যে আর যে সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ধারণ করেছেন লেখিকা উপক্রমণিকায় (এলিয়ট, এলফিনষ্টোন, জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদির গ্রন্থ-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখিকা তাঁর যুক্তিকে সমর্থন করেছেন)।

দীপনির্বাণ উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে এর মধ্যে ঘটনার ভিড় অত্যন্ত বেশি। একটার পর একটা ঘটনা সন্নিবেশ করে লেখিকা উপন্যাসের মধ্যে চমৎকারিত্ব আনতে চেয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ ঠিকমত করতে পারেন নি। এই মাত্রাবোধের অভাব থাকাতে উপন্যাসটির মধ্যে কাহিনীটি ঈষৎ শিথিলবিন্যস্ত— লক্ষচ্যুত। কিরণের কাহিনীর অতিবিস্তৃতি আমাদের আরও বেশি পীড়িত করে। কেননা গ্রন্থের মূল ঘটনার সঙ্গে তার যোগ খুবই ক্ষীণ। গ্রন্থের আরম্ভে মনে হয় কিরণই বুঝি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু দিল্লীদরবারে এসে স্বর্ণকুমারী দেবী বালক কিরণ এবং বালিকা শৈলবালাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। পৃথ্বীরাজের চরিত্র অঙ্কনেও লেখিকা বাককুণ্ঠ। এতে অবশ্য দোষের কিছু হত না যদি কল্যাণ-বিজয়-উষাবতীর দ্বন্দ্বকে একটা জটিল ঘটনাবর্তের মধ্যে ফেলে স্বর্ণকুমারী মানবজীবনের খাঁটি সুরটি ধ্বনিত করতে পারতেন। কল্যাণের প্রেমের তীক্ষ্নতা ও দুর্নিবার গতি অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই কেবল আমরা শুনি এবং তাও আরোপিত। অনেকটা বইয়ের জগতের প্রেম বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে মানবমনের যে সূক্ষ্ম জটিলতা বিশ্লেষণ করেছেন,

সেই জীবনকে এঁরা কেউ গ্রহণ করেন নি। মোটামুটিভাবে দুর্গেশনন্দিনীর প্রেমচিত্রই স্বর্ণকুমারী দেবীকেও আদর্শরূপে গ্রহণ করতে দেখি। উঁচুসুরে বাঁধা এই প্রেমবর্ণনা টাইপ-চরিত্রের আভাস দেয়। কল্যাণ যত সহজে উষাবতীর প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে এবং পুনরায় ফিরে পেয়েছে তা কেবলমাত্র এই জাতীয় উপন্যাসেই সম্ভব। অবশ্য মনোবিকলনের কৌতূহল ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেক সময়েই ইঙ্গিতে আভাসে, সাঙ্কেতিক সূত্রে ধরে বিবৃত হয়। এখানে সেই পরিচিত রূপটিরও একান্ত অভাব দেখা যায়। গোলাপও ঘটনা সংঘটিত করবার যন্ত্র মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা কেবলমাত্র দেবেন্দ্রের জন্যই কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু ঘটায় নি। সমস্ত ঘটনার পশ্চাতে তার নিজের ঈর্ষা-বিদ্বেষ এবং অন্তরাবেগের সুরটি দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু গোলাপের মধ্যে আমরা তেমন কিছু দেখতে পাই না। সে যত সহজে মিথ্যার আশ্রয় নেয় ঠিক তত সহজেই সত্যের কাছে এসে দাঁড়ায়। এইটি যে লেখিকার সম্পূর্ণ আরোপিত তা বুঝতে কষ্ট হয না।

গ্রন্থের মধ্যে আকস্মিক ঘটনার ছড়াছড়ি। ঐতিহাসিক উপন্যাসে আকস্মিকতার স্থান আছে। এবং ঘটনার বহুলতাও অনপেক্ষিত নয়। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির মধ্যে এমন একটি প্রত্যয় ধ্বনিত করা প্রয়োজন যার ফলে ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে পাঠকের বিচারবুদ্ধি সায় দিতে পারে। এই প্রত্যয়ের অভাবেই অনেক সময়ে রূপকথা এবং উপন্যাসের সীমারেখাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাগলিনীর মৃত্যু যদি সম্ভব তবে তিন বছরের শিশু কিরণের প্রাণরক্ষা কি করে সম্ভব হল? কিরণের ব্যাঘ্র শিকার, তেজসিংহের আকস্মিক আবির্ভাব এবং পলায়ন, কিরণ-শৈলবালা-প্রভাবতীর মিলন, বিজয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমস্তই আকস্মিক এবং আরোপিত। এই আকস্মিকতার পশ্চাতে বাস্তবতার ন্যূনতম দাবিও অস্বীকৃত হয়েছে। তবে এইসমস্ত ঘটনার মধ্যে শৈলবালা-প্রভাবতীর সখিত্বের বিবরণটি মনোরম। বঙ্গবিজেতায় সরলা এবং অমলার সখিত্বের সঙ্গে শৈলবালা-প্রভাবতীর সখিত্ব তুলনা করা যায়। দুটি নারীর চপলতা, ছদ্ম অভিমান, সখিত্বের আন্তরিকতা কয়েকটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের মধ্যে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের রাজকীয় সমারোহের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিতে এসেই পাঠক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পরিচিত বাস্তবতার স্পর্শ পেয়ে পাঠক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। উপন্যাসটির অন্যতম আকর্ষণও এই সখ্যরসে। তবে

প্রভাবতী-শৈলবালার ছদ্মবেশে পলায়নের মধ্যে একটা সুলভ রোমান্টিকতার লক্ষণ আছে।

দীপনির্বাণ উপন্যাসের এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও এর মহত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসটিতে লেখিকার স্বদেশপ্রেরণা আন্তরিকতার সুরে দীপ্যমান। আর তখনকার গল্পখোর পাঠকের জন্যে হয়তো এ জাতীয় সুলভ ঘটনার সৃষ্টির প্রয়োজনও ছিল। আরও একটি কথা। দীপনির্বাণে টডের রাজস্থানের কাহিনী থেকে বিশেষ বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও এর সমাদরের কারণ কি? মনে হয় তখনকার যুগে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠক যে-জাতীয় ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষা করত স্বর্ণকুমারী দেবী তা বুঝেছিলেন। পাঠক গল্প-উপন্যাসকে তলিয়ে বোঝবার অবকাশ পায় নি। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসের যে সমালোচনা বেরিয়েছিল তার প্রশংসা সবটুকুই ব্যয়িত হয়েছে স্বদেশী প্রেরণার মহনীয় দিকটির প্রতি লক্ষ রেখে। জাতির ইতিহাস জানবার আকাঙ্ক্ষা তখন এমনই প্রবল ছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে-কোনো কাহিনীকে পাঠক বরণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। আর্টের সূক্ষ্ম বিচার করবার অবসর তখন কম। লেখক-লেখিকারাও এজন্যে ইতিহাসের কোনো বিকৃতি না ঘটিয়ে কল্পনা জোগান না দিয়ে পরিচিত তথ্যকেই গল্পাকারে উপস্থাপিত করেছেন। দেখা যাবে যবন সৈন্যদের উপর লেখিকা সুবিচার করেন নি। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণটি কি তা জানা না থাকলেও লেখিকা সেই সূক্ষ্ম রাজনীতির মধ্যে যান নি। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য লেখিকার উপরে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু তখনকার পাঠকসমাজের কাছে লেখিকার বিবরণই ঐতিহাসিকের বিবরণের অপেক্ষা সঙ্গত এবং অনুকূল মনে হয়েছে। কেননা তাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের পুষ্টি-সাধন করেছে এইসমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বিধর্মী শত্রুর মধ্যে কোনো উন্নত গুণ থাকতে পারে এটা তারা আশা করেন নি। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে লেখিকা আসলে যুগের আনুগত্য স্বীকার করেছেন, যুগধর্মকে লঙ্ঘন করে অন্যতর চিন্তার আশ্রয় নেওয়া তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয় নি। কেবলমাত্র স্বদেশী প্রেরণাটিকেই যথাযথরূপে পরিবেশন করা লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল এবং সে পথে তিনি সাফল্যও পেয়েছিলেন। দীপনির্বাণ সম্বন্ধে এইটিই প্রশংসার বিষয়।

মিবাররাজ

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে মিবাররাজ বার হয়। স্বর্ণকুমারী যদিও মিবাররাজকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন তথাপি এটি একটি বড়ো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। উপন্যাসের জটিলতা, ঘটনার ভিড়, অন্তর্দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মতা এই বইটিতে নেই। দীপনির্বাণ রাজপুত-কাহিনী নিয়ে লিখিত। সেখানে রাজপুত জাতির নির্বাণের কাহিনী, মিবাররাজে রাজপুত জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস। গ্রন্থটিতে ভীল রাজপুত সম্বন্ধটিও সংক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। এর আগে রমেশচন্দ্রের 'জীবন-সন্ধ্যাতে' ভীল-রাজপুত সম্বন্ধটি চিত্রিত হয়েছিল অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ভীল-রাজপুত কাহিনী অন্যান্য বস্তুর মধ্যে একটি, মিবাররাজে সেইটিই প্রধান। টডের রাজস্থান কাহিনী লেখিকার অবলম্বন। গ্রন্থশেষে লেখিকা যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাও টড থেকে গৃহীত। বাপ্পা এবং গুহা যে পৃথক ব্যক্তি এবং মিবারের প্রথম শাসনকর্তা যে গুহা এইটিও লেখিকা তথ্যপ্রমাণের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। রাজপুত জাতির সঙ্গে ইরানীয়দের কোনো সম্বন্ধ নেই এইটিও লেখিকার সিদ্ধান্তের অন্যতম বিষয়। লেখিকার উক্তি থেকেই জানতে পারছি 'বান্ধব' পত্রিকায় গুহা এবং বাপ্পার জীবনের অনেক ঘটনার সাদৃশ্য দেখিয়ে উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি এইটি তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজের তথ্যের উপর নির্ভর করেই গল্প রচনা করেছেন। কাহিনীটি এই। ভীলরাজ মন্দালিকের স্নেহে মমতায় গুহা লালিত হয়েছিল। গুহার পরিচয় ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান বলে। গুহা দিদি সত্যবতীর কাছে নিজের পরিচয় জানতে পারলে। পরে মন্দালিকপুত্রের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে গুহা ভ্রমক্রমে মন্দালিককেই নিহত করলে। মন্দালিকপুত্র আত্মবিসর্জন করলে।

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভীলদের বর্ণনায়। অল্প কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে ভীলদের সরলতা, কর্তব্যজ্ঞান, প্রভুভক্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজপুত এবং ভীলদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ববিরোধ সেইটিও মোটামুটি সুঅঙ্কিত। ভীলদের সংলাপ-রচনায় লেখিকা যে বিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন সেইটি তাঁর গভীর বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয়। যদিও এ বিভাষা অনেকটা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের তথাপি এই ভাষা ব্যবহারের মধ্যে আদিম জাতির প্রাণস্পন্দনটি ধরা পড়েছে। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এই সংলাপ-বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে

অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর গোহা প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথের কবিত্বময় ভাষায় সে কাহিনী যে ইন্দ্রজাল রচনা করেছে স্বর্ণকুমারীর মধ্যে তা নেই সত্য কিন্তু তিনিও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে মন্দাকিনীপ্রবাহ বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর নিজস্ব লেখার গুণে।

কাহিনীর পরিসর ক্ষুদ্র। কিন্তু বাৎসল্যরস ও সখ্যরসের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা আন্তরিকতায় উজ্জ্বল, নিবিড় উপলব্ধিতে তা স্নিগ্ধশ্রী।

হুগলীর ইমামবাড়ী

হুগলীর ইমামবাড়ি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ৮ই জানুয়ারি ১৮৮৮ সালে। এর আগেই লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারীর বৈজ্ঞানিক পুস্তক গাথা ইত্যাদি এর আগেই বার হয়ে গেছে। মিবার-রাজের পর হুগলীর ইমামবাড়ি প্রকাশে আমরা লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গীর একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাই। এর পূর্বাভাস অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ছিল। অর্থাৎ নীতিপ্রবণতা স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। হুগলীর ইমামবাড়ি থেকেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে স্বর্ণকুমারী দেবী নরনারীর দ্বৈতলীলার মধ্যে, রাজনীতির চক্রান্তে, রাজ্যশাসনে শাস্ত্রপ্রদর্শিত নির্দেশ খুঁজে বেড়িয়েছেন। হুগলীর ইমামবাড়িতে এর আত্যন্তিক প্রকাশ।

গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে প্রমথনাথ মিত্রের মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে। তবে গ্রন্থকর্ত্রী প্রমথনাথ মিত্রকে আদ্যন্ত অনুসরণ করেন নি। কিংবদন্তী থেকে উক্ত গ্রন্থের বিপরীত মতবাদও পেয়েছিলেন। কিংবদন্তীকে সাক্ষ্য মেনে লেখিকা কাহিনীর জাল বুনেছেন।

গ্রন্থটি মসীনের জীবনী নয়, বরং তাঁর ধর্মবোধের কয়েকটি দিক মাত্র এখানে দেখানো হয়েছে। আসলে গ্রন্থের মূল বিষয় মুন্না-খান জাহান খাঁ-সলেউদ্দীনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মসীন এ-সকলের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র। ভগ্নীর কষ্টে সে ব্যথিত কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো ব্যাপারে সে লিপ্ত নয়।

মসীনের ভগ্নী মুন্না অবিবাহিত। পিতা মতাহার সেকালের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার একমাত্র কন্যা মুন্নাকে সৎপাত্রে দিতে চেয়েছেন।

অর্থের অনটন নেই সংসারে। সুখী পরিবারে যেমন হয় সেরকম মতাহারের আকাঙ্ক্ষা ছিল রূপে গুণে ধনে একটি সচ্চরিত্র যুবকের কাছে কন্যাকে সমর্পণ করা। অনেক নবাব মুন্নার পাণিপ্রার্থী হলেও মতাহার রাজী হন নি। অবশেষে তিনি পারস্যের রাজপুত্র সলেউদ্দীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। অতিসতর্কেরও ভুল হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। মতাহার যাকে সর্বাংশে গুণবান মনে করেছিলেন সে আসলে মদ্যপ। কেবলমাত্র বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করা সলেউদ্দীন পরমার্থ মনে করে। মুন্নার নিষেধ বাধা এ ক্ষেত্রে স্বামীকে ফেরাতে পারলে না। মোসাহেব-পরিবৃত সলেউদ্দীন স্ত্রীকে দাসীরূপেই বিবেচনা করে। মুন্না জীবনে কষ্ট পেলেও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না। মতাহার ভুলের জন্য অনুতাপ করেন। কিন্তু অনুতাপে তিনি সলেউদ্দীনকে ফেরাতে পারেন না। সলেউদ্দীনের এই স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পরিবারে অর্থকষ্ট দেখা দিলে মুন্না স্বামীর জন্যে অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত রইল। কিন্তু অর্থ ফুরিয়ে আসে, দারিদ্র্য দেখা দেয়, বিলাসব্যসন তখন প্রচণ্ড বিদ্রূপের মতো মনে হয়। সলেউদ্দীনের মোসাহেবরা মনিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নানা কুপরামর্শ দিতে থাকে। মসীন এ ব্যাপার দেখে। বাইরে অপরের দুঃখে সাহায্য করে। অভাবমোচনের চেষ্টা করে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয় কিন্তু অন্তঃপুরে সে একান্ত অসহায়। দুঃখের উৎপত্তি তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করে। সলেউদ্দীন এ অর্থকষ্ট সহ্য করতে পারলে না। সে নবাব-কন্যাকে বিবাহ করে চলে গেল। প্রচণ্ড দুঃখ সহ্য করেও মুন্না স্বামীকে আশ্রয় করেছিল। সলেউদ্দীন চলে যেতে সে সেই আশ্রয়ও হারালো। মুন্নারই দুঃখে ইতিপূর্বে পিতা মতাহার তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। মসীন ভগ্নীর দুঃখে বিচলিত হল। কিন্তু তার করবার কিছু নেই।

পলাশির যুদ্ধ তখন সমাপ্ত। মীরজাফর সিংহাসনে। এই সময়ে বাংলার আশা ভরসা সবই নির্বাপিত। ইংরেজ এবং নবাব উভয়েই নিজের স্বার্থসাধনে ব্যস্ত। উভয়ের প্রলোভনে নিরীহ প্রজাকুল সর্বস্বান্ত। বিচারের আশা তখন নেই। ফৌজদারও তার স্বেচ্ছাচারিতায় নিমগ্ন। বিধিবিধান শাসনশৃঙ্খলা রাজ্য থেকে নির্বাসিত। একটা আত্মবিলাপ ভিন্ন আর কিছু লক্ষ করা যায় না। খাঁ জাহান খাঁ এই সময়ে হুগলীতে প্রবল। তাঁর অত্যাচার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর দরবারে

বিচারের নামে প্রহসন। সেলাম আর সেলামীই রাজসম্মান লাভের একমাত্র উপায়। এই অবস্থায় প্রজাদের অসন্তোষ কি পরিমাণ তা সহজেই অনুমেয়। খাঁ জাহান খাঁ পূর্বেও মুন্নার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। অরক্ষিত মুন্নার চিত্তজয়ে খাঁ জাহান খাঁ সচেষ্ট হলেন। সকলের পরামর্শে তিনি মুন্নাকে বিবাহ করতে চাইলেন। কিন্তু মুন্না স্বামীকে হারিয়েও স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। খাঁ জাহান খাঁর অনুরোধ উপেক্ষিত হল। উপেক্ষা প্রত্যাখ্যান খাঁ জাহান খাঁকে উত্তেজিত করলে। সহজ পথ পরিত্যাগ করে এবারে তিনি বলের আশ্রয় নিলেন। মুন্নাকে অপহরণ করাই তাঁর উপযুক্ত মনে হল। মসীনের শুভাকাঙ্ক্ষী ভোলানাথের চেষ্টা সত্ত্বেও মুন্নাকে রক্ষা করা গেল না। মুন্নাকে রাজপরিবারে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার পথে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর চেষ্টায় দস্যুরা মুন্নাকে ফেলে ময়না দাসীকে রাজসমীপে উপস্থিত করলে। খাঁ জাহান খাঁ দেখে চমকিত হলেন। নিজের উদগ্র লালসার ভীষণ পরিণাম সন্ন্যাসীর কথায় বুঝতে পারলেন। মুন্না বিপদমুক্ত হয়ে নৌকা করে সলেউদ্দীনের কাছে গিয়ে স্বামীসেবার অনুমতি চাইলে। সলেউদ্দীনের কাছে মুন্নার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। প্রত্যাখ্যাত মুন্না হুগলীর ইমামবাড়িতে ফিরে এল। মসীন বহুপূর্বেই পিতার সংবাদের জন্যে করাচী গিয়েছিল। সেখানে পিতার সাক্ষাৎ পেলে। কিন্তু মতাহার তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুর পূর্বে একটি কবচ তিনি মুন্নার জন্য মসীনকে দিলেন। সে কবচ দানপত্র। এই অর্থে হুগলীতে পরে নানা জনহিতকর কার্য সংঘটিত হয়েছিল।

নানা ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জোবরা ছাড়িয়ে যে-কাহিনী আহৃত হল তার মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছু নেই। ইতিহাস-অনুমোদিত জীবনীগ্রন্থও হুগলীর ইমামবাড়ি নয়। গ্রন্থটিকে লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেছেন। সে দাবিও উপন্যাসটির ক্ষেত্রে যথাযথ মেনে নেওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা বলে সেই সময়ের বাংলার সমাজমানসের চিত্র পাঠকদের কাছে অপেক্ষিত ছিল। লেখিকা সে দিকে বিশেষ নজর দেন নি। কয়েকটি খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে আমরা সে যুগের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাই। খাঁ জাহান খাঁর রাজদরবারের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, রাজার খামখেয়ালি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। জনসাধারণের বিপন্ন অবস্থার

চিত্রটি পাই চুড়িওয়ালির করুণদৃপ্ত চিত্রণে। ভোলানাথ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র। এ-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা সম্ভবত শ্রীকণ্ঠ সিংহের আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন। কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বসন্তরায়ও এই জাতীয় চরিত্র। যদিও ভোলানাথ বসন্তরায়ের মতো এত উন্নত চরিত্র নয় তথাপি তাঁর মসীনের জন্যে উৎকণ্ঠা, মুন্নার বিপদে সমবেদনা প্রকাশ প্রশংসার উদ্রেক করে। ভোলানাথ আইনের মারপ্যাঁচ বোঝে না। স্বামী থাকতে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ তাঁর কাছে অসম্ভব বলে ঠেকেছে। ভোলানাথের সংগীত-প্রিয়তা অপর আর-এক গুণ। এখানে প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। রামপ্রসাদী গানে অভাব-অভিযোগ জ্বালাযন্ত্রণার কথা আছে। সকলেই জানি এই দারিদ্র্য কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নয়। মানুষের সৃষ্টি এই অত্যাচারের কথাটি রামপ্রসাদী গানে বিস্তৃত। ভোলানাথও যখন অন্যায় অবিচার দেখেছে, নিপীড়ন নিষ্পেষণ প্রত্যক্ষ করেছে তখন সেইটি সে প্রসাদী গানের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছে। এই গানগুলির মধ্যে তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে আছে।

মসীন-মুন্নার ভ্রাতাভগ্নীর গৃহচিত্রটি মনোহর। স্নেহের উৎস এখানে নিবিড়বোধে চিত্রিত। কিন্তু মসীন চরিত্রটি নিষ্ক্রিয়। তার মধ্য দিয়ে লেখিকা নিবৃত্তিপথের জয় দেখতে পেয়েছেন। তত্ত্বের বিস্তারে, মতবাদের চাপে মসীন পুতুলের ধর্ম থেকে অব্যাহতি পায় নি। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন সে প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় লেখিকা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল যে লেখিকার ছিল তার প্রমাণ 'পৃথিবী' গ্রন্থ (১৮৮২)। আরও একটি কথা। স্বর্ণকুমারী দেবী মুসলমান সমাজের চিত্র অঙ্কনে সাহসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক না হলেও প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। হিন্দুসমাজের পাশাপাশিই মুসলমানদের অধিষ্ঠান। আমাদের মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ভাসাভাসা, প্রায়ই প্রাথমিক পর্যায়ের। এজন্য মুসলমান-সমাজ সাহিত্যে বিস্তৃত আসন লাভ করতে পারে নি। স্বর্ণকুমারী দেবী অবশ্য মুসলমান-সমাজের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সর্বদা সার্থক হন নি। হিন্দুসমাজের প্রতিচ্ছবিই মুন্নার চরিত্রে। তথাপি দু-একটি ইঙ্গিতে তিনি সমাজবৈশিষ্ট্যটি

ধরবার চেষ্টা করেছেন। সন্ন্যাসীর চরিত্র রোমান্সের আদর্শে পরিকল্পিত। তিনি একপ্রকার অশরীরী। কিন্তু গল্পের মোড় ফিরানোতে তাঁর দায়িত্ব অপরিসীম। এইটি উপন্যাসের ত্রুটি বলেই মানব।

এ উপন্যাসটিতেও দৈব ঘটনার প্রতি লেখিকার পক্ষপাত দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির ভাবটি ঠাকুরবাড়ির উদার পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিদ্রোহ

বিদ্রোহ প্রকাশিত হয় ১৫ই শ্রাবণ ১২৯৭ (৯ই আগস্ট ১৮৯০) বঙ্গাব্দে। মিবাররাজের আকস্মিক সমাপ্তি সম্ভবত লেখিকাকে পীড়া দিয়েছিল। বিদ্রোহ বার হবার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার বিরতি ঘটেছে। বিদ্রোহ লেখবার সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট বঙ্কিম-রমেশের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি আদর্শরূপে থাকলেও এই গ্রন্থে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তথ্য রাজস্থান থেকে সংকলিত।

গুহার বংশধর নাগাদিত্য। গুহার রাজত্বকালে যে-বংশের প্রতিষ্ঠা তা থেকে অনেককাল পরের ঘটনা। ইদর রাজ্য এখন ঐশ্বর্যময়। রাজপুত গরিমা প্রতিষ্ঠিত। নাগাদিত্য পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করছেন। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য, বীর্যমহিমা তাঁকে উদ্দীপিত করত। তিনি সর্বাংশে গোহা (গ্রহাদিত্যের) পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। নিজেকেও দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য বলে পরিচয় দিতেন। আবার গ্রহাদিত্য যেমন ভীলদের প্রীতির দ্বারা বশে রেখেছিলেন, নাগাদিত্যও প্রীতির বিনিময়ে ভীলদের ভালোবাসা চেয়েছিলেন। নাগাদিত্যের রাজত্বকালের যে বর্ণনা পাই তা কিন্তু উজ্জ্বল নয়। কেননা রাজাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী-পুরোহিত-বিদূষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য উন্মুখ। নির্বোধ বিদূষক চাটুকারিতায় রাজার তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত, গণপতি ঠাকুর দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় শাস্ত্রবিক্রয়ে আগ্রহী, মন্ত্রী আপন প্রভুত্ব রাখার জন্য বিভেদ-দলাদলিকে একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করে। অতএব নাগাদিত্যের সঙ্গে তাঁদের প্রকাশ্য বিরোধ না থাকলেও নাগাদিত্যের লক্ষ্যের সঙ্গে তাদের ঐকমত্য ছিল না। এইসমস্ত অকর্মণ্য পারিষদবৃন্দের প্রকৃত

উদ্দেশ্য রাজার কাছে অগোচর ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিরোধের বীজটি এখানে নয়। ঐতিহাসিক ঘটনাটিই উপন্যাসে বিরোধের বীজ বপনে সহায়তা করেছে। সেইটি হচ্ছে ভীলবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ।

ভীলদের কাছে রাজপুত জাতি বিদেশাগত, সুতরাং বৈরীভাব স্বাভাবিক। বিদেশাগতের কাছে স্বদেশবাসীর কোনো মূল্য স্বীকৃত নয়। স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুত জাতির পরাধীন ভীলদের সম্বন্ধে ঘৃণা, উপেক্ষা পুরোমাত্রায়। এই অবস্থায় সম্প্রীতির আশা বৃথা। ভীলরাজ্যে গিয়ে তাদের শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা, ঘরবাড়ি তছনছ করাতে ছিল রাজপুতের আনন্দ। এমনি করে বিজেতার বিজিতের উপরে অত্যাচারের কাহিনীই রচনা করেছে রাজপুত-ভীলদের ইতিহাস। এই দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি ভীলদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু গুহার শত্রু মন্দালিকের বংশধর এখনও বেঁচে। ক্ষোভ, ঈর্ষা, বিদ্বেষ নিয়ে এখনও তারা প্রতিশোধের স্পৃহায় দিন গুণে। জঙ্গু মন্দালিকের উত্তরাধিকারী। জঙ্গুর জীবনের ইতিহাস বিচিত্র। লেখিকা স্তরে স্তরে সেই জীবনের কাহিনী উদ্‌ঘাটন করেছেন। জঙ্গুর পিতামহ চিন্তন মন্দালিকের শোচনীয় মৃত্যুর কথা ভুলতে পারে নি। রাজপুত থেকেই তারা রাজত্ব হতে বঞ্চিত। এই চিন্তা চিন্তনকে উদ্‌বেলিত করে তুলেছে। কিন্তু তার পুত্র আশাদিত্যের সেনাপতি হয়ে চিন্তনের প্রতিশোধস্পৃহাকে ব্যর্থ করে দেয়। পুত্রকে উত্তেজিত করবার সকল আশা যখন নির্মূল তখন সে পৌত্র জঙ্গুকে রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। প্রতিহিংসা যখন জঙ্গুর মধ্যে ধূমায়িত তখন একটি ভীলকন্যা ক্ষত্রিয়ের গৃহে স্থান পায়। জঙ্গু এর বিচার চাইলে। বিচার চাওয়া অবশ্য বৃথা। ক্রোধে জঙ্গু বর্শা নিক্ষেপ করল। দৈবক্রমে রাজা বেঁচে গেলেন। পিতা রাজপুত-সহায়ক বলে জঙ্গুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তে নির্বাসন স্থির হল। পিতা জীবিত অতএব জঙ্গুর পক্ষে কিছু করা অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পর জঙ্গু যখন ফিরে এল তখন তার একটিমাত্র সংকল্প— রাজপুত জাতির ধ্বংস। সে ভীলদের জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। নিজের অসন্তোষ, উত্তাপ-উত্তেজনা ভীলদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিলে। বলা বাহুল্য, রাজপুত জাতি সম্বন্ধে ভীলদের মধ্যে পূর্ব থেকেই অসন্তোষ ছিল। অতএব জঙ্গুর উৎসাহে তারা তাদের উত্তরাধিকার ফিরিয়ে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর হল।

কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। জঙ্গুর পুত্র জুমিয়া পিতার সহায়তায় রাজী হল না। নাগাদিত্যের সে প্রিয়পাত্র। উপকারীর উপকার স্বীকার করা সে জীবনের ব্রত বলে জানে। জঙ্গুর আকুল আবেদনে সে সাড়া দেয় কিন্তু প্রতিশোধের সম্মুখীন হয়ে জুমিয়া পশ্চাদপসরণ করে। দ্বিতীয় গ্রহাদিত্যের মৃত্যুকামনায় তার রক্তস্রোত উষ্ণ হয় কিন্তু নিজের হাতে দণ্ড তুলে নিতে পারে না। জুমিয়ার এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব জঙ্গুর দৃষ্টি এড়ায় না। শেষ পর্যন্ত জুমিয়া পিতার কাছে ক্ষমা চাইলে। জঙ্গু পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় নিশ্চেষ্ট রইল না। পুত্র জংলাকেই রাজাকে নিহত করবার ভার দিলে। এ ভাবে ঘরে-বাইরে সে তার তীব্র বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিদ্রোহের সূচনা করে দিলে। কিন্তু ভীলদের মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও সংহতি ছিল না, অত্যাচারের জ্বালা অনুভব করলেও অন্তর্বিরোধে তারা জর্জরিত। জংলা জঙ্গুব পুত্র হলেও কাপুরুষ দুর্বল। তথাপি সে নাগাদিত্যকে মারবার চেষ্টা করলে। বর্শা ছুঁড়ে ভয়ে পালিয়ে এল। এ-যাত্রা রাজা অক্ষত রইলেন। জঙ্গুর আশা-ভরসা নির্বাপিত হল। সে বৃদ্ধ, তার আর করণীয় কিছু রইল না, কেবল অতৃপ্তি নিয়ে বসে রইল। রাজার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের সংবাদ দেখতে দেখতে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহের অপরাধে দুজন নিরপরাধ বন্দী হল। বিচার আরম্ভ হল। এ বিচারে মন্ত্রীপরিষদ ভীলদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অনুমোদন কবলেও রাজা নাগাদিত্য তা মেনে নিতে পারলেন না। কারণ তিনি সমদর্শী হতে চান। রাজার এই ব্যবহারে পুরোহিত হরিতাচার্য এক দিকে যেমন খুশি হলেন অন্য দিকে তেমনি তাঁর আশঙ্কাও জাগল।

হরিতাচার্য রাজপুরোহিত। তিনি এতদিন ইদর রাজ্যে ছিলেন না। তিনি গণনায় জেনেছিলেন রাজার ভবিষ্যৎ অশুভ। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারলেন ইন্দ্রিয়-অসংযমই রাজার পক্ষে কাল হয়েছে। সংযমই রাজত্বের স্থায়িত্ব দেবে, অসংযম রাজার মৃত্যু ঘনিয়ে আনবে। সুতরাং রাজাকে সর্বতোভাবে সংযম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে হরিতাচার্য ইদরে ফিরে এলেন।

এর পর ঘটনার গতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। নাগাদিত্যের হৃদয়-বিশ্লেষণ, তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য, রানীর আশঙ্কা-সংশয় উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। জুমিয়ার কন্যা সুহারমতি। নদীতীরে তাকে জুমিয়া কুড়িয়ে পেয়েছিল। রাজার যখন ষোড়শ বৎসর মাত্র তখন এই কন্যা বালিকা।

ধীরে ধীরে বালিকা পূর্ণযৌবনে পদার্পণ করলে। রাজা সুহারের সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায়ই স্নানের ঘাটে আসতে লাগলেন। ব্যাপারটি রাজ্যে রাষ্ট্র হল। রাজার আচরণ হরিতাচার্যের দৃষ্টি এড়াল না। হরিতাচার্য রাজাকে সাবধান করে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন।

হরিতাচার্য যে কেবল রাজাকে উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন তা নয়। তিনি অদৃষ্টকে আয়ত্তে আনতে বদ্ধপরিকর। রাজ্যময় যে বিশৃঙ্খলা, পারিষদ-বৃন্দের অবিমৃষ্যকারিতা, গণপতি ঠাকুরের স্থূল চাটুকারিতা এই-সকলের বিরুদ্ধেই দাঁড়ালেন। গণপতি ঠাকুরকেও তিনি সাবধান করে দিলেন। লোকমুখের রটনা রানী সেমন্তীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করল। ঈর্ষা জাগল, একটু ক্রোধও বটে। ভীলদের প্রতি সুবিচার সকলের মনে কাঁটা হয়ে বিঁধেছিল। তাকে অবলম্বন করে রাজার সুহারমতির প্রতি আসক্তির চিহ্ন বিকৃতির আকারে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা সেমন্তীর সংশয় উড়িয়ে দিলেন। কেননা পাপচিন্তা তাঁর মনে নেই। সেমন্তী আশ্বস্ত। ভীলযুবক ক্ষেতিয়া সুহারমতির রূপে মুগ্ধ, তাকে বিবাহ করবার জন্য সে ব্যগ্র। ওদিকে নাগাদিত্যের সুহারমতির প্রতি প্রশংসা প্রেমে রূপান্তরিত হল।

ক্ষেতিয়া জানতে পারলে সুহারমতি রাজার প্রতি আসক্ত। সুহারমতির উপেক্ষা ক্ষেতিয়াকে উত্তেজিত করলে। হরিতাচার্য পুনরায় চিন্তিত হলেন। তিনি রানীর সংশয় পুনরায় জাগালেন। রুক্মিণীদাসীও রানীকে সাবধান করে দিয়েছে। রানী সন্দেহ-আশঙ্কা গোপন করতে পারলে না। রাজার কাছে সব নিবেদন করলে। রানীর এই আশঙ্কা রাজাকে বিচলিত করলে। রাজা প্রবল ক্রোধ নিয়ে কতকটা মোহগ্রস্তের মতো নিকুঞ্জপথে বেরিয়ে পড়লেন। সন্দেহ সংশয় ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে মুক্তি চাইছিল তাঁর মন। রানী সেমন্তীর অভিযোগ নাগাদিত্যকে সুহারমতির দিকে ঠেলে দিলে।

নাগাদিত্য এই দুই কোটির আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবর্তিত। তাঁর মনে দেবাসুরের সংগ্রাম। এই সময়ে সুহারমতি জলে ঝাঁপ দিলে রাজা নাগাদিত্য তাকে উদ্ধার করলেন। রাজার প্রেম গাঢ় হল। সুহারমতির এই আচরণ ভীলসমাজ ভালো চোখে দেখলে না। ক্ষেতিয়া রাজদত্ত ফুল সুহারমতির কাছ থেকে চুরি করলে। ক্ষেতিয়া সরল বিশ্বাসে বুঝেছিল এই ফুলের জন্যই সুহারমতির রাজার প্রতি আসক্তি। ফল হল বিপরীত। সুহারমতি ক্রোধে

অপমানে ক্ষেতিয়াকে তিরস্কৃত করলে। এবারে গণক উত্তেজিত করলে ক্ষেতিয়াকে সমস্ত কথা জঙ্গুকে জানাবার জন্য।

এ দিকে রাজারও মনে শান্তি ছিল না। রানী সেমন্তী বুঝতে পারলেন নাগাদিত্যের চিত্ত সুহারের জন্যই উৎকণ্ঠিত।

গৌরীপূজার সময় শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত হয়। রানী সুহারকেই সুন্দরী নির্বাচিত করলে। রাজা সুহারমতির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। রানীর মুখে করুণ হাসি দেখা দিল। রানী সেমন্তী রাজার সুখে নিজেকে কথঞ্চিৎ ধন্য মনে করলে।

ক্ষেতিয়ার কাছে জঙ্গু সমস্ত ঘটনা শুনতে পেলে। জুমিয়ার কন্যার ধর্মনাশ আশঙ্কায় জঙ্গুকে আবার উত্তেজিত করে তুলল। এতদিন সে জুমিয়াকে উত্তেজিত করতে পারে নি। এবার কন্যার ধর্মনাশে নিশ্চয়ই জুমিয়ার প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা জাগবে আশায় জঙ্গু রাজরক্ত চাইলে। জুমিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল। জঙ্গু বললে, 'রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, কাঁদুবার কাল এডা নয়।' জুমিয়ার প্রশ্ন 'রক্ত! রক্তে কি এ কালী ধুইতে পারবে।' জঙ্গুর উত্তর—

হুঁ রক্ত, রক্ত সেই পাষণ্ডের রক্ত দিউ এ কালী ধুই ফেল।

কিন্তু জুমিয়া জানে এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের কন্যা। অতএব রাজা যদি বিবাহে রাজি না হয় তবে জুমিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ চাইবে। রাজাও সুহারমতিকে বিবাহ করতে চাইলেন। এমন-কি ক্ষত্রিয়ের ভীলকন্যা বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্যে তিনি নববিধান জারী করতে চাইলেন। এমন সময়ে জুমিয়া সুহারমতির জন্মবৃত্তান্ত জানিয়ে দিলে। রাজা সেইদিনই বিবাহের উদ্যোগ করলেন। সৈন্যসামন্তসহ রাজা বিবাহসভায় এলেন। রানী নিজে উদ্যোগী হয়ে সুহারমতিকে বিবাহসভায় নিয়ে এলেন। এমন সময়ে হরিতাচার্যের কথায় জানা গেল সুহারমতি ব্রাহ্মণকন্যা। জুমিয়ার কাছে প্রমাণ দিলেন হরিতাচার্য। জুমিয়া বুঝতে পারলে সুহারমতি রাজার ধর্মপত্নী হতে পারে না। সুতরাং বিবাহে সম্মতি দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, জুমিয়াও। যুদ্ধ বাধল। জুমিয়ার বর্শা নিক্ষেপে রাজারানী আহত হলেন। জুমিয়ার অনুশোচনার অন্ত রইল না। মৃত্যুপথ-যাত্রী রাজা বললেন, 'আমার অনুরোধ, তুমি মরিও না। আমার শিশু-সন্তান রহিল— তাহাকে রক্ষা কর'। জুমিয়ার সাহায্যে হরিতাচার্য শিশুসন্তানকে রক্ষা করলেন। জুমিয়া রাজপরিবারবর্গ রক্ষার জন্যে ভীলদের সঙ্গে যুদ্ধ

করলে। নিজে মৃত্যু বরণ করলে। সুহারের স্নেহে মমতায় রাজপুত্র বাপ্‌পা রইল।

বাপ্‌পা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইঁহারই (হরিতাচার্য) নিকট দীক্ষিত হইয়া ছিল এবং ইঁহারই প্রসাদে নানা বিপদোত্তীর্ণ হইয়া মিবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মিবাররাজ বিদ্রোহের পটভূমিকা। বিদ্রোহে মিবাররাজের কথা স্বর্ণকুমারী বলেছেন। মিবাররাজের প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত, বিদ্রোহে বিস্তৃত।

বিদ্রোহের রাজা নাগাদিত্য রানী সেমন্তী এবং সুহারমতির উপর বিষবৃক্ষের প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। রাজা নাগাদিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র নগেন্দ্রের প্রভাবই নয় সীতারামের প্রভাবও দেখা যায়। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর রূপরাশিতে মুগ্ধ হয়ে সূর্যমুখীর স্নেহ-প্রেমকে ভুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তির স্তরগুলিকে যেভাবে ভাঁজে ভাঁজে খুলেছেন স্বর্ণকুমারী দেবীও সেই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনিও নাগাদিত্যের অন্তরের দ্বন্দ্বমথিত চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বিশ্লেষণ সর্বদা দেখতে পাই না। কিন্তু লেখিকা এই বিশ্লেষণের সাহায্যে নাগাদিত্যের চরিত্রটিকে রোমান্সের স্তর থেকে বাস্তবের কঠিন মাটিতে স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমের রচনাশক্তি লেখিকার অনায়ত্ত হলেও নাগাদিত্যের বর্ণনায় লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রানী সেমন্তী সূর্যমুখীর অনুরূপ। প্রবল আত্মমর্যাদা এবং অভিমান সেমন্তীর সহজাত। সূর্যমুখীর মতোই সেও স্বামীর ইন্দ্রিয়বৈকল্যের প্রতিটি স্তর অনুধাবন করেছে। মনের আগুনে দগ্ধ হলেও সহজাত উদারতায় কিছু বলতে সক্ষম হয় নি। ভীলকন্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সে রাজাকে বিচলিত করেছে সত্য কিন্তু নিজেও তার জন্য কম অনুতপ্ত হয় নি। পরিশেষে সেমন্তী যখন বুঝেছে রাজার চিত্ত অন্য আধারে স্থাপিত তখন সূর্যমুখীর মতো সে-ই উদ্যোগী হয়ে সুহারমতিকে বিবাহসভায় সাজিয়ে এনেছে। এমন-কি কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী-নগেন্দ্রনাথের মানসিক বিক্ষোভের সময় গৃহের অবস্থার যে বর্ণনা পাই বিদ্রোহে তাই অতিপল্লবিত হয়েছে। সুহারমতি কুন্দনন্দিনীর অনুরূপ।

স্বল্পপরিসরে হলেও রুক্মিণী চরিত্রটি সুপরিস্ফুট। রানীর জন্য তার ভালোবাসা অকৃত্রিম। রানীর সন্দেহ-উদ্রেকে যদিও সেও অংশত দায়ী তথাপি তার মধ্যে কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।

বিদ্রোহ উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়েছে ভীলদের বর্ণনা। ভীলরা পর-পদানত। পদানত জাতির মনোভাব বিশ্লেষণে লেখিকা আশ্চর্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এক দিকে জঙ্গুর ঈর্ষাদিগ্ধ অন্তঃকরণে অধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ অন্য দিকে ভীলদের মধ্যেই আত্মবিরোধ ক্ষুদ্র দলাদলি সংকীর্ণতা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত। জংলা রাজা সাব্যস্ত হলে যে দ্বন্দ্ববিরোধের ছবি পাই সেইটিই অধীন জাতির দুর্বলতম অংশ। আবার অন্য দিকে অধীনজাতির মধ্যে আত্মাবমাননা সত্ত্বেও এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত হয়েও যে নিশ্চেষ্ট অবস্থা দেখতে পাই তার বর্ণনা করেছেন লেখিকা একটি পরিচ্ছেদে। ভীলজাতি যোদ্ধা সাহসী, সংগ্রাম তাদের পেশা। কিন্তু দুশো-বছরের পরাধীনতার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্ধবিশ্বাস, আনুগত্যপরায়ণতা। এইটি মনে হয় সমসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি। আবার ভীলদের চরিত্রে একটি আদিম সরলতা আছে। ক্রোধে সে উন্মত্ত, স্নেহে শান্ত। সবকিছুকে সে অনায়াসে বিশ্বাস করে আবার সে বিশ্বাস স্খলিত হলে তাকে উৎপাটিত করতেও দ্বিধা বোধ করে না। এই আরণ্যক প্রকৃতি আদিম জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বর্ণকুমারী সমবেদনার সঙ্গে এই ভীলজীবন নিরীক্ষণ করেছেন এবং তাঁর উপলব্ধি আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে জঙ্গু-কুন্নুর মিলন দৃশ্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। দুই বৃদ্ধের দীর্ঘবিচ্ছেদের পর মিলন নানা স্মৃতির আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময়। তাঁদের দেশের অবস্থা, পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য ভীলদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ করে সংলাপের ভাষা সাঁওতাল জীবন এবং ভাষা— প্রভাবিত। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এই সাঁওতাল জীবন হয়তো লেখিকার বাস্তবদৃষ্ট। সে যাই হোক এই বর্ণনা কিন্তু স্থানভেদের জন্যে অস্বাভাবিক হয় নি বরং নিবিড় উপলব্ধির আনন্দে সঞ্জীবিত।

এই উপন্যাসে লেখিকা রাজার উপর প্রবৃত্তির লীলা দেখেছেন। প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় রাজার সর্বনাশ ঘটেছে। উপন্যাসটির এইটি ফলশ্রুতি। পরবর্তী উপন্যাস ফুলের মালায় লেখিকা প্রবৃত্তির উপর নিবৃত্তির জয়ঘোষণা করেছেন।

ফুলের মালা

ফুলের মালা প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। এইটি স্বর্ণকুমারী দেবীর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর আগে তিনি ইতিহাসাশ্রিত কতগুলি ছোটোগল্পও রচনা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী যখন তাঁর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন তখন এই জাতীয় উপন্যাসের সমাদর যে খুব বেশি ছিল তা বলা বাহুল্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়ও তখন নানা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীও অভিজ্ঞতার প্রৌঢ় পরিণতিতে আসীন। ফুলের মালাতে স্বর্ণকুমারী দেবী সার্থকতায় পৌঁছেছিলেন। ফুলের মালার ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে মডার্ণ রিভিয়্যুতে বার হয় *The Fatal Garland* নামে।

ফুলের মালার কাহিনীর ভূসংস্থান বাংলাদেশ। সময়, রাজা গণেশের আমল। গিয়াসুদ্দীনের সময়ে যে পারিবারিক বিরোধ এবং রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাই এই উপন্যাসের বিষয়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজা গণেশকে নিয়ে বাদবিতণ্ডার অন্ত নেই। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রধানত কোন বইটি অবলম্বন করেছিলেন তা বলা শক্ত। তবে সে যুগে বিশেষ পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে স্টুয়ার্টের *History of Bengal* যে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের রচনাও হয়তো লেখিকা দেখেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যগুলির একটা সংক্ষিপ্ত সারসংকলন করা যাক।

স্টুয়ার্ট তাঁর *History of Bengal*এ সেকেন্দর শাহের যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি করে তাঁর মৃত্যুর যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা এই। সেকেন্দর শাহের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর সতেরোটি সন্তান এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র সন্তান গিয়াসুদ্দীন। প্রথম স্ত্রী গিয়াসুদ্দীনের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং সেকেন্দর শাহকে গিয়াসুদ্দীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে। সেকেন্দর শাহ স্ত্রীর এই কপটতা এবং বৈর মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। গিয়াসুদ্দীন বিমাতার এই ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। গিয়াসুদ্দীন একদিন শিকারের নাম করে পালিয়ে যায় সোনারগাঁও বা সুবর্ণগ্রামে। সেকেন্দর শাহও পুত্রকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। গিয়াসুদ্দীনের ইচ্ছে না থাকলেও সেকেন্দর শাহ আহত হন। গিয়াসুদ্দীন পিতার আহত হবার সংবাদ শুনে—

Hastened to his father's presence, and taking him head up in his lap, shed tears of repentance, and humbly besought the old man's forgiveness. The king then opened his eyes, and said, "My business is finished ; may your dominion be prosperous", after which his soul took its flight to the other world ! ১

এই ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা পাচ্ছি রিয়াজ-উস্-সালাতিনে। গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই তা স্বর্ণকুমারী দেবী-বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। কারণ গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালের কেবলমাত্র কয়েকটি শান্তিপূর্ণ সংস্কারের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। স্টুয়ার্ট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *History of Bengal Vol-II*তে গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বের সংস্কারের কথাই বলা হয়েছে। গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়বিচারের একটি ঘটনার উল্লেখ করে উভয় লেখকই গিয়াসুদ্দীনের কৃতিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং স্বর্ণকুমারী দেবী যেভাবে গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা ইতিহাসসম্মত নয়। তাঁর এই ইতিহাস-বিচ্যুতির দিকটি পরে আলোচ্য।

রাজা গণেশকে নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। স্টুয়ার্ট গণেশকে বলেছেন কনিস। এইটি হয়তো পারসিক ঐতিহাসিকদের বানানবিভ্রাটের ফল। পাণ্ডুয়ার যুদ্ধটি ইতিহাসসম্মত। রাজা গণেশদেব was greeted by the Hindoos as the restorer of their religion ; and sovereign of Bengal. কিন্তু রাজা গণেশ রাজ্যপ্রাপ্তির পর বিচক্ষণতার সঙ্গে মুসলমানদের বশে রাখেন। আফগান সেনাপতিদের তাদের অংশ থেকে বঞ্চিত না করে তিনি তাদের নিশ্চয়তা দেন। রাজা গণেশ মুসলমানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন বলেই নিশ্চিন্তে রাজকার্য চালাতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানরা তাঁকে সমাধিস্থ করতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইতিহাস-অনুযায়ী রাজা গণেশই গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর কারণ। যদুনাথ সরকার রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ রাজা গণেশকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসকরূপে চিত্রিত করেছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মশায় দনুজমর্দনদেব যে রাজা গণেশই তা প্রমাণ করেছেন। তবকত-ই-আকবরীতে পাচ্ছি সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর বাংলার জমিদার

১ J. N. Sarkar, *History of Bengal Vol-II*

রাজ্য অধিকার করেন। এর পর তার পুত্র জালালুদ্দীন রাজ্যপ্রাপ্তির জন্ম মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরীতে আছে গিয়াসুদ্দীনের পৌত্রকে অন্যায়রূপে পদচ্যুত করে কংস রাজা হন। তারিখ-ই-ফিরিস্তীতে দেখা যায় সামসুদ্দীন ছিলেন রাজকার্যের অনুপযুক্ত এবং রাজা কংস প্রকৃতপক্ষে রাজার প্রভু হয়ে উঠেন। সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর কংস রাজা হন। রাজত্বকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর খুব প্রীতির ভাব ছিল। গণেশের পুত্রের নাম পাচ্ছি জিতমল। কংসের মৃত্যুর পর তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে রাজা হন। রিয়াজ-উস-সালাতিন অনুযায়ী সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দু জমিদার রাজা কংস ধীরে ধীরে সমস্ত বাংলাদেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। রাজা হয়ে তিনি অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এমনও দেখা যায় তিনি মুসলমান ফকিরের উপর অত্যাচারের দ্বারা নিজের বিপদ ডেকে আনেন। শেখ বদর-উল-ইসলামকে হত্যা করার অপরাধে সুলতান ইব্রাহিম তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজা কংস নিরুপায় হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁর পুত্র যদু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করবে এই প্রতিশ্রুতিতে তিনি সে যাত্রা মুক্তি পান। এর পরও রাজা কংস মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছেন। যদুনাথ সরকার আধুনিক বিচারে রাজা গণেশের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজা গণেশ সম্বন্ধে আচার্য সরকার বলেছেন—

> Ganesh placed his son, a lad of twelve only, under protective watch in his harem and ruled on his account under the proud title of Danuj-mardan-Dev, "Devoted to the feet of the goddess Chandi." His position during the remaining year or two of his life was unassailable, because he had the wisdom to govern the country "in the best manner" and to treat his Muslims subjects so lovingly that according to the story that reached Firistha, after his death "some muslims, wanted to bury him in the ground according to Islamic rites.

রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য যা পাচ্ছি স্বর্ণকুমারী দেবী তাকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। অবশ্য কল্পনার আশ্রয়ও তিনি নিয়েছেন।

আগে বলেছি, সেকেন্দর শাহ ঠিক ইতিহাসের অনুরূপ নয়। গিয়াসুদ্দীনের চরিত্রও ইতিহাসসম্মত নয়। যদুর নাম উপন্যাসে যাদব। যদুর মুসলমান-ধর্ম গ্রহণের যে কারণটি লেখিকা দিয়েছেন তাও তাঁর নিজের।

গণেশ-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা স্বাধীনচিন্ততার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নায়ক হিসেবে তার সম্মান। এ চরিত্রটি পূর্ণবিকশিত নয়। রোমান্সের চরিত্র-অঙ্কনে যে বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায় এখানেও তা লক্ষিত হয়। তবে গণেশ-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকার উদ্দেশ্যপ্রবণতাও জয়ী হয়েছিল। ইতিহাসে রাজা গণেশকে যেভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে লেখিকা তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছেন। ফিরিস্তার বর্ণনাই লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। এখন সেই উদ্দেশ্যপ্রবণতাটি কি? ইতিপূর্বে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা ক্ষাত্রবীর্যের, স্বদেশহিতৈষণার এবং বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি কিন্তু সে সমস্ত বীরচরিত্রের বীরত্ব-উন্মাদনার পশ্চাতে নীতিকথনের আত্যন্তিক প্রকাশ ছিল না। যেমন মধুসূদনের মহাকাব্যে নীতিকথন অপেক্ষা চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই বৃহত্তর হয়ে দেখা দিয়েছিল সেইরকম রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির মধ্যেও সেই স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির লীলা দেখতে পাই। স্বদেশীপ্রেরণার প্রথম জোয়ারে যে উত্তেজনাবহুল প্রাণশক্তির পরিচয় দেখা যায় তারই প্রতীক ছিল সে-সমস্ত ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, সে উত্তেজনা যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন তাকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করবার প্রেরণা আসে। রাশ ধরে একবার দাঁড়াতে হয়, ভবিষ্যৎ ফলাফল চিন্তা করতে হয়। এই কারণে পরবর্তী বীরচরিত্র কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই নিজেদের শক্তি ব্যয় করে না বরং শক্তিই যথার্থ ব্যবহারে সমাজনির্মাণ-কার্যে সার্থক করে তোলে। অনুমান করি, স্বর্ণকুমারী দেবীর রাজা গণেশ চরিত্রঅঙ্কনে এই অভিপ্রায় ছিল। তিনি গণেশদেবকে কেবল আদর্শবীর রূপেই দেখাতে চান নি বরং সকল ধর্মে সমদর্শী আদর্শ প্রজাপালক রাজ-আদর্শও দেখাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজার আদর্শ তাঁর সামনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু হৃদয়ের উদ্দাম আবেগে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অধঃপতনের দৃশ্য তাঁর সামনে ছিল। সীতারাম চরিত্রের অধঃপতনের পশ্চাতেও এই নীতিহীনতা, হৃদয়ধর্মের প্রবলতা, প্রজাসুখ অপেক্ষা নিজের সুখকে বৃহৎ করে দেখা। সুতরাং স্বর্ণকুমারী দেবী রাজা গণেশদেবকে প্রজাপালক বীর আদর্শস্থানীয় রাজা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। গণেশদেবের সহায় ছিলেন সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনী নিবৃত্তি-মার্গের পথিক। পুণ্যের দ্বারা পুণ্য অর্জন এইটিই তার জীবনের মূলমন্ত্র। গণেশদেবও পুণ্যের দ্বারা পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছিলেন। শক্তিময়ীর প্রতি

আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাই তিনি বারবার নিষ্ঠুর সমাজশাসনকে মেনে নিয়েছেন। এইটি ভালো কি মন্দ সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কেবলমাত্র লেখিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এইটিই সঙ্গত বলে বোধ হয়। সাহেবুদ্দীনকে মুক্তি দিলে যুদ্ধবিগ্রহ এড়ানো যেত। হয়তো কূটনীতির দিক থেকে সেইটিই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু কূটনীতি অপেক্ষা ন্যায়ধর্ম বড়ো। রাজা যুধিষ্ঠিরের এই বাণীই গণেশদেবের সহায়। রাজনীতির অসিভাগে ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দের কোনো বিচারই সম্ভব নয়— এইটি গণেশদেব মানতে চান না। তাঁর মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতাও লক্ষণীয়। এইটি অবশ্য ইতিহাসও সাক্ষ্য দেবে। রানী যখন সাহেবুদ্দীনকে গিয়াসুদ্দীনের হস্তে দিতে রাজাকে অনুরোধ করলে তখন

> কেন তোমরা তাদের দোষ দাও? হিন্দুজাতির যথার্থ গৌরব তাহাদের উদারতায়, যদি হিন্দু বলে গর্ব থাকে ত অন্য কাহাকেও ঘৃণা করো না। সকলকেই আত্মবৎ মান্য করো।

অবশ্য গণেশদেবের চরিত্র অপরিস্ফুট, রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত। বিশেষত মাতার আদেশে শক্তিকে পরিত্যাগের পর রাজা যখন পুনরায় শক্তিকে বলেন তাকে তিনি হয়তো গ্রহণ করতেন তখন আমাদের বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। কারাগারে তাঁর শোকাবহ অবস্থাটি চরিত্রের উপযোগী নয়। এইটি আরোপিত বলে মনে হয়। শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, তাব প্রতিশোধস্পৃহা ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে বেমানান নয়। তবে নিশীথরাত্রে সম্রাটগৃহ থেকে দিনাজপুরের শিবিরে আগমন এবং রাজাব কাছে প্রণয়নিবেদন বাস্তবতার দিক থেকে সম্ভব বলে মনে হয় না। মুনশী-সর্দারের কথোপকথন বঙ্কিমচন্দ্রের রামা-শ্যামার সংলাপের অনুরূপ। নিরুপমা অপরিস্ফুট। সন্ন্যাসিনী রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী।

চণ্ডীচরণ সেন

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) যখন গ্রন্থরচনায় ব্রতী তখন রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস সবগুলিই প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের সূত্রপাতও সে সময়ে। অথচ চণ্ডীচরণ রচনাকর্মে এই দুই সাহিত্যিকের প্রভাবমুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও জোগান বেড়ে গেল। কিন্তু একদল সাহিত্যিক ইতিহাসকেই গল্পের আকারে রচনা করবার দায়িত্ব অঙ্গীকার করলেন। ইতিহাস ও উপন্যাসের ভেদরেখাটি তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না। চণ্ডীচরণের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও মূলত ইতিহাস এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাসও বটে। এগুলিকে উপন্যাস বলতে অনেকেরই দ্বিধা জাগবে। সুখপাঠ্য ইতিহাসের প্রাচুর্য তখন ছিল না। সুতরাং চণ্ডীচরণ তাঁর উপন্যাসে 'স্থানে অস্থানে'[১] তথ্য পরিবেশন করে ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

চণ্ডীচরণ সেনের টম্‌কাকার কুটীর (১৮৮৫) অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা জাগে। ইতিহাস পাঠে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নিষ্ঠার কথা কন্যা কামিনী রায় উল্লেখ করেছেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন। নানা লাইব্রেরিতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার প্রবণতাও চণ্ডীচরণের ছিল।

তবে টম্‌কাকার কুটীরই তাঁর উপন্যাস রচনার আদর্শ ছিল।[২] টম্‌কাকার কুটীরে হেলির নিষ্ঠুরতা, টমের ধর্মপ্রবণতা, ইলাইজার দুঃখদারিদ্র্য, দাস-দাসীদের উপর নির্যাতন লেখককে অভিভূত করেছিল। তাঁর সমস্ত উপন্যাসগুলিতে এর প্রভাব দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত মিসেস স্টো যেমন ধর্মযাজিকার (মিসেস স্টো ধর্মযাজকের কন্যা এবং পাদ্রীর পত্নী) মতো উপন্যাসে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন চণ্ডীচরণও ব্রাহ্মশিক্ষকের আসনে বসে উপন্যাসে ধর্মকথার আলোচনা করেছেন। টম্‌কাকার কুটীরের চরিত্রগুলির

১ কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী

২ ঐ

আকস্মিক মিলন চণ্ডীচরণের উপন্যাসেও অনুসৃত হয়েছে। দাসব্যবসা-বিরোধী আইন প্রণয়নে টম্‌কাকার কুটীরের দান অনেকখানি। চণ্ডীচরণ অবশ্য সেরকম কিছু দাবি করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভিক্টোরিয়ার ভারত আইন পাসের কারণস্বরূপ উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলিকেই মনে করেছেন।

চণ্ডীচরণের গ্রন্থ-রচনার অন্যতম উৎস তাঁর স্বদেশপ্রেরণা। এই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যোগ লক্ষ করবার মতো। চণ্ডীচরণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নি। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেন্টের তীব্র সমালোচনার মধ্য দিয়ে শাসকদের সচেতন করে দেবার ইচ্ছে তাঁর ছিল। লক্ষণীয় 'নন্দকুমারাদি লিখিয়া তিনি অচিরাৎ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন'।[১]

চণ্ডীচরণ ধনী ছিলেন না। তাঁর দারিদ্র্যের কথা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এই দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ইংরেজের অত্যাচারের মধ্যে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে এক দিকে অর্থশোষণ অন্য দিকে সেই শোষণে পিষ্ট মানবাত্মার ক্রন্দনধ্বনি শুনি। ব্যক্তিগত জীবনের আবেগ অনুভূতি সঞ্চারিত ছিল বলেই উপন্যাসগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

চণ্ডীচরণের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের যোগ ছিল। চণ্ডীচরণের লঙ্কাকাণ্ড (বিদ্রূপাত্মক কাব্য ১৮৮৩) রাজরোষে পড়তে পারে বলে রমেশচন্দ্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে কামিনী রায় বলেছেন, 'এই সকল পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসচর্চার সঙ্গে ধর্ম ও নীতিপ্রচার'।[২] চণ্ডীচরণ নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন—

> The religion which has been purchased by the tears of my father shall be strictly followed by me, at any cost and at any sacrifice.

এই ধর্মনিষ্ঠা থেকেই সমাজসংস্কারের বাসনা চণ্ডীচরণের মনে জেগেছিল। সেই কারণে তিনি সমাজকে সংস্কারকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তাঁর বিরূপতা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত।[৩] মানিকগঞ্জে থাকাকালীন

১ কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী
২ ঐ
৩ ঐ

তিনি দুর্নীতিপরায়ণ বৈষ্ণবদের ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে একখানি মুদ্রিত পত্র বার করেন।

চণ্ডীচরণের 'টম্‌কাকার কুটীরের'র অনুবাদ সাবলীল। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর মৌলিক রচনায় এই সাবলীলতার অভাব। এর কারণ সম্ভবত কামিনী রায় যা বলেছেন তাই।

> অনেকক্ষণ বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, শব্দ বাছিয়া লিখিবার জন্য তিনি সময় ব্যয় করিতেন না, এবং অপরকে এরূপ করিতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন। ১

চণ্ডীচরণের উপন্যাসগুলিতে কলাবোধের অভাব। উপন্যাস রচনাকালে তথ্যের কিছু অংশ থাকে নেপথ্যে কিছু প্রকাশ্যে। চণ্ডীচরণের উপন্যাসে নেপথ্যেলোক নেই। চণ্ডীচরণ প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক উপাদান অবিকৃত রাখবার দায়িত্ব স্বীকার করেছেন। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র মতো পরিশিষ্টে ঐতিহাসিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। ফলে চণ্ডীচরণের রচনা উপন্যাসের ছাঁচে ইতিহাস। এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা উচিত।

মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা

চণ্ডীচরণের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা' ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। লেখক প্রকৃত তথ্যসন্নিবেশের ত্রুটি করেন নি। *Bolts on India*, মেকলের রচনাবলী, থর্নটনের *History of British Empire in India*, ক্লাইভের পত্রাবলী, *Calcutta Review*, সিয়ারল মুতখেরিন, ট্যারেনের Empire in Asia, বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতাকে অবলম্বন করে চণ্ডীচরণ সেন এই গ্রন্থ রচনা করেন।

ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

> আমার লিখিত টমকাকার কুটীর পাঠ করিয়া অনেকানেক সুশিক্ষিত লোক বলিয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গদিগের কর্তৃক আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন জাতির লোকই অপর কোন জাতির উপর কখনও এইরূপ ভীষণ অত্যাচার করে নাই। বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারেই জানেন না।

১ কামিনী রায়, শ্রাদ্ধিকী

পরে বলেছেন—

> সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এই হৃদয়বিদারক কাহিনী মহারাজ নন্দকুমারে অঙ্কিত। ইতিহাসে এই সময়টি Plessy Plunder নামে অভিহিত। পরিশেষে লেখক মন্তব্য করেছেন এদেশের ইতিহাস-পাঠে অরুচি তাই একে উপন্যাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। এই মন্তব্যটিতে সংশয়ের অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহে ইতিহাস-পাঠের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সুতরাং লেখকের মন্তব্যটির লক্ষ অন্যরূপ। সম্ভবত তখন পর্যন্ত প্রকৃত ইতিহাস পুস্তকের অভাবই লেখকের বক্তব্যের লক্ষ্য। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতিসুধা পরিবেশন করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

লেখক বলেছেন একে উপন্যাস আকারে লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃতিতে মহারাজ নন্দকুমার ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। গ্রন্থের নাম 'মহারাজ-নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পুর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা'। চণ্ডীচরণ শেষোক্ত দিকটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক অবস্থা-বিশ্লেষণই লেখকের স্পৃহণীয়। এজন্য মহারাজ নন্দকুমারে নন্দকুমারের সঙ্গে যোগ নেই এমন সমস্ত ঘটনারই বেশি উল্লেখ দেখি। গ্রন্থের আরম্ভে এবং গ্রন্থের শেষে নন্দকুমাবের উল্লেখ আছে। কিন্তু অংশটি শিথিলবিন্যস্ত।

কেবলমাত্র দ্বৈতশাসনের কুফল দেখিয়েই লেখক ক্ষান্ত হন নি। সঙ্গে সঙ্গে বিধবানির্যাতন, রমণীনির্যাতন, বৈষ্ণবদের অনাচার এ সমস্তই সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, এইগুলির সঙ্গে ইংরেজ শাসনের যোগাযোগ কেবল ক্ষীণই নয় পরোক্ষ যোগ আবিষ্কার করাও দুরূহ। বাংলা নাটকের আদিপর্বে এই সামাজিক বৈষম্যকে নিয়ে নাট্যরচনার জোয়ার এসেছিল। লেখকের রচনাও এদেরই সগোত্র। এইসমস্ত নাটকে নীতিকথারও প্রাচুর্য লক্ষণীয়।

চণ্ডীচরণ সেনের গ্রন্থেও প্রভুসম্মিত বাক্যের অভাব নেই। গ্রন্থে কাহিনী কিছু নেই। তবে কতগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারে বর্ধিষ্ণু তন্তুবায় সমাজ বিপর্যস্ত হলে সভারাম তাঁতি কপর্দকহীন অবস্থায় একমাত্র কন্যা সাবিত্রীকে নিয়ে বাস করছিলেন। কিন্তু সাবিত্রীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা হল। অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে

আর্মানিয়ান বণিক ক্যারাপিট আরটুনের স্ত্রীর দয়ায় সাবিত্রী রক্ষা পেল। তার পর সে গেল তার ভাইকে উদ্ধার করতে কলকাতায়। এই যাত্রাপথের দীর্ঘ বিবরণ গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। বৈষ্ণবদের আখড়া, হিন্দুবিধবা-নির্যাতনের বর্ণনা একের পর এক উল্লিখিত। পরিশেষে নন্দকুমারের বিচারের দৃশ্য। মহাপুরুষ বাসুদেব শাস্ত্রীর উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে দেখি। লবণব্যবসায়ী ক্যারাপিট আরটুনের মর্মন্তুদ কাহিনীও কয়েকটি অধ্যায়ে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবপ্রাণতার বিশুদ্ধি ছিল না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের দ্বারা নিন্দিত ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণবসমাজই তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এই 'মর্কট বৈরাগ্য' চণ্ডীচরণের সমালোচনার স্থল হয়েছে। আখড়াগুলি তখন বৈষ্ণবদের ব্যভিচারের কেন্দ্র। সাবিত্রীর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে সাধনসঙ্গিনী করার যে বীভৎস চিত্র লেখক দেখিয়েছেন তাতে আতিশয্য থাকলেও সত্যের বিশেষ অপলাপ আছে বলে মনে করি না। ছিদাম বিশ্বাসের স্ত্রীর ঘটনাটি যৌবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচায়ক। বিধবার করুণকাহিনী প্রকাশ করেছেন সুদক্ষিণার মৃত্যু বর্ণনায়। সামাজিক কৌলীন্য রক্ষা করবার জন্যে সুদক্ষিণার পিতা কন্যার হাতে বিষ তুলে দিতে দ্বিধা করেন না। উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তন্তুবায়, লবণব্যবসায়ীর দুরবস্থার যে চিত্র লেখক উপস্থাপিত করেছেন তা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। অর্থলোভ কোম্পানির কর্মচারীদের ধাপে ধাপে পঙ্কিলতার স্তরে নামিয়ে আনছিল। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—

> It has been said that after Plessy the world was let loose upon the English Company's servants in India and they were let loose upon the world with all the persons that despotism could give. Clive set ball rolling. He substituted easy wealth for the slow return of commerce. * * Money! Money! and no time to be lost.[১]

এ থেকেই সৃষ্টি হল মধ্যস্থ ব্যক্তি। এদের সাহায্যেই ইংরেজ শোষণযন্ত্র অব্যাহত গতিতে চলল। রামহরি, ছিদাম বিশ্বাস, মদন দত্তের ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা এখানে।[২] রমেশচন্দ্র দত্তও ইংরেজ বাণিজ্যের এই স্বরূপটিকে তুলে ধরেছেন। চণ্ডীচরণ বলেছেন—

১ N. K. Sinha, *Economic History of Bengal, Vol-I*

২ Private trade of the company's servants was a much more important source of wealth than even the receipt of presents. The gomostas or Indian Agents no doubt intercepted much of this ill-gotten wealth.— N. K. Sinha, *Economic History of Bengal, Vol-I*

> তাহাদের (মুসলমানদের) অত্যাচারের একপ্রকার অসভ্যোচিত নিষ্ঠুরতা মাত্র। কৌশল পরিপূর্ণ প্রণালীবদ্ধ অত্যাচার, পণ্যদ্রব্যের একাধিকার সংস্থান পূর্ব্বক বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত প্রদান, নানাবিধ চক্রান্ত দ্বারা প্রজাসাধারণের অর্থশোষণ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা মুসলমান রাজত্ব কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।

এই কুপ্রথা বর্ণনই গ্রন্থে আদ্যন্ত বিস্তৃত। পরাধীনতার বেদনা চণ্ডীচরণকে পীড়িত করেছিল। কিন্তু সেজন্য কেবল জাতিবৈরিতাকেই তিনি একমাত্র সমাধান মনে করেন নি।

> বঙ্গবাসীদিগের স্বার্থপরতা সম্ভূত কাপুরুষতা বাঙ্গালীদিগের পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব ইংরাজদিগের এইরূপ অবৈধ সংস্থাপনের মূল কারণ।

নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? অদৃষ্ট? নিয়তি? লেখক গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন হলধরের পুত্রকে গ্রহণ না করার জন্যই নন্দকুমারের পতন। এ ব্যাখ্যায় বিশেষত্ব কিছু নেই। চাকুরীজীবী বাঙালিজাতির প্রতি লেখকের উক্তি লক্ষণীয়।

> বাঙ্গালী জাতি চাক্‌রীর নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত...চাক্‌রী বাঙ্গালীর প্রাণ, চাক্‌রী বাঙ্গালীর জীবনসর্ব্বস্ব চাকুরী একমাত্র উপাস্য দেবতা।

হিন্দু বিধবাদের উপর লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' এর প্রতিবাদও করেছিলেন। তবে এই ধারণাটি উপন্যাসে আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয় নি। নীলদর্পণের মতো উপন্যাসটিতে ঘন ঘন মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সুদক্ষিণা, শ্যামা, সাবিত্রী, ক্যারাপিট আরটুনের পত্নীর কাহিনী বর্ণনাপ্রণালী একরূপ।

মহারাজ নন্দকুমারে যে-সমস্ত চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাই তাদের বংশধর লেখকের পরিচিত ছিল। সুতরাং মহারাজ নন্দকুমারে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে বলে অনুমান করি। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ অনেক সময়েই রচনাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। সাবিত্রীর পলায়নের দৃশ্যটি আঙ্কল টমস কেবিনের ইলাইজার পলায়নের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখদুর্দশার বর্ণনা যে 'টমস কেবিনে'র আদর্শে রচিত সে কথা বলার অবসর রাখে না।

উপন্যাস হিসেবে মহারাজ নন্দকুমার ব্যর্থ রচনা হলেও এই উপন্যাসগুলিই ইতিহাস-চর্চার পথটিকে সুগম করে দেয়। তা ছাড়া স্থূলতা লক্ষিত হলেও এই বর্ণনার বাস্তবতা সে-যুগের পাঠককে মুগ্ধ করেছিল। বইটি যে সেকালে পাঠককে মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ আছে।

আরো একটি কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট কদর। বাংলার বাণিজ্যের দুর্গতি চণ্ডীচরণের বইতে দেখি। বাংলার বাণিজ্যের এই দুরবস্থাই হয়তো অনেককে ব্যথিত করেছিল। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রেরণাও কেউ কেউ পেয়েছিলেন চণ্ডীচরণের বই পড়ে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

মহারাজ নন্দকুমারের পর চণ্ডীচরণ লিখলেন দেওযান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬)। মহারাজ নন্দকুমারের প্রসঙ্গও দেওযান গঙ্গাগোবিন্দে উল্লেখ আছে। গঙ্গাগোবিন্দের বিচিত্র কাহিনী অবলম্বন করে এ উপন্যাসটি রচিত। ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনই চণ্ডীচরণের মূল লক্ষ ছিল। দেশে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিহাস-বোধের অভাব দেখে লেখক খেদ প্রকাশ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। একই সময়ের ঘটনা বলে মহারাজ নন্দকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ঘটনাগত মিল দেখা যায়। তবে মহারাজ নন্দকুমারে দেশের ভেদবৈষম্যকে তুলে ধরবার চেষ্টা দেখি আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে। অবান্তর বিষয়। যথাসাধ্য পরিহার করবার চেষ্টা আছে এই উপন্যাসে। মহারাজ নন্দকুমারে কাহিনীর পূর্বাপর সঙ্গতি নেই, চরিত্রবিশ্লেষণ নেই। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে এ দোষ কিছুমাত্রায় পরিহার করা হয়েছে।

লেখক ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন বার্কের বক্তৃতাবলী, পিটার্সনের রিপোর্ট, গ্লেজিয়ারের বিবরণ, হেস্টিংসের বিচারের দলিল দস্তাবেজ, গুডল্যাড সাহেবের রিপোর্ট এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে লিখিত ইংরেজ কর্মচারীদের পত্রাবলী থেকে।

লক্ষণীয়, লেখক যে রংপুরের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন তার ইতিহাস ইতিপূর্বে কবি রতিরামের 'জাগ গানে'র রাস অংশে পেয়েছি। রতিরাম বলেছেন, 'রাজার পাপেতে হৈলো মুলুক আকাল। শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল'। দেবীসিংহকে কবি এইভাবে এঁকেছেন—

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মুলুকেতে হৈল বার ঢিং॥
যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহণ॥[১]

চণ্ডীচরণের প্রধান উপজীব্য রংপুরের বিদ্রোহ। মহারাজ নন্দকুমারের সাফল্যে লেখক উৎসাহ বোধ করেছিলেন। ভূমিকায় বলেছেন, 'বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিবার বিলক্ষণ রুচি জন্মিয়াছে'। একটু পরে বলেছেন, 'এই উপন্যাসের উল্লিখিত প্রায় সমুদয় ঘটনাই সত্য'।

চণ্ডীচরণ সেন গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায়ের শিরোনামায় নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র একটি অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন। তিনি গ্রন্থে সিরাজদ্দৌলা, রেজা খাঁর পাপাচরণের কথা বলেছেন, ইংরেজ কলঙ্ককালিমাকেও বিস্তৃত করেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এতটা ইংরেজ সমালোচনা পাই না।

কিন্তু লেখক রচনারীতিতে বঙ্কিমের বিপরীত পথ অবলম্বন করেছেন। রংপুর অঞ্চলে দেওয়ানের এবং দেবীসিংহের অত্যাচার গ্রন্থটিতে বিস্তৃত হয়েছে।

উপন্যাসের নাম দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। কিন্তু দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের বর্ণনা প্রধান নয়। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রায়ই নেপথ্যে থেকে গেছে। বার্কের উক্তি সত্য হলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে নিয়ে একটি চমৎকার চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব ছিল।[২] ইতিহাসে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের অনেক সৎকার্যের বিবরণও আছে।[৩] সম্ভবত লেখক সেজন্য এই ভাবটিকে অবিকৃত রাখবার জন্যে দেওয়ানের অনুশোচনার অংশটিকেই প্রধান করেছেন।

সত্যবতী রোমান্টিক চরিত্র। তার মধ্যে একটা অসামান্যতার ছাপ আছে। তার নানকুতে রূপান্তর কতকটা অবিশ্বাস্য ঠেকে। কমলাদেবীর চরিত্রে দেবী চৌধুরানীর ক্ষীণ আভাস লক্ষিত হয়।

বিদ্রোহকে লেখক কেন বিস্তৃত করেন নি তা বলা দুষ্কর। তবে বিদ্রোহের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে তিনি আস্থাবান।

১ ঘটনার ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা' গ্রন্থে।

২ বার্ক বলেছেন, a name at the sound of which all India turns pale—the most wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever the rank servitude of that country.

৩ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ

> এই ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ যাঁহারা সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিয়াছেন, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে। ভাবী বংশাবলী তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া অর্চনা করিবেন। এই অনিত্য দেহ সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ যাঁহারা বিসর্জন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেবতা।

এ দেবসদৃশ মানবের বিদ্রোহ গ্রন্থে নেই। নীলদর্পণ নাটকে যেমন অত্যাচারের দিকটি একতরফা হওয়াতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার তীব্রতা হারিয়েছে সেরকম চণ্ডীচরণের রচনায়ও প্রতিপক্ষের নীরব সহনশীলতা ঘটনাটিতে বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম হয়েছে।

দেবীসিংহের কারাগারের বিভীষিকাময় বর্ণনায় বাস্তবতা লক্ষণীয়। লেখকের সমালোচনা তীব্র হলেও আন্তরিকতায় তা আমাদের স্পর্শ করে।

> ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিক অর্থের প্রয়োজন। কৃষককে সর্বস্ব প্রদান করিতে হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে, ধর্মশিক্ষা প্রদানার্থ অতি উচ্চ বেতনে বিশপ নিযুক্ত করিতে হয়, রাজস্বআদায় নিমিত্ত গুড্‌ল্যাডের ন্যায় উপযুক্ত কালেক্টর এবং দেবীসিংহের ন্যায় উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হয়। শান্তিরক্ষক এবং বিচারক নিযুক্ত করিতে হয়, কৃষক তাহার যথাসর্বস্ব প্রদান করিয়া ইহার ব্যয় বহন না করিলে দেশ শাসনের ব্যয় কিরূপে চলিবে? কৃষক কেবল অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া অর্থসঞ্চয় করিবে; কিন্তু তাহার শ্রমোৎপন্ন ফলে তার নিজের কোন অধিকার নাই।

পরে বলেছেন—

> সংসারে এই যদি ন্যায়বিচার হয়, তবে চোরকে কেন নিন্দা করি? যদি বিচারক, শান্তিরক্ষক এবং ধর্মশিক্ষার্থ লর্ড বিশপ ইত্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, প্রজাদিগকে একেবারে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবে সে বিচারক, সে শান্তিরক্ষক, সে লর্ড বিশপ নিযুক্ত না করিয়া, প্রজাদিগকে চোর ডাকাইতের হাতে সমর্পণ করিলেই তো ভাল হয়।

আমাদের মনে হয় এই ইংরেজ সমালোচনাই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। রানী ভবানীর চকিত পরিচয় উজ্জ্বল। রানী ভবানীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রেমানন্দের পত্রে শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব ব্যক্ত। প্রেমানন্দের পত্র আংকল টমস কেবিনের জর্জ হ্যারিসের পত্রের কথা অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়।

অযোধ্যার বেগম

মহারাজ নন্দকুমার এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পর চণ্ডীচরণের দৃষ্টি পড়ল অযোধ্যার উপর। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার বেগম প্রথম খণ্ড

(২য় খণ্ড ১৮৮৬, ১৫ ডিসেম্বর) লিখলেন। এ বইটিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত। হেস্টিংসই তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার। বিষয়বস্তু অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে হলেও বাঙালি চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় উপন্যাসটিতে আছে।

লেখক আইনব্যবসায়ী হওয়াতে গ্রন্থের মধ্যে বিচারবিভাগীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। লেখকের দারিদ্র্যও ছিল অপরিসীম। ডায়েরিতে তিনি লিখেছেন—

> গত কয়েকমাস আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে হয়, ভবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত, আমি এত দিনে পাগল হইয়া যাইতাম। ভবিষ্যতে কি আছে জানি না, তবে যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

অযোধ্যার বেগমে এই দারিদ্র্যের জ্বালা এবং ঈশ্বরানুরক্তির প্রকাশ দেখি। লেখকের অদম্য পাঠস্পৃহা এবং জ্ঞানতৃষ্ণা তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। এজন্য তথ্যবিকৃতি তাঁর উপন্যাসে বিশেষ নেই। বরং স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পাদটীকায় লেখক আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। যশোবন্তনামা, আবুতালিবের ইতিহাস, বার্কের বক্তৃতাবলী, জেম্‌স মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকের অবলম্বন ছিল।

অযোধ্যার বেগমের প্রথম খণ্ডে ইংরেজের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ডে তার পরিণাম। কাহিনীর তিনটি সূত্র। এক অযোধ্যার বেগম, দুই চৈৎসিংহ গোলাপকুমারী, তিন বাণেশ্বর অমরসিংহ আখ্যায়িকা। কাহিনীগুলির যোগ দৃঢ় নয়— শিথিলবদ্ধ।

হেস্টিংসের চক্রান্তে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের উপর অত্যাচার করেন। সুজাউদ্দৌলার রাজ্যলোভ তাঁর বিপদ ডেকে আনে। ইংরেজের ক্রমাগত অর্থের দাবি মেটাতে না পেরে তিনি হেস্টিংসের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। নারীনির্যাতনে এবং জঘন্য লালসাতে তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর পত্নী বউবেগমের পুত্র নবাবী পায়। ইংরেজেরা পুত্রকে দিয়েই বউবেগমের উপর অত্যাচার করে। পরে অবশ্য এ অত্যাচার প্রকাশিত হয়। বউবেগম পুনরায় জায়গীর ফিরে পান। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বাংলার নবাবমহিষী মীরণের মাতা জগদম্বা বেগমের করুণ কাহিনী।

বারাণসীর স্বাধীন রাজা যশোবন্ত। তার পত্নী গোলাপকুমারী।

শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা পূর্ণিমা বা পান্নার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে রাজা তাকে বিবাহ করেন। গোলাপকুমারী পূর্ণিমার প্ররোচনায় অন্তঃপুর ত্যাগ করলে। পূর্ণিমার পুত্র চৈৎসিংহ। চৈৎসিংহের রাজ্যে ইংরেজ প্ররোচনাতে অসন্তোষ দেখা দিলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়। অবশ্য সে বিদ্রোহ অতি সহজেই নির্বাপিত হয়।

তৃতীয় কাহিনীটি হচ্ছে বাণেশ্বর অমরসিংহ ইত্যাদিকে নিয়ে। অমরসিংহ বাণেশ্বরের পুত্র। বাংলার নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত এই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অমরসিংহ (আসল নাম ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য) অযোধ্যায় এসে পড়ে। রোহিলাদের উপর অত্যাচার করে হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে যখন সুজাউদ্দৌলা হরণ করে হারেমে নিয়ে আসে তখন অমরসিংহ বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে বারাণসীর যুদ্ধে যোগ দিয়ে সে বীরত্ব প্রদর্শন করে। বারাণসীতে সকলে মিলিত হলে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাহিনীগুলির মধ্যে যোগসূত্র নেই। ইংরেজ-অত্যাচারের তিনটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ হিসেবে এই কাহিনীগুলিকে ধরা যেতে পারে। কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের কূটনীতি দেখাবার। সমস্ত বাঙালি পরিবারের মিলনদৃশ্যটি সহজ সমাধানপ্রবণতার সাক্ষ্য। বিশেষত প্রাচীরগাত্রে অমরসিংহের হাফেজ-নন্দিনীর (এর নাম ইতিহাসে নেই বলে লেখকও দেন নি। তথ্যপ্রীতির এই এক উদাহরণ) নাম লিখে রাখা এবং বাণেশ্বরের পুত্রের হস্তাক্ষর চিনতে পারার মধ্যে ভাবালুতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

নীতিপ্রবণতাও দুর্লক্ষ্য নয়। জগদম্বা বেগমের চরিত্র অপরিস্ফুট—আদর্শবাদের স্বাক্ষর। লেখকের উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সুজাউদ্দৌলা, চৈৎসিংহ, আসফউদ্দৌলা সকলেই বিধাতার অমোঘ নিয়ম 'উল্লঙ্ঘন' করেছে বলেই তাঁদের এই 'প্রায়শ্চিত্ত'। এতে গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে করি। বউবেগম এবং জগদম্বা বেগমের কথোপকথন অনেকটা গুরুশিষ্য সংবাদের মতো। লেখক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করে নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এরই প্রত্যক্ষফল দেখি উপন্যাসে। বউবেগমের অনুশোচনা একজন পাপীর কনফেশন।

সমসাময়িক উপন্যাসের প্রতি লেখকের বিশেষ আস্থা ছিল না। উপন্যাসে

প্রেমের অবতারণা তাঁর দৃষ্টিতে বিকৃত হয়েছে। একজন নবীনানন্দ স্বামী বলে যার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে তার লক্ষ্য মনে করি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ-মঠের নবীনানন্দ। আসল কথা উপন্যাসের কাহিনীরসের প্রতি লেখক মনোযোগ দেন নি। উপন্যাসটির বিশিষ্টতার কথা বলি—

ইংরেজ বণিকেরা এদেশে যে সুচিন্তিতভাবে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় Cotton এর স্বীকারোক্তিতে। তিনি বলেছেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতশাসননীতি গ্রহণ করেছিল Torquinius Superbius এই নীতি থেকে। হেনরি কটনের এই স্বীকারোক্তির পরে আমরা বুঝতে পারি রোহিলাদের উপর অত্যাচার কতটা পাশবিক। মিল, বার্ক, মেকলে প্রত্যেকেই এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। রোহিলাদের উপর অত্যাচার প্রসঙ্গে মেকলে বলেছেন, Then the horrors of India was let loose upon the fair valleys and cities of Rohilakhand। প্রায় কুড়ি হাজার রোহিলাকে নির্বাসিত করা হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে রোহিলাদের কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না। এরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। অযোধ্যার সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনীও চণ্ডীচরণ সেন বর্ণনা করেছেন। হাফিজ রহমত খানের কন্যার প্রসঙ্গ অবশ্য পাই না। কিন্তু এই কাহিনীটি উপন্যাসের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। চণ্ডীচরণের স্বদেশপ্রেরণার সুন্দর দৃষ্টান্ত হাজিফ রহমত খানের শৌর্যবীর্য বর্ণনার মধ্যে রয়েছে। গ্রন্থটির আকর্ষণ এইখানে।

বেগমদের উপর অত্যাচারের মর্মন্তুদ দৃশ্যটি তিনি ইতিহাস থেকেই পেয়েছেন। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে করার কারণ নেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য—

> And their eunuchs were compelled by imprisonment, starvation and threat, if not actual infliction, of flogging, surrender the treasure in December, 1782

চৈৎসিংহের কাহিনী ইতিহাসসম্মত। তবে চৈৎসিংহের কাপুরুষতার জন্যই বিদ্রোহদমনের সুবিধা হয়েছিল এ ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই। বাঙালিবীরের বিদ্রোহে যোগদানও লেখকের কল্পনাপ্রসূত। এই বিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে অযোধ্যার রেসিডেন্ট বলেছেন— **the present insurrection is said believed to be an intention to expel the English.** লেখক চৈৎসিংহের কাপুরুষতা দেখিয়ে বিদ্রোহের স্বরূপধর্মকে অবহেলা করেছেন।

মীরকাশিম যে সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা। এ উপন্যাসেও অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচারের মর্মন্তুদ বর্ণনা পাঠককে আকৃষ্ট করে।

ঝান্‌সীর রানী

ঝান্‌সীর রানী প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে। নামপত্রে এটিকে *A Historical Romance* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাসটি পরিকল্পিত। রজনীকান্ত গুপ্তের সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১ম খণ্ড ১৮৭৬) ইতিপূর্বে বার হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত আরও কয়েকটি উপন্যাসও ইতিপূর্বে পেয়েছি। চণ্ডীচরণের এই গ্রন্থের নায়িকা ঝান্‌সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।

সে সময়ে লভ্য সিপাহীবিদ্রোহের সকল ঐতিহাসিক উপাদানই চণ্ডীচরণ কাজে লাগিয়েছেন। ইংরেজদের দৃষ্টিতে কিছু তথ্যবিকৃতি আছে। সিপাহী-বিদ্রোহে রানীর যোগ ছিল— এইটি ইংরেজদের মত। ঝান্‌সীর রানী সম্বন্ধে ইংরেজের এই প্রতিকূল ধারণা নিরসন করে ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার করা চণ্ডীচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রানী লক্ষ্মীবাঈ যথার্থ বীরাঙ্গনা। পরাধীন ভারতে এঁকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। অতএব 'লক্ষ্মীবাঈর চরিত্রেব এই বৃথা কলঙ্ক নিরাকরণার্থ ঝান্‌সী বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনপূর্বক' চণ্ডীচরণ এই উপন্যাসটি রচনা করলেন। তবে 'উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রহিয়াছে'।

হোলকার সম্বন্ধেও ইংরেজের বিরূপ মনোভাব বর্তমান। সেইটি নিরসন করার অঙ্গীকাবও লেখক গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত নানাসাহেবের সমালোচনা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাঁতিয়া তোপির বীরত্ব লেখককে মুগ্ধ করেছিল। এ ছাড়া আছে একটি অনৈতিহাসিক কাহিনী। ত্র্যম্বক-যোগিরাজ-গঙ্গাবাঈ আখ্যায়িকা। শেষোক্ত আখ্যায়িকার উপর লেখক গুরুত্বও আরোপ করেছেন বেশি। সিপাহী বিদ্রোহ সর্বজনবিদিত ঘটনা। লেখকও তথ্যসমাবেশ করেছেন বিস্তৃতভাবে। এখানে বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই।

চণ্ডীচরণের দৃঢ় ধারণা ছিল জাতির অধঃপতনের জন্যেই ভারতবাসীর এই লাঞ্ছনা গঞ্জনা। যোগেশের জবানিতে লেখক হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁতিয়া তোপি বীর কিন্তু তাঁর পতন অনিবার্য। কেননা তাঁর শত্রু তিনটি।

ঘৃণিত হিন্দুসমাজ প্রচলিত দেশাচার তাঁহার প্রধান শত্রু, তাঁহার জননী তাঁহার দ্বিতীয় শত্রু, এবং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার তৃতীয় শত্রু।

এই ত্র্যহস্পর্শের তাড়নায় তাঁতিয়া তোপির অধঃপতন। তাঁতিয়ার জননীকে শত্রু বলার কারণ তাঁতিয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর মাতার তাঁকে বিবাহপ্রদান। গঙ্গাবাঈর ক্ষেত্রে হিন্দুমেয়ের বাল্যবিবাহের পরিণাম দেখি। এ দুটি ঘটনাই শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় বহন করছে। লক্ষণীয় লেখক ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের দলভুক্ত ছিলেন। উপধর্মের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন রাধাকান্তদেবের প্রতি কটাক্ষ করে। ইংরেজদের যুদ্ধে জয়লাভ করার কারণটি লেখকের কাছে সুস্পষ্ট।

ইহাদিগের (ইংরেজের) রাজ্য রক্ষার প্রকৃত দুর্গ কি শুনিবে? এই যে শিবের মন্দিরে বসিয়া আমরা কথা বলিতেছি, ঈদৃশ শত শত দেব দেবীর মন্দিরই ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃত দুর্গ, আর আমাদের দেশপ্রচলিত জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথা ইহাদিগের বর্ম এবং চর্ম, দেশব্যাপিনী অজ্ঞানতাই ইহাদিগের একমাত্র সৈনাধ্যক্ষ। লর্ড ক্লাইব, লর্ড লেক কিম্বা লর্ড নেপিয়া কর্তৃক কি ভারত পরাজিত হইয়াছে? ভারতবাসিদিগের নৈতিক দুর্বলতা এবং বিবিধ কুৎসিৎ আচার ব্যবহারই তাঁহাদিগের পরাজয়ের একমাত্র কারণ। সুতরাং আমাদের নৈতিক দুর্বলতাই ইংরেজদিগের বল।

রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে চণ্ডীচরণের মতামত বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকা সত্ত্বেও লেখক তাঁকে বিদ্রোহী বলেন নি। এ বিষয়ে লেখকের সত্যনিষ্ঠা এবং দূরদর্শিতা প্রশংসা পাবার যোগ্য। সম্প্রতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রানীর বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহীরাই রানীকে জোর করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। রানী এর পর ইংরেজের সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। ইংরেজের প্রথমে সহানুভূতি থাকলেও পরে রানীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। উপায়ান্তর না দেখে রানী যুদ্ধে অগ্রসর হন। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন রানীর প্রকৃত মর্যাদা নির্ভর করছে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে— অন্য কিছুতে নয়।[১]

১ It should be remembered that her real greatness lies in her heroic conduct after she decided to fight against the English, which has secured

নানাসাহেবের প্রতি লেখক সুবিচার করতে পারেন নি। ইতিহাসে নানাসাহেবের এতটা হীনবর্ণ চিত্রিত নয়।

আজিমউল্লা ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নিঃসন্দেহে একজন আকর্ষণীয় পুরুষ। তার প্রেমকাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ ইতিহাসে বর্ণিত।[২] সম্ভবত চণ্ডীচরণ এই ইতিহাসের উপর ভিত্তি করেই চরিত্রটির মধ্যে কিছুটা কৌতুকরসের জোগান দেবার চেষ্টা করেছেন। ত্র্যম্বক-যোগিরাজ কাহিনীর আতিশয্য আগেই লক্ষ করেছি। বিশেষত ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর মুরগীর রোস্ট ইত্যাদি খাবার দৃশ্যটি সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। সিপাহী বিদ্রোহে এক নামহীন বাঙালি যুবকের পরিচয় আছে। অবিনাশ সম্ভবত সেই বাঙালি যুবক। লেখক বলেছেন যোগিরাজ রাজনৈতিক আনন্দাশ্রম স্বামী নন। উপসংহারে তিনি বলেছেন, ঝান্‌সীর রানী দ্বিতীয় খণ্ডে 'যোগিরাজের দৈনিক পুস্তক' অথবা *India under the Crown* নামে একখানি বই লিখবেন। কিন্তু সেইটি আর লেখা হয় নি।

এই কি রামের অযোধ্যা

ঝান্‌সীর রানীর সাত বৎসর পর ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে চণ্ডীচরণের শেষ উপন্যাস এই কি রামের অযোধ্যা বার হয়। বলা বাহুল্য, অযোধ্যার উপরে চণ্ডীচরণের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই কারণে শেষোক্ত বইখানিও অযোধ্যাকে নিয়ে রচিত।

চণ্ডীচরণের পাঁচখানি উপন্যাসের একটি যোগসূত্র আছে। ঝান্‌সীর রানীকে বাদ দিলে সবগুলি উপন্যাসেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার দেখানোই চণ্ডীচরণের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইটি বহিরঙ্গ। সিপাহীবিদ্রোহের দূরবর্তী কারণ হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনই যে মূলত দায়ী এইটি প্রমাণ করাই লেখকের মূল অভিপ্রায়। এই কি রামের অযোধ্যায় চণ্ডীচরণ এই ইঙ্গিত করেছেন। চণ্ডীচরণের ইতিহাসবোধের এই বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।

her a high place in the history of India, and we need not rely on something unsupported by any testimony and opposed to reliable evidence to establish or buttress her claim to greatness—R. C. Majumder, *The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857*

২ R. C, Majumder, *The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857*

সম্প্রতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহীবিদ্রোহের কারণস্বরূপ *The Mutiny and Revolt of 1857* এ তিনটি পরিচ্ছেদে এই-সকল ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশে অসন্তোষ পূর্ব থেকেই ছিল। দেবীসিংহের বিরুদ্ধে রংপুর বিদ্রোহ, অযোধ্যার প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ, হাফিজ রহমৎ খানের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, চৈৎসিংহের বিদ্রোহ, নারায়ণ কুমারীর সংগ্রাম— এ সবই সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব সূচনা। আধুনিক ঐতিহাসিকের সঙ্গে চণ্ডীচরণের এই সাধর্ম্য গভীর প্রশংসার উদ্রেক করে। এই কি রামের অযোধ্যায় জগন্নাথ শাস্ত্রী বলেছেন—

> মুসলমান রাজস্ব বিলোপের অব্যবহিত পরে অযোধ্যায় ঘোর বিদ্রোহানল সমুপস্থিত হইবে। সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ বিনষ্ট হবে।

এ কথা ঠিক, চণ্ডীচরণ দেশীয় নবাব-দেওয়ানকেও অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বৈত শাসননীতিই যে দেশের অরাজকতার মূলে সে কথা বলতে লেখকের দ্বিধা হয় নি।

এই কি রামের অযোধ্যাও পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির মতো অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী। পরিশিষ্টে লেখক ঐতিহাসিক উপাদান সংকলন করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত লেখক ঠগী অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিপূর্বে গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণে এই ঠগীকাহিনী বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

কাহিনীর বিশেষত্ব কিছু নেই। জগন্নাথ শাস্ত্রী চরিত্র অঙ্কনে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। অযোধ্যানাথও নীতির বাহক। পাবাহারী বাবা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অযোধ্যানাথই পাবাহারী বাবা। নারায়ণ কুমারী ঝান্সী রানীর ছাঁদে অঙ্কিত।[১]

১ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত *The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857* এবং Kaey র উদ্‌ধৃতিগুলি অযোধ্যাশাসননীতি জানবার পক্ষে বিশেষ কাজে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বউঠাকুরানীর হাট

রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। উপন্যাসটিতে স্পষ্টত বঙ্কিমের প্রভাব আছে। বিষয়বস্তুও মৌলিক নয়। ইতিপূর্বে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে বাংলায় কয়েকখানি বই লেখা হয়েছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র, হরিশ্চন্দ্রের সাগর দ্বীপের শেষ স্বাধীন রাজা[১], প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বউঠাকুরানীর হাটের 'সূচনা'য় বলেছেন, তিনি সে যুগে লভ্য প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা সমস্ত বইই পড়েছিলেন। তবে বউঠাকুরানীর হাটের প্লটের জন্য তিনি সর্বাপেক্ষা ঋণী বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাছে। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বউঠাকুরানীর হাট লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ড দেখবার সুযোগ পান নি। বউঠাকুরানীর হাটের উৎস বিচার করতে গেলে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডকেই গ্রহণ করতে হবে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ[২] ছিলেন রায়গড়ের অধিবাসী। এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে তিনি অনেক দিন কাজ করেছিলেন। পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহও ছিল প্রচুর। এর প্রমাণ পাই এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এঁর প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে। প্রতাপচন্দ্র বঙ্গাধিপ পরাজয় লেখবার জন্য প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বহু উপাদান সংগ্রহ করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরেও সেখানকার জনশ্রুতিগুলি তিনি আহরণ করেছিলেন। তবে মূল উপাদান পেয়েছিলেন ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত[৩] থেকে। বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রথম খণ্ড

১ প্রতাপচন্দ্র বইটির উল্লেখ করেছেন। এ বইটিও প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত—রামরাম বসুর বইয়ের সার সংকলন। প্রতাপাদিত্যের কোনো কোনো জীবনীকার এ বইটির অবশ্য উল্লেখ করেছেন।

২ দ্রষ্টব্য, শ্রীসুকুমার সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুনশ্চ' অংশ।

৩ W. Pertschএর সম্পাদনায় বার্লিন থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের কিছু অংশ প্রতাপচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সংকলন করেছেন।

বেরোবার পর আরও কিছু তথ্য *Proceedings of the Asiatic Society*-তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এগুলি পড়েছিলেন। পর্তুগীস লেখকের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ গ্রন্থও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের গোচরে এসেছিল।

বঙ্গাধিপ পরাজয়কে প্রতাপচন্দ্র বলেছেন Historic Romance, তিনি ইতিহাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে যথাসম্ভব কল্পনার জাল বুনেছেন। তথাপি বঙ্গাধিপ পরাজয়ের লেখক কল্পনা অপেক্ষা তথ্যের মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। যার জন্য ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

> নির্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র না হইয়া কেবল একমাত্র স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল।

এই 'স্বভাব' বলতে লেখক ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা জোর করে বলা শক্ত। তবে পূর্ববর্তী উপন্যাসের আদর্শ থেকে লেখক তাঁর গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য দাবি করেছেন— এইটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে লেখক এই লাইনটি তুলেছেন— অত্রাপ্যুদাহরন্তীমিমং ইতিহাসং পুরাতনম্। এখানে ইতিহাস অর্থে প্রতাপচন্দ্র ইংরেজি History শব্দকেই বুঝিয়েছেন। বলা বাহুল্য, প্রতাপচন্দ্রের গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা নেই।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। প্রতাপাদিত্য বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভুঁইঞা। তিনি পাঠানদের সহায়তায় মোগল রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন ঠিক করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আরাকান-রাজের ভ্রাতা অনুপরামকে আশ্রয় দেন। পর্তুগীস দস্যু সেবাস্টন গঞ্জালিসের সাহায্যে তিনি এক দিকে যেমন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলেন তেমনি অন্য দিকে তাঁর বিভিন্ন চক্রান্তে তিনি গঞ্জালিসকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর থেকে। রাজা বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কচু রায় কি করে বঙ্গেশ বিজয়[১] করলেন তারই কাহিনী হচ্ছে বঙ্গাধিপ পরাজয়।

১ বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ড বের হয় 'কাব্য প্রকাশ যন্ত্র' থেকে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই প্রেসে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানি বই ছাপা হচ্ছিল। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ের নামও ছিল 'বঙ্গেশ বিজয়'। কালীপ্রসন্ন সিংহ ইত্যাদির অনুরোধে তিনি 'বঙ্গেশ বিজয়ে'র নামের পরিবর্তে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' রাখলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অপর গ্রন্থ বঙ্গেশ বিজয় প্রকাশিত হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে তার বিষয়বস্তু এবং লেখক কী ও কে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এ বইটিও কি প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে লেখা?

প্রতাপাদিত্যের রাজ্য আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তিনি রায়গড়কেও নিজের শাসনে আনতে চেয়েছিলেন। বসন্তরায়ের পালিত জয়ন্তীরাজতনয়া ইন্দুমতীর প্রতি প্রতাপ প্রেমাসক্ত হন। ইন্দুমতী কচু রায়ের বাগদত্তা। প্রতাপাদিত্য ইন্দুমতীকে জোর করে নিয়ে আসবার জন্য সেবাস্টন গঞ্জালিস, কৃষ্ণনাথ, হুজুরমল, অনুপরাম ইত্যাদিকে পাঠালেন রায়গড়ে। রায়গড়ের বৃদ্ধমন্ত্রী ছিলেন অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল অর্থলোলুপ, অকর্মণ্য। সুতরাং প্রতাপের চক্রান্ত সহজেই সফল হতে পারত। কিন্তু তাঁর চক্রান্তে বাদ সাধলে তাঁরই মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণের পুত্র মালিকরাজ ও জয়ন্তীরাজপুত্র সূর্যকুমার। মালিকরাজ ও সূর্যকুমার চলে গেল রায়গড়ের দুর্গের দিকে ইন্দুমতীকে রক্ষা করবার জন্যে। এই সময়ে মানসিংহও তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রতাপকে জব্দ করবার জন্যে রায়গড়ের দুর্গে উপস্থিত হলেন। কচু রায় ছদ্মবেশে (বর্মাবৃত পুরুষ) রায়গড়ের দুর্গে এল। কচু রায়, মালিকরাজ, সূর্যকুমার ইত্যাদি রায়গড়ের সৈন্য নিয়ে প্রতাপের সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রথমবারে পরাজিত হলেও দ্বিতীয়বারে কচু রায়ের জয় হল। প্রতাপ সংবাদ শুনে রায়গড়ে এলেন; কিন্তু তিনিও কচু রায়ের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। গ্রন্থের উপসংহারে মানসিংহ কচু রায়কে বললেন—

> কচু রায়! বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড় তোমার, দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমায় অধিকারী করিলাম।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের শেষ জীবন বর্ণিত হয়েছে।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ে আরও কতগুলি ঘটনা আছে। যেমন, সূর্যকুমার ও প্রতাপাদিত্যের কন্যা সরমার, মালিকরাজ ও মালতীর, বরদাকান্ত-অরুন্ধতীর প্রেমকাহিনী। মালতী সরমার সহচরী, অরুন্ধতী পলায়িত আরাকানী অনুপরামের ভগ্নী।

রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী দেবীকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' পড়ে শোনাতেন। এই কারণে বউঠাকুরানীর হাটে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র মিল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র সঙ্গে বউঠাকুরানীর হাটের পার্থক্যও প্রচুর। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে বসন্তরায়ের প্রসঙ্গ থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গ্রন্থের আরম্ভ। বউঠাকুরানীর হাটে বসন্তরায় একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। প্রতাপচন্দ্রের বইয়ে পর্তুগীস, মগ দস্যুদের অত্যাচার কাহিনী অনেকখানি জায়গা জুড়েছে। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের গ্রন্থ থেকে,

Raainey, Blochmann ইত্যাদির বর্ণনা থেকে তিনি পর্তুগীজ, মগদের সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। প্রতাপচন্দ্র বলেছেন—

It is generally supported that Portuguese piraay and Mug incursions in the 16th century devasted the whole country.

রায়গড়ের ইন্দুমতী, অনঙ্গপালের কন্যা প্রভাবতী এবং অনুপরামের ভগ্নীর উপর পর্তুগীজদের অত্যাচার প্রতাপচন্দ্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। বউঠাকুরানীর হাটে রামচন্দ্র রায়ের দরবারে ফার্ণাণ্ডিজের উল্লেখ ছাড়া আর কোনো কথাই পাচ্ছি না। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপাদিত্য চরিত্র বউঠাকুরানীর হাটের মতো নয়। এখানে 'প্রতাপাদিত্য উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কেবল পাপকর্মে লিপ্ত নয়। প্রতাপাদিত্যের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা (প্রথম সংস্করণের ৫০২ পৃষ্ঠায় [১] লেখক বিস্তৃতভাবে বলেছেন।[২] বিজয়কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন,

আমাদিগের দেশ, আমাদিগের ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল, আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি ম্লেচ্ছযবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে। এ কেমন কথা?

একটু পরের উক্তি—

বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও জান আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক সাহসী, অধিক বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত আমার ভয়ের পাত্র হইবে না।

বউঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্যের যবনবিদ্বেষ আছে সত্য, কিন্তু এই জাতীয় উক্তি নেই। দম্ভ, হিংসা, কুটিলতাই প্রতাপের বিশেষত্ব। তার পরে বউঠাকুরানীর হাটে প্রতাপ হৃদয়হীন, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রতাপের সরমার জন্য উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা তাঁর পিতৃহৃদয়টিকে প্রকাশ করে দিয়েছে! কিন্তু প্রতাপ-চরিত্রের সঙ্গতি বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নেই। প্রতাপকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য লেখক পর পর তিনটি স্ত্রীর উপর তাঁর কামুকতার পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বসন্তরায়ের ছোটো রানী বিমলার প্রতি প্রতাপের আসক্তি যদিও বা স্বাভাবিক হয় সুন্দরীর প্রতি তাঁর লোলুপ দৃষ্টি একেবারেই বিসদৃশ। এখানে প্রতাপ কাপুরুষ, হীন, দুশ্চরিত্র রূপে চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। বঙ্গাধিপ

১ *Proceedings of the Asiatic Society 1863*

২ বঙ্গাধিপ পরাজয়ের ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরাজয়ে উদয়াদিত্যের প্রসঙ্গ নেই। বউঠাকুরানীর হাটে উদয়াদিত্য লেখকের সহানুভূতির আশ্রয়ে দীপ্যমান। উদয়াদিত্য-পত্নী সরমার প্রসঙ্গ বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নেই। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীতে (১ম খণ্ড) লিখেছেন, বঙ্গাধিপ পরাজয়ের সরমা বউঠাকুরানীর হাটে সুরমা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গাধিপ পরাজয়ে সরমা প্রতাপাদিত্যের কন্যা আর বউঠাকুরানীর হাটে সুরমা উদয়াদিত্যের পত্নী— প্রতাপাদিত্যের পুত্রবধূ। সরমার স্থলে বউঠাকুরানীর হাটে পাই বিভা। বিভার বিবাহ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখি সরমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুমতি রামচন্দ্র রায়ের পত্নী। রামচন্দ্র রায় ও বিভার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বিভা চরিত্র অপরিস্ফুট হলেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কল্পনাসঞ্জাত। বসন্তরায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ধারণা পোষণ করতেন তার কথা পরে আলোচনা করছি। তবে বসন্তরায়ের প্রতি দরদ এবং সহানুভূতি বঙ্গাধিপ পরাজয়েও পেয়েছি। তিনি যে একজন আদর্শ ক্ষমাশীল রাজা ছিলেন তার পরিচয় বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্যে পাচ্ছি। বসন্ত রায়ের মহত্ত্বও গ্রন্থের সর্বত্র ঘোষিত। রুক্মিণী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ বউঠাকুরানীর হাটের অনুরূপ। কেননা বিজয়কৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রতাপাদিত্যের কাজের প্রতিবাদ করতেন না। কিন্তু তিনিও প্রতাপাদিত্যের অন্যায় বুঝতে পারতেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে আছে—

> এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই। পাপ যথেষ্ট হইয়াছে। শেষ উপস্থিত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না।

কচু রায়ের প্রসঙ্গও বউঠাকুরানীর হাটে নেই।

এখানে একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। বউঠাকুরানীর হাট পরে প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপান্তরিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে প্রায়শ্চিত্ত কার? প্রতাপাদিত্যের না বিভার? বিভার উক্তিকে গ্রহণ করলে প্রায়শ্চিত্ত বিভারই। কিন্তু এক দিক থেকে এই প্রায়শ্চিত্ত তো প্রতাপাদিত্যেরও। বউঠাকুরানীর হাটে এই ভাবটি ঘটনাপ্রবাহে এবং বর্ণনায় অন্তর্লীন ছিল। এইটি কি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গাধিপ পরাজয় থেকে পেয়েছিলেন? বঙ্গাধিপ পরাজয়ে সূর্যকুমার মালিকরাজের উক্তি স্মরণীয়।

> মালিকরাজ! তুমি আমার আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাঙ্গিয়া বলিলে না।

অনুমান করি রবীন্দ্রনাথও বউঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্যের জীবনের ট্র্যাজেডিকেই দেখাতে চেয়েছিলেন। তবে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। সে কারণে 'প্রায়শ্চিত্তে'র প্রতাপের মুখে শুনতে পাই—

বৈরাগী, আমার একবার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই— আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

বেঁচে থেকেও, সকল সুখের মধ্যেও যে ট্রাজেডির বেদনা থাকতে পারে প্রতাপের এই উক্তিতে তা স্পষ্ট।

বউঠাকুরানীর হাটের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর-চরিত্ররূপে খাড়া কববার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তাব নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে-সময়ে তাঁব সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি, তিনি অন্যায়কারী, অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কাব ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না।

এ থেকে বোঝা যাবে বঙ্গাধিপ পরাজয়ে প্রতাপকে কেন্দ্র করে যেটুকু দেশাভিমান ছিল তাও রবীন্দ্রনাথ মেনে নেন নি। ইতিহাসই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল।

কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতাপের যে ছবি আমরা পেয়েছি সেখানে বঙ্গের বীর সন্তানদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বউঠাকুরানীর হাট রচিত হবার কিছুকাল আগে থেকেই বাংলা দেশে স্বদেশী উদ্দীপনা আসতে আরম্ভ করে। ১৮৭২-১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘর গড়ার কাজে মনীষীবৃন্দ আত্মনিযোগ করেন। এই 'বিশ বছরের আয়োজনের' সময়ে বউঠাকুরানীর হাট লিখিত। ঠাকুরবাড়িতেও যে এই স্বদেশী প্রেরণার ঢেউ বয়ে যেত তার প্রমাণ উল্লেখ করবার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দুমেলার ঐতিহ্যও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। তাঁর মধ্যে দেশপ্রীতি ছিল, কিন্তু ছিল না দেশ উন্মাদনা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো মহত্ত্ব খুঁজে পেতেন তাকে অবহেলা করতেন না। কিছুকাল পরে প্রতাপাদিত্য রাণা প্রতাপসিংহের সঙ্গে তুলিত— স্বদেশী সমাজ সিরাজকে শিরোপা দিয়েছে।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস'-লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র প্রতাপাদিত্যের প্রশংসায় প্রতাপাদিত্যের অসৎকর্মের মধ্যেও একটা মঙ্গল উদ্দেশ্য খুঁজেছেন। সতীশবাবু গত শতাব্দীর ইতিহাস লেখক এবং উপন্যাস

রচয়িতাদের কথা মনে করেই সম্ভবত এ ভাবে প্রতাপের চরিত্রের মধ্যে দেশহিতৈষণার মহত্ত্ব আরোপ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতাপাদিত্যের চিত্র বউঠাকুরানীর হাটে এঁকেছেন তা ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত রূপ কিনা? সূক্ষ্ম অনুশীলনে দেখা যায় এবং পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তাতেও দেখতে পাই প্রতাপাদিত্যের চরিত্র রবীন্দ্রমতঅনুসারী। বাংলার এই বারো ভুঁইঞা সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকারের মতামত প্রণিধানযোগ্য। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে দেশাভিমানের কথা বলেছেন আচার্য সরকার তাকে আরও তীব্র ভাষায় সমর্থন করেছেন।[১] সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাই প্রতাপাদিত্যকে স্বাধীনতার পূজারী রূপে সম্মান দিয়েছিল। আসলে বাংলায় পাঠানরাজত্বের অবসানের ও মোগল রাজত্বের অভ্যুত্থানের সময় একদল জমিদার ভুঁইফোড় ব্যক্তি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবং বাংলার কোনো কোনো অঞ্চল দুর্গম, বিপদসঙ্কুল ছিল বলে সেখানে সৈন্যপ্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এইসমস্ত 'upstart mushroom' জমিদারেরা কিছুকাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ছিল। সুতরাং এদের পশ্চাতে কোনোরূপ স্বদেশী ঐতিহ্য আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। এই মতকে যদি প্রামাণিক ধরে নিই তবে বলব রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র যথাযথভাবেই আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা বিবেচ্য। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' লিখেছেন রামচন্দ্র-বিভা ঘটনাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে নিষ্ঠুরতার সন্ধান করেছেন তা অমূলক। কেবলমাত্র গল্পটিকে 'জাঁকাল করিবার জন্য' রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবেন এইটি মানতে পারছি না। সতীশবাবু রমাই এবং রামচন্দ্রের প্রতি প্রতাপ যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন তার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন এইটি প্রতাপের একটি সাময়িক ক্রোধ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রতাপকে অন্যায়কারী দুশ্চরিত্র রাজা হিসাবে ইতিহাস থেকে পেয়েছেন। সুতরাং দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার দম্ভ যদি প্রতাপের থেকে থাকে তবে তাঁর পক্ষে এই দণ্ডাজ্ঞাকে কাজে পরিণত করবার ইচ্ছাও যে সম্ভব তা মানতেই হয়। উপন্যাসের সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও তো এইটি একান্তভাবে

১ J. N. Sarkar ; ed, *History of Bengal,* Vol-II

সত্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রামচন্দ্র যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য প্রতাপাদিত্য নদীতে শালকাঠ ফেলে দিতে বলেছিলেন। সতীশবাবু এইটিও গল্পটিকে 'জাঁকাল করিবার জন্য' উদ্ভাবিত মনে করেন। এ ক্ষেত্রেও ঘটনাটি উপন্যাসের সত্য বলে মনে করি। 'ভৈরব স্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত' সতীশবাবুর এই উক্তিকে মেনে নিলেও রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টারূপের কোনোও ক্ষতি হবে না। আরও একটি কথা, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র ঘটনাগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ বিশেষ নেই। সেখানে প্রতাপের এই জাতীয় কাজের স্বীকৃতি আছে। যে-প্রতাপ আপন পিতৃব্যকে হত্যা করতে পারেন তাঁর পক্ষে কি জামাতার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব?

বউঠাকুরানীর হাট জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গীকৃত।[1] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মন 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে প্রবেশ করলে।' একে রবীন্দ্রনাথ 'কৌতূহল' বলেছেন। 'প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে'—সুতরাং কবিমনের অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস খুঁজে পেতে চাইলে মুক্তির স্বাদ। অন্তরের কলরোল উপন্যাসের পাত্রে স্থাপিত হল। এ-কথা ভুললে চলবে না তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ হয় নি। অনুকরণের স্পৃহাও একেবারে অবলুপ্ত হয় নি—কাব্যে বিহারী-লালের গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের। বসন্তরায়-উদয়াদিত্য-বিভাকে কেন্দ্র করে তিনি পারিবারিক ঘটনাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করলেন। প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাবুকের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে এ উপন্যাসে তা অনুপস্থিত। স্মরণের তুলিতে চিত্র না এঁকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নিজের কল্পনাকে হাজারখানা গীতে ভরিয়ে তোলবার প্রয়াস পেলেন।

বিষয়বস্তুর জন্য 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র নিকট ঋণী হলেও রচনারীতিতে তিনি বঙ্কিমের শৈলীকেই গ্রহণ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য সংস্কৃত ইতিহাসের মতো প্রশস্তিমূলক, রামরাম বসুর 'জীবনী' আত্মীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন; প্রতাপচন্দ্র ঘোষের কাহিনীতে কল্পনা অপেক্ষা ইতিহাসের তথ্যপ্রাচুর্য—পুরাতন ইতিবৃত্তের উদাহরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক

১ 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায় আছে—রাজর্ষি উপন্যাস সৌদামিনী দেবীকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরিশিষ্টে রাজর্ষি উপহার দেওয়া হয় নি এর স্বীকৃতি আছে। দ্বিতীয়টাই সত্য

পাত্রপাত্রী নির্বাচন করলেও 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশন করেন নি। বাস্তব ঘটনার পরিবর্তে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে গ্রহণ করেছিলেন।

'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র লেখক 'নির্দিষ্ট নিয়মের পরতন্ত্র' না হলেও স্কটের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের আগেই স্কট এদেশে পরিচিত হয়েছিলেন। এমন-কি স্কটের অনুবাদও ইতিপূর্বে হয়েছে। স্কটের এই জনপ্রিয়তা আমাদের দেশের লেখকবৃন্দকে অভিভূত করেছিল। আমরা উপন্যাসের আদর্শ পেয়েছি বিদেশ থেকে। বিদেশী ফর্মে দেশীয় কনটেন্ট স্থাপন করতে গিয়ে অনেক সময়েই উপন্যাসের সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্কটের *Ivanhoe*-র সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত যে টুর্নামেন্ট ঘটনা আছে তার থেকে প্রায় হুবহু অনুবাদ বঙ্গাধিপ পরাজয়ে দিয়েছেন। টুর্নামেন্টের ঘটনার অনুরূপ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতাপাদিত্যের রাজসভা বর্ণিত। কৃষ্ণনাথ আসলে টেম্পার ব্রায়ান, আর বর্মাবৃত পুরুষ (কচুরায়) Ivanhoe বর্মে আবৃত হয়ে টুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

Ivanhoe উত্তরাধিকার বঞ্চিত, কচুরায়ও তাই। সূর্যকুমারের প্রতি সরমার ভালোবাসার বর্ণনা স্কটের রচনার অনুরূপ। দ্বিতীয়ত প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও অতিক্রম করতে পারেন নি। নায়িকার রূপ বর্ণনায় তিনি সংস্কৃত কবির অনুসারী। সংলাপেও এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব বঙ্কিমকে অনুসরণ করেছেন। স্কটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই।[১] কিন্তু স্কটের প্রভাব বউঠাকুরানীর হাটে নেই। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে একমাত্র ভিলেন চরিত্র রুক্মিণী। রুক্মিণীর কাহিনীর মধ্যে যে বঙ্কিমের প্রভাব রয়েছে তার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এইটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র প্রভাব। রুক্মিণী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ মনোরাজ্য অধিকারলোলুপ। বলা বাহুল্য, হীরার চরিত্রও এই জাতীয়। হীরা কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী— রুক্মিণী সুরমার জন্য। হীরা এবং রুক্মিণীর মধ্যে অপর সাদৃশ্য হচ্ছে— হীরা দেবেন্দ্রনাথের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী আর রুক্মিণী-সীতারামের সম্বন্ধও কতকটা

১ 'রবীন্দ্র-জীবনী'র প্রথম খণ্ডে আছে রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে বউঠাকুরানীর হাট লেখেন তখন তিনি ইংরেজি বই পড়ে রস আস্বাদন করতে পারতেন না। প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। দ্রষ্টব্য, আত্মপরিচয়।

তাই। দুইয়েরই জীবনের পরিণতি ব্যর্থ এবং শোকাবহ। হীরা অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে উন্মাদগ্রস্ত, রুক্মিণীর পরিণতিও অনুরূপ।

বউঠাকুরানীর হাটের অপর চরিত্রগুলির আলোচনাকালে প্রায় সকলেই অভিজ্ঞতার অভাব, বাস্তবগুণের ন্যূনতার উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—'চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিষ একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে'। পরে বলেছেন, এ গল্প 'অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি' 'আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষি'।

কিন্তু এর মধ্যেও 'কারিগরি'র চিহ্ন এবং 'সঞ্জীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে' দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বউঠাকুরানীর হাটে'র প্রশংসা করেছিলেন। প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল হয় নি। বউঠাকুরানীর হাট যে সেকালে অনাদৃত থাকে নি তার প্রমাণ পাই কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত এর নাট্যকৃত রূপের সমাদরে। রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এই বই বহুবার অভিনীতও হয়।[১]

বসন্তরায়-উদয়াদিত্য-বিভার কাহিনীর মধ্যে পারিবারিক জীবনের অধিক্ষেপ ঘটেছে।[২] এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।

বসন্তরায়ের সঙ্গে পদকর্তা বসন্তরায়ের যতটুকু সাদৃশ্য থাক বা না থাক তার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশি মিল রয়েছে শ্রীকণ্ঠ সিংহের। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে রবীন্দ্রনাথ এই বৃদ্ধের সাহচর্যে নিজেকে স্নেহধন্য মনে করতেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ উদার, আত্মভোলা, নিরহংকার। বিবাদ, কলহকে, তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> পরিচয় থাক্ আর নাই থাক্, স্বাভাবিক হৃদ্যতার জোরে মানুষমাত্রেরই প্রতি তাঁহার এমন একটি অবাধ অধিকার ছিল যে কেহই সেটি অস্বীকার করিতে পারিত না।...আবার, তাঁহাকে কোনো অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না।

প্রতাপাদিত্যের আদেশ নিয়ে পাঠানরা যখন বসন্তরায়ের সামনে এল

১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড)।
২ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড)।

তখন বসন্তরায়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারে পাঠান বশ্যতা স্বীকার করলে। শত্রুর মধ্যে যে কাঁটাটি ছিল বসন্তরায় আপন ঔদার্যগুণে সেটি তুলে নিলেন। উদয়াদিত্যের যেমন বসন্তরায়কে ভিন্ন চলে না বালক রবীন্দ্রনাথেরও তাই। শ্রীকণ্ঠ সিংহের—

কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আব বিশ্রাম ছিল না।

এই সংগীতপ্রিয়তা বসন্তরায়ের ছিল। সমস্ত দিক থেকে বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে, প্রতাপের নিষ্ঠুরতা যখন চরমে উপনীত হয় তখন বসন্তরায় সান্ত্বনা খুঁজে পান সুরের মধ্যে। বসন্তরায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির অন্ত নেই। চিরকাল রবীন্দ্রনাথ 'অন্তরের অন্তঃপুর' এই গানের মধ্যেই জীবনের সাধনার সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। বসন্তরায়ও গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখেছিলেন বলে জগৎ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। বউঠাকুরানীর হাট' শেষ করবার পর বসন্তরায়ই পাঠকের চিত্তগহনে অনুরণন তোলে। কেদারনাথ চৌধুরী কর্তৃক বউঠাকুরানীর হাটের নাট্যীকৃত নাম ছিল 'রাজা বসন্তরায়।' এটি যে সার্থকনামা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

উদয়াদিত্য চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের প্রভাব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। উদয়াদিত্য কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। শক্তি ও সাহস দুই-ই তাঁর ছিল। তথাপি উপন্যাসে উদয়াদিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল— বসন্তরায়ের ছায়া যেন তার মধ্যে শরীরী রূপ পেয়েছে। তার কারণও আছে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সের লেখায় আধুনিক বাস্তবতাপ্রধান উপন্যাসের প্রৌঢ় পরিণতি আশা করাও যায় না। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করেন নি। পরবর্তীকালে 'চোখের বালি'তে তিনি চরিত্রের আঁতের কথা বলবার প্রয়াস পেয়েছেন। বউঠাকুরানীর হাটে আত্মভাবনা চরিত্র-গুলির স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। এমন-কি কোনো কোনো চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত ঘটে নি। তথাপি এক দিক দিয়ে উদয়াদিত্য পাঠককে আকর্ষণ করে। যৌবন-উচ্ছল রসে আপ্লুত হয়ে একদা উদয়াদিত্য রুক্মিণীর প্রেমাসক্ত হয়। এই ঘটনা তার বিবাহিত জীবনের মধ্যেও বিষাদের আস্তরণ বিছিয়েছে। সুরমার সাক্ষাতে উদয়াদিত্যের চিত্ত পীড়িত হয়। উদয়াদিত্য সর্বাপেক্ষা পীড়িত হয়েছে বন্ধঘরে অবস্থান করে। কারাগারের জীবনকে সে বারবার ধিক্কার দিয়েছে। প্রতাপাদিত্যের রোষে সে যখন বন্দী তখন তার মনের যে অবস্থার বর্ণনা

পাই 'জীবনস্মৃতি'তে 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথাও সে ভাবেই বলেছেন।

> জানালার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। ... ... এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।

বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথকেও ভৃত্যরাজক তন্ত্রে থাকতে হয়েছে। জীবনের বেড়ী তখন পর্যন্ত ভাঙ্গে নি। সুতরাং বটগাছের ঝুরির গহন অরণ্যে, কুহকের মধ্যে স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভব রাজত্বের কল্পনা করে কবিচিত্ত পরিতৃপ্তি পেত। এর পরে 'জীবনস্মৃতি'র বর্ণনা আসলে বউঠাকুরানীর হাটের উদয়াদিত্যের কথারই প্রতিধ্বনি।

> সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না। সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।

আসলে যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ এতকাল সঞ্চিত ছিল উদয়াদিত্যের জবানিতে তাই মুক্তি পেলে। এ যেন বাস্তবে যে শাসন তিনি পেয়েছিলেন কল্পনার জগতে তারই প্রতিশোধ তুললেন।

বিভা অনেকটা সৌদামিনী দেবীর ছায়ায় কল্পিত। বউঠাকুরানীর হাটের 'উপহার' কবিতাটিতে বড়দিদির প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় দিদির স্নেহসুধা রবীন্দ্রনাথের উপর কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বর্ষিত। অতি অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতার যে মূর্তি তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে দিয়েছেন তাতে স্নেহের সঙ্গে শাসনের কথাও ছিল। সুতরাং বড়দিদি যে তাঁকে স্নেহ করবেন এতে আর বিচিত্র কি? প্রতাপের নিষ্ঠুরতায় উদয়াদিত্য যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত তখন বিভা ভ্রাতৃসেবার জন্য রামমোহনের আহ্বান উপেক্ষা করে স্বামী গৃহে যায় নি। পিতৃগৃহে থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে উদয়াদিত্যকে আনন্দ দিতে চেয়েছিল বিভা। কারণ—

এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
স্নেহপারাবার—
প্রভাতশিশিরসম নীরবে পরাণে মম
ঝরে স্নেহধার।

বউঠাকুরানীর হাট রচনা করবার সময় কবিচিত্ত মাত্র বাইরে পদচারণা আরম্ভ করেছে। এই সময়ে পাপপুণ্যের বোধ ন্যায় নীতি সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ ধারণাই রবীন্দ্রনাথের ছিল। মানবমনের জটিলতা, দুর্জ্ঞেয় রহস্য-প্রবণতা জানবার সময় তখন পর্যন্ত কবি লাভ করেন নি। স্রষ্টার ঔচিত্যবোধ তখন পর্যন্ত সমাজশাসনের বেড়া ধরেই চলতে শুরু করে। মানবজীবন যে উত্তপ্ত লৌহকটাহে টগবগ করে ফুটছে, মানব জীবন যে পরিবর্তমান সে বোধ তখন পর্যন্ত জাগে নি। এই কারণে প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের মধ্যে কেবল একই ভাবের অনুবর্তন দেখতে পাই। প্রতাপাদিত্য বাস্তবের প্রতিরূপ—প্রতিবিম্ব নয়। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁর অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্যের কথাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উদয়াদিত্য, সবমা, বিভা, বসন্তরায়কে হারিয়ে তাঁর মধ্যে যে চাঞ্চল্য জাগতে পারে তাঁর মনও যে দোলায়িত হতে পারে সে কথা ঔপন্যাসিক বলেন নি। এইখানেই পুতুলের ধর্ম অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন প্রতাপাদিত্য মোটা মোটা দড়িগাছি ছিঁড়তে পারেন কিন্তু সূক্ষ্মভাব বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এইটি কেবলমাত্র ব্যাখ্যার পর্যায়েই থেকে গেছে— ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় নি। চরিত্রগুলির এই অসঙ্গতিই রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে অনেকদিন। তার জন্য তাঁকে লিখতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রাণ।

রাজর্ষি

বউঠাকুরানীর হাট ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পাত্রপাত্রী গুলিতে বিশেষ কালের চিহ্ন পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সাধারণত ঐতিহাসিক ঘটনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্যক্তিচরিত্রগুলি প্রায়ই বৃহত্তর ঘটনার আবর্তে আবর্তিত হয়। ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেও লেখক ঘটনাগুলির বিশেষ মূল্য দেন। স্থান কাল পাত্রের এই বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম উপাদান। বউঠাকুরানীর

হাটে রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু রাজর্ষি (১২৯৩) উপন্যাস সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা সম্ভব নয়। এখানে তিনি বিক্রমাদিত্যের আদর্শের সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির দ্বন্দ্বকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করবার প্রযাস পেলেন। এতে উপন্যাসের 'ঐতিহাসিকত্ব' কতখানি রক্ষিত হয়েছে এবং তার দ্বারা উপন্যাসের উৎকর্ষই বা কতটা সূচিত হয়েছে সে বিচার পরে করছি। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিতে কার্পণ্য করেন নি। স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাস, কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় অংশ উৎকলিত করেছেন।

'রাজর্ষি'র প্রেরণা স্বপ্নলব্ধ। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বিস্তৃত করে বলেছেন। কোনো-একটি কাহিনী স্বপ্নলব্ধ হলে তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে ওঠে। কবিগহনের কী বিশেষ ভাব এবং ভাবনা এই রচনার উৎস তা পাঠকের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। রাজর্ষি উপন্যাসেও এই সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের উপর রাজর্ষির মূল্য নির্ভর করছে।

'রাজর্ষি'র সমস্যা হিংসা এবং অহিংসার দ্বন্দ্ব। সমস্যাটিকে ব্যাপক অর্থে প্রাচীন আচার এবং প্রথাবদ্ধ রীতির বিরুদ্ধে নবীন চেতনা এবং স্বাধীন ধর্মচিন্তার দ্বন্দ্ব বলে ধরা যেতে পারে। ত্রিপুরার রাজপরিবার শাক্ত। শাক্ত তন্ত্রের হিংসাত্মক দিকটি এতকাল ধর্মের আবরণে চলে এসেছে। ভক্ত জনসাধারণও বলির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করে নি। বলির পশ্চাতে যে হিংস্রতা ক্রূরতা বিদ্যমান, বলি যে মানুষের আদিম মনোবৃত্তির স্মারক এতকাল জনসাধারণ ভক্তির আবেগে অন্ধ অচেতন ভাবে তার কথা মনে রাখে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বীভৎসতার মূলে আঘাত করতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ধর্মের পূজারী, তিনি শাস্ত্রশাসিত নিয়ম নিগড়কে সর্বথা মেনে নেন নি তার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যাবে। বিশেষত হিন্দুধর্ম যে তার সনাতন ঐতিহ্য, উদার সর্বজনীনতা বিসর্জন দিয়ে প্রথার পাঁকে বদ্ধ, একপ্রকার অচলায়তনের বেড়ার আড়ালে অনড় রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে কণ্ঠযোজনা করেছেন রাজর্ষি উপন্যাসে। তিনি যে অহিংসার কথা বলেছেন সে অহিংসা আসলে তাঁর উপলব্ধিসঞ্জাত।

প্রশ্ন হচ্ছে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্লট কি কেবল স্বপ্নবৃত্তান্তের কাহিনী চিত্রণ

না এর মধ্যে অন্য কোনো অভীপ্সা জাগরূক? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে সেই দ্বন্দ্বটিকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের কথা মনে হতে পারে। পূজারিণী কবিতাতে যে চিত্র পেয়েছি সেখানেও মনুষ্যত্ব আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অহিংসার মহিমাকে উঁচুতে তুলে ধরেছে। তবে কবিতাতে স্বর তীব্র নয়, বিদ্রোহ তীক্ষ্ণ নয়, এরা ইতিহাসের ভাবরূপ— প্রতিবিম্ব মাত্র।

রাজর্ষিতে প্রথাবদ্ধ রীতির বিরুদ্ধে কবির কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, কিছু পরিমাণে বা অসহিষ্ণুতাজড়িত। উপন্যাস রচনা করবার কৌশল তখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে অনায়ত্ত, ছোটোগল্পেও তিনি সার্থকতা পান নি। যে আবেগ কবিতার বিশিষ্ট পরিবেশের উপযোগী কাহিনী বর্ণনায় তা প্রায়শই তরলতায় পর্যবসিত হয়। রাজর্ষি উপন্যাসে ধর্মের নিষ্ঠুরতার দিকটির প্রতি আত্যন্তিক করবার প্রচেষ্টা। এজন্য প্রথম পর্বে ঐতিহাসিক ঘটনার অপ্রতুলতা। আইডিয়ার বিস্তারই মুখ্য। আঙ্গিকের দিক থেকে এ ত্রুটি মান্য কিন্তু কবিগহনের বিকাশধারা লক্ষগোচর বলে এর অন্য মূল্য অনস্বীকার্য। রক্ষণশীলতা, আচারপরায়ণতা চিরকালই রবীন্দ্রনাথের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। রাজর্ষিতে তাব সূত্রপাত। এবং সাহিত্যরচনাব মধ্য দিয়ে এ আঘাত প্রথম বলে স্বভাবতই এখানে আতিশয্যের মাত্রা সমধিক।

রাজর্ষি উপন্যাসের দ্বন্দ্বের দুই কোটি। এক কোটিতে রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য অন্য কোটিতে রঘুপতি— এক কোটিতে অহিংসা অন্য কোটিতে হিংসা। এই দুইয়ের আবর্তে প্রথম পর্বের তীব্রতা এবং জটিলতা।

রঘুপতির চরিত্রে চাণক্যের ছায়াপাত। চাণক্যের মতোই রঘুপতি ক্রুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং মননশীল। রাজশক্তির কাছে তাঁর অবমাননা কেবল ব্যক্তির অবমাননা নয়। এ পরাজয় যেন একটি বিশ্বাসের নিকট আরেকটি বিশ্বাসের। ইউরোপে যেমন রাজশক্তির সঙ্গে পোপের কলহ সমগ্র রাজ্যের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করত গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতির দ্বন্দ্বও যেরকম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে বৃহত্তর আলোড়নের সূত্রপাত করে। সুতরাং উপন্যাসের মধ্যে সমস্যাটিকে কেবলমাত্র ব্যক্তির সমস্যা মনে না করে এর অন্তর রূপটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল।

বলি বন্ধ করা রাজার আদেশ। রঘুপতি কেবল রাজার বিরুদ্ধে দ্রোহবুদ্ধি নিয়ে এ আদেশ অমান্য করতে অগ্রসর হয় নি। ঘটনাটিকে এ ভাবে দেখলে

সমস্যাটির গুরুত্ব ফিকে হয়ে যায়। বরং রঘুপতি যে এ আদেশ তাঁর এবং জনসাধারণের এত কালের পোষিত ধারণার বিরুদ্ধে আঘাত, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা যে ধর্মবোধের উপরও আপতিত এটা যে বিপ্লবের সামিল সেটাই রঘুপতিকে উদ্‌বেজিত করেছে। রঘুপতির বিদ্রোহ কেবল বিদ্রোহের জন্যই নয়। ধর্মপ্রাণতা অন্যান্য বোধের মতো রঘুপতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ কারও থেকে পাওয়া বস্তু নয়— ধর্মবোধ তাঁর মর্মমূলে প্রোথিত। সুতরাং রঘুপতির গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কেবলমাত্র অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এইটি মনে করবার অবকাশ নেই। রঘুপতির দৃঢ়তা এবং কার্যসাধনের জন্য কৌশল উদ্‌ভাবন গভীর আবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কৌশলের মধ্যে মারপ্যাঁচ থাকতে পারে কিন্তু সেই প্যাঁচ মানবের সনাতন স্বভাবধর্ম। আপনাকে প্রতিষ্ঠা করবার আকাঙ্ক্ষা নিজের সম্মানকে বিচ্যুত হতে না দেওয়া এ তো মানব স্বভাবের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি রঘুপতিকে একেবারে ভিলেন রূপে চিত্রিত করেন নি। জয়সিংহের প্রতি তাঁর যে মমতা, স্নেহ অজস্রধারায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল সেইখানেই রঘুপতির অনমনীয়তার পশ্চাতে দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যেন অদৃষ্টের মতো তাঁকে তাড়িত করেছে। তাঁর সকল সাফল্যকে বিষাদাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বুঝতে পারি রঘুপতির দম্ভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রণপিপাসা সকলের কাছে মূল্য পেলেও নিজের কাছে তিনি পরাজিত। এ না হলে মানবজীবনই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হত। নক্ষত্ররায়ের সহায়তায় রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করতে উদ্যত। নির্বোধ নক্ষত্ররায় রঘুপতির ঘুঁটি হিসেবে চালিত। কিন্তু রঘুপতির কাজে বাদ সাধলে তারই প্রিয়তম জয়সিংহ। রঘুপতির এই নৃশংস কাজে জয়সিংহকে জড়াতে রঘুপতি পারেন না। রঘুপতির দুর্বলতার বীজও এখানে। জয়সিংহের প্রশ্নের উত্তরে তাই রঘুপতি বলেন—

> তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভালোবাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয় তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না, কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।

গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা অর্থ রঘুপতির কাছে পুণ্য অর্জন করা। সেই পুণ্য

জয়সিংহ অর্জন করতে চাইলে রঘুপতির অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ভিতরের মানুষটি জাগ্রত হয়। সুপ্ত দুর্বলতা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু রঘুপতির অজ্ঞাতে জয়সিংহ আত্মবিসর্জন দিলে তাঁর মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন তখন জ্বলে উঠে। তাঁর পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে পীড়িত করে তোলে। রঘুপতি আপন পতনের জন্য গোবিন্দমাণিক্যকে দায়ী করে। প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল আকার ধারণ করলে। এর পরে রঘুপতি অন্ধ আবেগে গোবিন্দমাণিক্যের সর্বনাশ করতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। গোবিন্দমাণিক্য কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে সে সুজার সৈন্যদলের সাহায্যে নক্ষত্ররায়কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাতে উদ্যত হয়েছে। রাজ্যলোভ রঘুপতির কাছে তুচ্ছ। গোবিন্দমাণিক্যের দম্ভ চূর্ণ হোক এইটিই তাঁর কামনা। ত্রিপুরা আক্রমণের পর পরাজিত গোবিন্দমাণিক্যকে তিনি বলেছিলেন—

> যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব—ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।

রঘুপতির এই দাবি থেকে এইটি সুস্পষ্ট যে রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের দম্ভকে সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু রঘুপতির জীবনে বোধ হয় এইখান থেকেই ট্রাজেডির সূত্রপাত। যে আবেগের বশে তিনি একের পর এক কৌশলের দ্বারা অগ্রসর হচ্ছিলেন পরবর্তীকালে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় তাঁরও ছিল না। তিনি যে আকাঙ্ক্ষায় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তা পরিণামরমণীয় হয় নি। রঘুপতি-চরিত্রের মহত্ত্ব এইখানে। তুচ্ছতার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য, রাজ্যলোভকে তিনি তৃণাদপি সুনীচ মনে করেছেন। একটা শক্তি যেন আপন তেজ ক্ষয় করতে করতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম ভিক্ষা করলে। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এতকাল যাঁর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তারই কাছে মাথা নত করলেন।

> আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'রাজর্ষি'। এই নামকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সকলের নিকট সুপরিচিত। যোগাযোগের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করবার সময়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা বিচার করেছেন। যদিও সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ এই মতবাদের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। প্রায়শ্চিত্ত নামকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর মতবাদকে লঙ্ঘন করেছেন। রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিচার প্রযোজ্য।

রাজর্ষি উপন্যাসে গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র বিশ্লেষণেও এই পদ্ধতিতে করা উচিত। রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষিতে উন্নীত হয়েছেন এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাজার একটি আদর্শ ছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন নাটকে আমরা রাজার অবতারণা দেখেছি। এই 'রাজা' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় চরিত্র। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই রাজা রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। গোবিন্দমাণিক্য থেকে তার সূত্রপাত বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রাজা চরিত্রের পট-ভূমিকা হিসেবে গোবিন্দমাণিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরও একটি কথা ভাববার আছে। রাজর্ষির নাট্যীকৃত রূপ 'বিসর্জনে'র এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে রাজর্ষির ভাবার্থ একটু ভিন্ন ধরণের। বিসর্জনে প্রতিমা বিসর্জনই মুখ্য বস্তু নয়, অপর্ণার জয়সিংহের আত্মবলির মধ্য দিয়েই রঘুপতির জাগরণ ঘটেছিল। বিসর্জন নাটকে এজন্য গোবিন্দমাণিক্যের উপর কবিদৃষ্টি নিঃশেষিত হয় নি। কিন্তু রাজর্ষিতে গোবিন্দমাণিক্যই মুখ্য চরিত্র।

রাজা গোবিন্দমাণিক্য যে রাজাদর্শ অনুসরণ করে আপন জীবনকে ধন্য করে তুলতে চেয়েছিলেন তা রাজর্ষির প্রারম্ভেই সূচিত হয়েছে।

> কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো— এ যে করে সে'ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সে'ই পৃথিবীর রাজা।

গোবিন্দমাণিক্যের এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় রঘুপতি নক্ষত্ররায়। আদর্শ তখনই বাস্তবসত্যে পরিণত হয় যখন তা বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেও টিকে থাকবার ক্ষমতা রাখে। গোবিন্দমাণিক্য

এই আদর্শকে রক্ষা করবার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে। তিনি যে উচ্চ-ধারণাকে লক্ষ্যস্বরূপ রেখেছিলেন নিজের জীবনে তাকে সত্যরূপে উপলব্ধি করতে চাইলেন। এজন্য তাঁকে কম কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি। রাজ্য ত্যাগ করে যাবার সময়ও তাঁর মধ্যে কিছুটা আসক্তি ছিল। ধ্রুবকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে গৃহজীবনের প্রতি আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজা-দর্শের সার্থকতা তিনি তখনই পেলেন যখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে নেমে এলেন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে। কেবলমাত্র নির্দেশ কিংবা আদেশের মধ্য দিয়ে নয় আহ্বানের দ্বারা তিনি সমস্ত জগৎকে আপন করতে চাইলেন। রঘুপতি, সুজা তাঁর শত্রুদল মাথা নত করলে। সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা রাজা যথার্থ রাজর্ষিতে রূপান্তরিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে পরবর্তীকালে ইতিহাসের অশোক চরিত্র সমবেদনার উদ্রেক করেছিল। অশোকের হিংস্রতা ক্রূরতার মধ্যে ছিল পীড়নের দ্বারা রাজ্যবিস্তার, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা তিনি জয় করছিলেন জনসাধারণের মন। অশোকের এই আদর্শ তাঁর মনে চিরজাগ্রত ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের এই সহনীয়তার দিকটার প্রাধান্যলাভ সেই কারণে ঘটেছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের যে সমস্ত চরিত্র নিয়ে, আলোচনা করেছেন তারও পশ্চাতে অনুরূপ অভীপ্সা দেখতে পাই।

'বালকে' প্রকাশিত 'কাজের লোক কে' ? 'শিখ গুরু', 'ঝান্সীর রানী' ইত্যাদি প্রবন্ধে রাজার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ইতস্তত মন্তব্য আছে। সেখানেও অনুরূপ দৃষ্টি লক্ষগোচর।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র আলোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন যে, শক্তির প্রচণ্ডলীলা কালে কালে শান্তি লাভ করে। সংহারিণী শক্তি শান্তমূর্তিতে পরিণত হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে যদি এইটি সত্য হয় তবে বলিবদ্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে ধর্মের অগ্রগতির স্মারক।

এবারে রাজর্ষির ঐতিহাসিক অংশ নিয়ে আলোচনা করি। আমরা দেখেছি ইতিপূর্বে প্রকাশিত বউঠাকুরানীর হাটে ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রী অতীতের পরিবেশে স্থাপিত হয় নি। যে-কোনো বাস্তবধর্মী উপন্যাসও রচনা করা যেতে পারত প্রতাপাদিত্য-বসন্তরায়-উদয়াদিত্য কাহিনী নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই ইতিহাসের পরিবেশের অবতারণা করেন নি। অনুমান করি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করবার জন্য যে ধরণের প্রতিভার

প্রয়োজন রবীন্দ্রপ্রতিভা তার অনুকূল ছিল না। কেননা বস্তুবাহুল্যের প্রতি বিতৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। আর বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি-তে তিনি সচেতন ভাবে কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে পরিস্ফুট করতে চানও নি।

তথাপি বউঠাকুরানীর হাটে ইতিহাস যেমন কতকগুলি পাত্রপাত্রীর নাম নির্বাচনের মধ্যেই নিঃশেষিত রাজর্ষিতে তেমন নয়। রাজমালা এবং স্টুয়ার্টের ইতিহাস থেকে যে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন সে কথা তো উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেই প্রমাণিত। প্রথম সংস্করণে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অনুরূপ তিনিও রাজমালার কিছু অংশ পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছিলেন। লিথোচিত্রও বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রভাব বহন করছে। সুতরাং নিছক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আনা হয়েছে এমন অনুমান রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই রয়েছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর সংস্করণে রাজর্ষি সম্বন্ধে কবির উক্তি স্মরণীয়। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি-পূজার বিরোধ। 'কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল'।

বস্তুত উপন্যাসটি শেষ হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যই প্রমাণ রাজর্ষির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্রটি ক্ষীণ, কিছু পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। নিছক গল্পখোর শিশুদের জন্য দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাটির একটি তাৎপর্য আছে। পূর্বেই বলেছি গোবিন্দমাণিক্যের ক্রমপরিণতির দিক থেকে এই ঐতিহাসিক অংশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় অংশে রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যের কৃচ্ছ্রসাধনা, ত্যাগস্বীকার, নক্ষত্ররায়ের নিকট পরাজয়বরণ একদিক থেকে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আরও একটি কথা। আওরঙ্গজেবের হস্তে সুজার ভাগ্যবিপর্যয় গভীর অর্থব্যঞ্জক। এই ঘটনাটি গোবিন্দমাণিক্য-কাহিনীর সঙ্গে শিথিলভাবে প্রযুক্ত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সুজার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের সাদৃশ্য দেখানোর জন্যই মোগল দরবারের ভ্রাতৃবিরোধকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রান্তীয় ত্রিপুরা রাজ্যের সাদৃশ্য হচ্ছে এইখানে যে রাজনীতি স্বভাবতই বাঁকা পথ অবলম্বন করে। গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায় কর্তৃক বিতাড়িত, সুজাও আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিতাড়িত। দুজনেই সিংহাসন চ্যুত হয়ে এক গভীর

সত্য আবিষ্কার করলে। বিশাল ভারত সাম্রাজ্য নিয়ে যে দলাদলি, হানাহানি, ভ্রাতৃবিরোধ তার সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজ্যেরও মিল রয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা এই অর্থে সার্থক এবং রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে হলেও এই সত্যটি প্রকাশ করেছেন রাজর্ষি উপন্যাসে। উপন্যাসের গঠনে নিশ্চয়ই ত্রুটিবিচ্যুতি আছে কিন্তু শিথিলবিন্যস্ত ঐতিহাসিক উপাদানের মূল্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সকলেই 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর-সুপ্রিয়ের সঙ্গে রঘুপতি-জয়সিংহরে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। এই সঙ্গে জয়সিংহের সঙ্গে মুক্তধারার অভিজিতের ক্ষীণ সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

শক্তিকানন

শক্তিকানন প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৯ শকাব্দে। এইটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থটিতে প্রথম রচনার ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। কিন্তু গোড়া থেকেই শ্রীশচন্দ্রের মৌলিক সুরটি লক্ষ করা যায়। সেইটি হল বাংলার পল্লীশ্রীর প্রতি লেখকের প্রীতিপক্ষপাত। গ্রন্থটিকে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। লেখক সে দাবি করেনও নি। কিন্তু কেবলমাত্র রাজরাজড়ার ইতিহাস থাকলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব নচেৎ বলব না এমন কোনো ধরাবাঁধা নীতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নেই। এক কথায় গ্রন্থটিতে যদি ঐতিহাসিক পরিবেশ যথাযথ চিত্রিত হয়, কাহিনীতে যদি অতীতকালের ভাবমণ্ডল ঠিক থাকে, তবে উপন্যাসকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিতে বাধা দেখি না। লেখক বলেছেন 'আমি দেড়শত বৎসরের আগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালির উপর নির্ভর করিয়াছি'।

উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থান পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে। এই সময়কার বাঙালির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে লেখা হয় নি। শ্রীশচন্দ্র কিছুটা কল্পনা কিছুটা সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্য যা মূলত সাহিত্যনির্ভর তাই মিশিয়ে শক্তিকানন রচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্রের ধর্মতত্ত্ব আলোচনার মতো এ ক্ষেত্রে জগন্নাথ এবং জগদীশের শাক্ত-বৈষ্ণব তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। লেখক সে-যুগের ধর্মবিবর্তনের যে রূপটি সহজলভ্য তাকেই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈষ্ণবতার প্রভাবে শক্তিধর্ম তার ভয়ংকরত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। রামপ্রসাদের গানে কৃষ্ণ এবং কালী এক হয়ে গেছে। জগদীশের প্রকৃত শিক্ষাও তাই। তিনি অন্তরে অন্তরে শাক্ত বাইরে বৈষ্ণব। হরিদাসের শাক্তধর্মের প্রতি প্রবল ঘৃণা সে-যুগের সমাজমানসের স্বাক্ষর বহন করছে। মুসলমান গাড়োয়ানকে দীক্ষা দান, থানার দারোগার ভাবান্তর সবই চৈতন্যজীবনী-প্রভাবিত।

শক্তি কাননের কোনোও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বইটিতে সেকালের

বাংলার চিত্র পাই হৈম-মৃন্ময়ীর সংলাপে। পল্লীশ্রীর রূপবৈভব দেখি লেখকের বর্ণনায়। উদ্ধব রোমান্টিক চরিত্র, জগদীশও তাই। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু এই সময়ে বাংলার গ্রাম্যশ্রীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে মমত্ববোধ মানসী কাব্য এবং অন্যান্য গদ্যগ্রন্থে দেখি তাতে মনে হয় লেখক রবীন্দ্রপথ অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা হয়েছে।

ফুলজানি

শক্তিকানন পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির মনোরম চিত্র, মানুষের সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনছবি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। শক্তিকাননের আকর্ষণ আরও এক কারণে বাড়িয়েছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসরচনার সমাপ্তির পর তাঁর অক্ষম অনুকরণে উপন্যাস রচনার প্রাচুর্য দেখা গিয়েছিল। এই-সকল উপন্যাসে রোমান্টিক ঘটনার সমাবেশ, চমক সৃষ্টির জন্যে নানা অসঙ্গত বিষয়ের অবতারণা, অকারণে ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত দেখা দিত। ফলে উপন্যাসের নামে কতগুলি রোমাঞ্চকর গল্পকাহিনীতে সে সময়ে বাংলাদেশ ছেয়ে গিয়েছিল। শক্তিকাননের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উপন্যাসের মধ্যে প্রায়ই বাঙলা-দেশকে পাই না। একান্ত অপরিচিত দৃশ্যাবলীর সূত্রপাতে উপন্যাসটি প্রায়ই অবাস্তবতার প্রান্তে স্থাপিত হত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর উপন্যাসে বাংলা-দেশকেই প্রধান করে তুললেন। কিন্তু সেকালের রীতি অনুযায়ী রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করতে তিনিও ভুল করেন নি। কতকটা জনপ্রিয়তার জন্য, কতকটা সেকালের রীতির জন্যে শ্রীশচন্দ্র শক্তিকাননে রোমাঞ্চকর দৃশ্য যোগ করেছিলেন।

ফুলজানিতে বাঙলাদেশেরই কথা। অবশ্য রোমাঞ্চকর দৃশ্যবর্জিত নয়। সূক্ষ্মবিচারে ফুলজানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। শ্রীশচন্দ্র খাঁটি বাঙালিজীবনকে দৃশ্যগোচর করবার জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নির্বাচন করেছেন। শক্তিকানন, ফুলজানি, বিশ্বনাথ সব উপন্যাসগুলির সময় হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী। নবাবী আমলের পতনদশায় বাংলার জনজীবনের প্রতিচ্ছবি উপন্যাসগুলিতে প্রতিবিম্বিত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই যুগোচিত পরিবেশটি

রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক উপাদানের উপস্থাপনার দ্বারা সে-যুগের ভাবাকাশকে ধরবার চেষ্টা দেখা যায় ফুলজানি উপন্যাসে।

ফুলজানির সৌন্দর্যবিশ্লেষণ এবং এর দোষত্রুটির কথা রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত ভাবে বলেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাটি উপন্যাসের ত্রুটি। এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। শ্রীশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে আদর্শবাদের কোনো চিহ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন তেমনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারও সিরাজকে তাঁর যথার্থ স্বরূপে অঙ্কন করেছেন। সিরাজের বিচারের দৃশ্য কিংবা অন্তঃপুরের বর্ণনা অনেকটা রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফুলজানির কাহিনীটির সম্ভবত একটি লৌকিক ভিত্তি আছে। পরিশিষ্টে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—

> কথিত আছে নবাব সিবাজদ্দৌলা এই সম্পত্তির (ফুলকুমারী-পুরন্দব) হিন্দুমতে সৎকার করিলেন এবং দাহস্থলে চিতাভস্মের এক সুরম্য উৎস নির্মাণ করাইয়া দেন। গোলাব-বাসিত নির্মল সলিলরাশি নিশিদিন এই উৎসমুখে বিকীর্ণ হইত।

ফুলকুমাবীব কাহিনী যে বটতলাব বসিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রিকায় ফুলজানির সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি স্মরণীয়—

> The Burtola people have been selling for the last fifty years a wretched metrical composition of that name, and the story is that of the abduction of a beautiful Hindu girl for the zenana of a Mahammedan grandee. It is on the basis of that story that Babu Shrish Chandra has created a whole host of characters, high and low, Hindu and Mahammedan, master and servants, teacher and pupil, zemindar and tenant,

ফুলজানিতে পাঠশালার মনোরম বিবরণটি শ্রীশচন্দ্র 'বালক' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ফুলজানির যে ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন তা সূক্ষ্মদর্শীর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির পরিচয় দেয়। শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে ঐক্য বিশেষ নেই। ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে গল্পরসও বিশেষ জমে নি। কিন্তু উপন্যাসটির বিশিষ্টতা অন্য কারণে। শ্রীশচন্দ্র কতগুলি খণ্ডচিত্রের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির সুখদুঃখ হাসিকান্না, বিরহমিলনকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। 'বালক' পত্রিকায় তিনি যে পাঠশালা কিংবা বাংলার বসন্তোৎসবের চিত্র

এঁকেছেন সেরকম কতগুলি খণ্ডচিত্র বর্ণনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফলে উপন্যাসের ঘটনার ঐক্য ব্যাহত হয়েছে সত্য তথাপি কতগুলি চিত্রমালায় গ্রন্থগুলি অলংকৃত হয়েছে এ কথাও মানতে হবে। এখানেই ফুলজানির সার্থকতা।

বিশ্বনাথ

বিশ্বনাথ উপন্যাসটি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল। নামপত্রে গ্রন্থখানিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *Biswanath or The Robinhood of Bengal (A Historical Novel)*। রবিনহুড গাথা ইংলণ্ডে জনসমাজের মধ্যে এককালে সাড়া এনেছিল। এই তীরন্দাজ নায়কের নানা দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবিনহুডের সাদৃশ্যে বিশ্বনাথকে অঙ্কন করেছেন। বিশ্বনাথকে নিয়েও নানা ছড়া রচিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের প্রীতিপক্ষপাত ছিল বিশে ডাকাতের উপর। এই জনপ্রিয় নায়ককে কেন্দ্র করে শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার আগ্রহ জাগবে এতে আর বিচিত্র কি? রবিনহুড বনে বাস করতেন। আর তার দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য ছিল জনসাধারণের হিতের জন্য। রবিনহুডের ম্যারিষান (Marian) ছিল প্রণয়ী। অনুরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে। বিশ্বনাথও বাস করতেন জঙ্গলে। বাল্যকালে প্রণয়ের ব্যর্থতাই তার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বনাথের চরিত্রে নানা সদ্‌গুণের সন্ধানও পেয়েছেন।

হান্টারের লেখায় বিশ্বনাথ খুব উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত নয়। সেখানে তিনি Robber and dakeurits দলভুক্ত। তাঁর কার্যাবলীর প্রশংসা কোথাও উল্লিখিত হয় নি। হতেও পারে না। শ্রীশচন্দ্র সরকারের রিপোর্টকেই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তথ্যের জন্য ঋণ স্বীকার করলেও তিনি বিশ্বনাথকে আঁকলেন জনপদবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক করে। বিশ্বনাথের ফাঁসির পরে গ্রামবাসীর মুখে মুখে এই ছড়াটি ফিরত—

ওরে রফি দেখে যা, কি দশা যে হল
আশা নগরের মাঝে আশা ফুরাইল।

এই স্বতোৎসারিত বেদনা শ্রীশচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ-নির্দিষ্ট পথে চলেন নি।

সরকারী কাজে শ্রীশবাবু নদীয়ায় গিয়েছিলেন। 'নদীয়া ভ্রমণ' নামে শ্রীশচন্দ্র বালক পত্রিকায় দুটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। বিশে ডাকাত সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক স্থানটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি।

> আমাদের মধ্যে রবিন্‌হুডের নাম যাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে এবং সেই ইংরেজকুলতিলকের বীরত্ব কাহিনীতে যাঁরা মুগ্ধ, তাঁরা শুনে একেবারে নিঃসন্দেহ আশ্চর্য হয়ে থাকেন যে এই বিশে ডাকাতের কার্যকলাপ দস্যুশ্রেষ্ঠ জন বুলেরই অনুরূপ। আর এই চৈতন্য, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মভূমি নদীয়া তাকেও অঙ্কে ধারণ করেছিলেন।...আমায় নিরক্ষর ছোট লোকদের কাছ থেকে অনেক যত্নে খবর নিতে হয়েছে।১

আগে বলেছি লেখক বিশে ডাকাতকে কেবল দস্যু বলে মনে করে নি। বিশ্বনাথের মাতৃভক্তি, পরোপকার, বীরত্বমণ্ডিত কার্যাবলীর বর্ণনা বিশ্বনাথ উপন্যাসে কয়েকটি খণ্ড চিত্রের মধ্যে অর্পিত। শ্রীশবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও ঘটনার ঐক্য নেই। কেবলমাত্র চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করবার জন্য লেখক তাঁর সংগৃহীত উপাদানকে কাজে লাগিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ছবিও এই উপন্যাসে উপেক্ষিত হয় নি।

রাইবনীদুর্গ

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইবনীদুর্গ' নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বার হয়েছিল। ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে সপ্তম বর্ষের একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত (১৩১৩-১৩১৪) এই উপন্যাসটি বার হয়। মাঝে মাঝে কয়েক মাস বাদ গিয়েছে। এই সময় বঙ্গদর্শন কাগজেই শ্রীশচন্দ্রের 'রাজতপস্বিনী' জীবনীটিও বার হচ্ছিল। প্রথম প্রথম রাইবনীদুর্গের রচনায় লেখকের নাম ছাপা হয় নি। সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে বইটির লেখক যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তা জানতে পারি। ইতিহাসের প্রতি পক্ষপাত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আগে থেকেই ছিল। কিন্তু শক্তি কানন এবং ফুলজানি উপন্যাসে ইতিহাস চিত্রডোরের কাজ করেছে। বিশ্বনাথ ঐতিহাসিক বনাম জীবনী পর্যায়ের গ্রন্থ। রাইবনী-দুর্গই শ্রীশচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার সীমান্তে বাংলার ভূস্বামী পদাঙ্কনারায়ণের

১ বালক, ফালগুন, 'নদীয়া ভ্রমণ' ২নং।

কাহিনী শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন। আলিবর্দীর রাজত্বকালের প্রথমার্ধে বর্গীর হাঙ্গামা, সরফরাজ খাঁর পতন, মুর্শিদকুলী খাঁর কার্যপ্রণালী এবং উড়িষ্যার রাজরাজড়ার কাহিনী শ্রীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করে বলেছেন। রাইবনী-দুর্গের দুর্গাধিপ পদ্মাঙ্কনারায়ণকে কেন্দ্র করে শিবাপ্রসন্ন মারাঠা পণ্ডিত ভাস্করের সাহায্যে পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেন। সেজন্যে কুমার পদ্মাঙ্কনারায়ণকে শিবাপ্রসন্ন পুত্রবৎ লালন করেন। ওদিকে আলিবর্দীর চক্রান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে মীর হবিব মারাঠাদের ডেকে আনে। উড়িষ্যা-রাজের সেনাপতি কল্যাণ পাণ্ডা আবার হিন্দু শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। মীর হবিবের সৈন্যদের সঙ্গে শিবাপ্রসন্নের পত্নী সৌদামিনী দেবী যুদ্ধ করেন।

এই সমস্ত যুদ্ধ এবং রাজরাজড়ার কাহিনীর পশ্চাতে শ্রীশচন্দ্র আরও কতগুলি পারিবারিক কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন— পদ্মাঙ্কনারায়ণ এবং তাঁর মাতা কৃষ্ণপ্রিয়ার বাৎসল্যলীলা, কৃষ্ণপ্রিয়ার পূর্বস্বামী রাধাচরণের নিরুদ্দেশ-যাত্রা এবং অভয়ানন্দ নামে আত্মপ্রকাশ, শিবাপ্রসন্ন এবং তার পত্নী সৌদামিনী দেবীর নিষ্ঠা, স্বজনবাৎসল্য ইত্যাদি।

বস্তুত কাহিনীটির আকর্ষণও এখানে। এই সমস্ত পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রীশচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছেন। প্রসঙ্গত শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এবং বৈষ্ণবীয় আদর্শটির রূপ বর্ণনা করেছেন।

বইটির সমাপ্তি আকস্মিক। যে বিস্তৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র তাঁর কাহিনী রচনা করছিলেন সে পটভূমিকাটি অস্পষ্ট থেকে গেছে। পদ্মাঙ্ক-নারায়ণের, ষষ্ঠীচরণের কোনো পরিণতি পাই না। উপন্যাস হিসাবে এই বইটি সার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ ফুলজানি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এই বইটি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

মধ্যে মধ্যে বর্ণনার উৎকর্ষ লক্ষণীয়। রাইবনীদুর্গের প্রাচীন ঐশ্বর্য আর নেই এখন কেবল স্মৃতিমাত্র। শ্রীশচন্দ্র বলেছেন—

> যেখানে সুখস্মৃতি নাই, সেখানে কৌমুদী প্রফুল্ল নিশীথিনী, মলয়হিল্লোল ও পুষ্পবীথিকা এবং কোকিল পাপিয়ার যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া বংশীবদনের চেষ্টা করিলেও কি 'বনমাঝে কি মনোমাঝে' মধুর সে বাঁশী বাজে না। রাইবনীদুর্গ তাহার প্রাচীন দুর্জয় প্রাকার ও পৌরাণিকী জয়পরাজয়ের কাহিনী লইয়া মাতাপুত্রের মনে কেবল আতঙ্ক-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাবই চিরদিন জাগরূক রাখিত।

আর একটি বর্ণনা। সৌদামিনী স্বামীদর্শনে যাচ্ছেন, তিনি পদাঙ্কনারায়ণ-কে শিবিকায় যেতে বললেন—

তারপর কিন্তু কুমার কিছুতে তাহাতে সম্মত হইলেন না। 'তোমার নাতি হয়ে যেতে রাজি আছি ঠাকুরানীদিদি, নাতবউ হয়ে নয়।' এই বলিয়া তিনি দাস-গৃহিণীর সকল আপত্তি হাসিয়া উড়াইলেন। আকাশে অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রকিরণ নীলিমার উপর একটা ক্ষীণ সূক্ষ্ম রজতাবরণ বিস্তৃত করিয়া ছিল, তাহাতে ফেনপুঞ্জময় বিশাল সুবর্ণরেখার বুকে ইন্দ্রধনুর সুষমাবৎ অনির্বচনীয় রমণীয়তা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর বন্যাগর্জন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া নিবিড় বনানীর মৃগয়াকালীন প্রলয়ঙ্কর গাম্ভীর্য সূচিত করিতেছিল। পদাঙ্কনারায়ণ সশস্ত্র যোদ্ধৃবেশে এই দৃশ্যের ভিতর সর্বাগ্রে উৎসাহে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে সকল শব্দ ডুবাইয়া কে গান গাহিল—

ইস্‌ নগরীমে বোল্‌তাহে কোন্‌ বেপরোয়ানি
বাবা! বেপরোয়ানি।
কঙ্কর চুন্‌ চুন্‌ মহল বনায়া, লোক কহে ঘর মেরা।
ওলা ঘর তেরা না ঘর মেরা চিড়িয়া নিয়া থামেড়া।[১] ইত্যাদি

১ বঙ্গদর্শন, ৭ম বর্ষ

বঙ্কিম-সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিক

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়

জয়াবতীর উপাখ্যান

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের জয়াবতীর উপাখ্যান (১৮৬৩) কণ্টারের রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিস্টরি অবলম্বনে লিখিত। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন—

> জয়াবতীর উপাখ্যান প্রচারিত হইল। ইহা ইংরেজি রোমান্স অব ইণ্ডিয়ান হিষ্টরী' অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইতে অনুবাদিত। ইহা তাহার অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানে স্থানে অনেক ভাব পরিত্যক্ত ও নূতন ভাব সমাবেশিত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কণ্টারের বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। টডের রাজস্থানের মতো কণ্টারের বইটিও যে জনপ্রিয় ছিল তা এই সমস্ত বই থেকে অনুমিত হয়। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান যে জয়াবতী উপাখ্যানের প্রেরণাস্থল তার প্রমাণ পাই বইটির কাহিনীবিন্যাসে। এই বইটিতেও স্বাধীনতা-হীনতায় বাঙালির বেদনাকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে। বইটির অপর মূল্য আছে। বনোয়ারীলাল রায়ের জয়াবতী কাব্য (১৮৬৫) এবং যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়াবতী নাটক (১৮৮৪) রচনাতে সম্ভবত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর প্রেরণা ছিল।

কাহিনীটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ কিছুই নেই। উপাখ্যানটি সংস্কৃত আখ্যায়িকা ধরণে লিখিত। কাদম্বরীর প্রভাব সর্বত্র। উপমাপ্রয়োগে, সংলাপ রচনায় কাদম্বরীর আভাস মিলে। তবে স্বাধীনতাবোধ জাগাতে হয়তো বইটি কিছু প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে। আলাউদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে রত্নসেন বলেছিলেন—

> স্বাধীনতা লাভে কে উপেক্ষা করিয়া থাকে? অধিক কি কহিব, মনুষ্যের তো কথাই নাই, পশু পক্ষীগণও অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে না।

বইটি মিলনান্তক। বনোয়ারীলালের কাব্য বিষাদান্ত। জয়াবতী চরিত্রে কোমল এবং কঠোর ভাবের মিশ্রণ দেখি। তবে নিতান্ত বর্ণনামূলক বলে চরিত্রটির বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। রাজপুতরমণী হলেও বাঙালি-মহিলার আদর্শ জয়াবতীতে দুর্লক্ষ্য নয়।

কমলাদেবী

কমলাদেবী (১৮৮৫) মানসিংহের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। রাজপুত বীরদিগের মধ্যে যাঁরা মোগলদাসত্ব স্বীকার করে মোগল-আনুকূল্য লাভ করেছিলেন মানসিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মানসিংহ রাজপুতের কাছে অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষত স্বাধীনতার পূজারী রাজপুতদের কাছে মানসিংহের বিজাতীয় আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তু ছিল। রমেশচন্দ্রের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায় প্রতাপসিংহ কর্তৃক মানসিংহলাঞ্ছনা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছিল। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মানসিংহের এই দোষক্ষালন এবং তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় বর্ণনা করার জন্যে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। মানসিংহের গুণাবলীর উদাহরণ দিয়ে ভূমিকাতে তিনি বলেছেন—

> তাঁহাকে হিন্দুজাতির কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না বরং দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করিতে সাধ হয়।

আকবরের পুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর)কে কেন্দ্র করে মানসিংহ ষড়যন্ত্রের বীজ বুনলেন। সেলিমকে অপসারিত করে আবার হিন্দুগৌরব পুনরুদ্ধার করবেন—এই মানসিংহের বাসনা। আকবরের মহিষী কমলাদেবী মানসিংহের এই কাজে সহায়তা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মানসিংহের ষড়যন্ত্রব্যর্থ হয়। কমলাদেবী, মানসিংহ, হেমলতা (অজয়সিংহের কন্যা) প্রণয়ের রাগ-বিরাগও প্রসঙ্গত স্থান পেয়েছে। মহব্বত খাঁ, বৈরাম খাঁ ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মানসিংহের ভ্রাতার বহুরূপীরূপে কার্যোদ্ধার অ্যাড্‌ভেঞ্চার-সুলভ। উপন্যাসটিতে প্রেমের দৃশ্যে ভাবপ্রবণতা, যুদ্ধের দৃশ্যে অ্যাড্‌ভেঞ্চার-সুলভ ভোজবাজি, এবং কতগুলি ষড়যন্ত্র স্থান পেয়েছে। সাহিত্যগত মূল্য বিশেষ কিছুই নেই। মানসিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় অভিনবত্ব নেই বটে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যপ্রবণতা লেখকের আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ইতিহাসসম্মত নয়। মোগল অন্তঃপুরের রহস্য বর্ণনা অবাস্তবতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গাধিপ পরাজয় (২য় খণ্ড)

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয় (১ম খণ্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪) সেকালে সুধীসমাজের নিকট সমাদর পেয়েছিল। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডের আলোচনা 'বউঠাকুরানীর হাটে'র সঙ্গে করেছি। এখানে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা করছি।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের এমন কতগুলি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছেন যার পূর্বাভাস প্রথম খণ্ডে ছিল না। প্রথম খণ্ড বার হবার পর *Calcutta Review*-এ গ্রন্থটির আলোচনা করা হয়। এবং প্রতাপচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবও কিছু কিছু মন্তব্য করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র বলেছেন—

> এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতিবিদ্য কায়স্থ কুলতিলক মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্বন্ধে রুষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে দুষিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না, গ্রন্থকার অত্যাচার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে কদযবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কলিকাতা রিভিউ-লেখক বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহস্রের মধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমিদার ছিলেন, তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করাইয়া উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে।

এই সমালোচনা প্রতাপচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। সেই কারণে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্‌ধৃত করেছিলেন, লিথোচিত্রগুলি দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের দেশীয় মনোভাবের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত দেখা যায়। দু' একটি স্থান উদ্‌ধৃত করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। লেখক প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণস্বরূপ তদীয় মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণের মারফৎ বলিয়েছেন—

> প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোণিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচিবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও আশ্রিত কর্বালহু ফিরিঙ্গী আখণ্ড হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য অস্ত হইল। তখন মহারাজের বাল্যচাপল্য বশতঃ গুরুজনে বিপরীতদৃষ্টি করিলেন, তখনই তাঁহার সর্বনাশের ইষ্টকারোপণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খুল্লতাতের রাজ্যে ঈর্ষাদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলাম যে মহারাজ অধঃপতনে সংকল্প করিলেন

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতাপাদিত্যের এই সমস্ত পাপকার্যের বিবরণ বিস্তৃত-ভাবে আছে। কিন্তু এই বিবরণ দিয়েও প্রতাপচন্দ্র প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে লিখলেন, 'আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য— বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন'। বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে এর পর গ্রন্থকার অনেক মহৎ কীর্তির কথা শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট নিশ্চয়ই এক শ্রেণীর পাঠকের বিরাগ উৎপন্ন করেছিল। প্রতাপচন্দ্র সযত্নে সে পথ পরিহার করলেন। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাটে রামচন্দ্র কাপুরুষ। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র তাঁকে এত হীনভাবে চিত্রিত করেন নি। প্রথম খণ্ডের উপসংহারেই প্রতাপবাবু গ্রন্থের যবনিকা টেনেছিলেন। সেই সমাপ্তি আসলে ছিল আকস্মিক। প্রথম খণ্ড পড়ে পাঠকদের অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল। কলকাতা রিভিয়্যুর সমালোচনাও তার প্রমাণ। সুতরাং প্রথম খণ্ডের উপস্থাপিত ঘটনার গ্রন্থি খোলবার জন্য প্রয়োজন হল দ্বিতীয় খণ্ডের। বিমলা বসন্তরায়ের স্ত্রী। প্রতাপাদিত্য অবৈধ প্রণয়ে তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিমলার পরিণাম হল ভয়াবহ। রামচন্দ্রের স্ত্রী সুমতির পতিনিষ্ঠা আদর্শবাদের দ্বারা অঙ্কিত হল। জানা গেল ইন্দুমতী সূর্যকুমারেব ভগ্নী। ইন্দুমতীর সঙ্গে কচু রায়ের বিবাহ হল। সূর্যকুমার সরমাকে বিবাহ করতে পারলেন না। সরমা পিতৃশোকে মৃত্যুবরণ করলে। প্রতাপাদিত্যের শেষজীবনও বিষাদাচ্ছন্ন। গ্রন্থে আরও কতগুলি অবান্তর বিষয় স্থান পেয়েছে। সূর্যকুমারের রাজ্য জয়ন্তিয়ার অবস্থা, যক্ষরাজ্যের শাসন প্রণালী, পর্তুগীজদের কাহিনী ঈষৎ বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রতাপচন্দ্র ছিলেন রায়গড়ের অধিবাসী। এই রায়গড়ের শোচনীয় পরিণাম তাঁকে উদ্‌বেজিত করেছিল। বইটি লেখবার প্রেরণা এসেছে এই স্বদেশহিতৈষণা থেকে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যে সর্বদা পরিত্যজ্য সে কথাও সূর্যকুমারের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন—

> অদ্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মুলিত হইল। মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক—বঙ্গের জন্য তাঁহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদিগের স্বেষ্ট চিন্তাত্যাগ করিয়া যদ্যপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহা হইলে যুদ্ধে জয়ী হই বা না হই মনের এরূপ মালিন্য জন্মিত না। আমাদিগের স্বার্থপরতাই আমাদিগের সর্বনাশ করিল।

সুতরাং বুঝতে পারছি নিছক তথ্য পরিবেশন ছাড়াও লেখকের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। গ্রন্থের শেষ ছত্রটি উদ্ধারযোগ্য।

> শরগুনার কুক্ষীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগন্নাথ-

কুক্ষীর নাম রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈঋতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গত-মধ্যে গণিত।

এই 'ঘোষেদে'র বংশজ ছিলেন প্রতাপচন্দ্র।

বঙ্গাধিপ পরাজয়ের অন্যতম ত্রুটি এর ভাষাব্যবহারে। ভাষায় প্রসাদ-গুণের নিতান্ত অভাব। সমাসবহুল এবং অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রতি লেখকের পক্ষপাত ছিল। পরের সংস্করণগুলিতে তিনি সে সমস্ত শব্দের পাদটীকায় অর্থ দিয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র সংস্কৃত বাক্‌রীতিও অধিকাংশস্থলে অনুসরণ করেছেন।

প্রতাপচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বড়ো কৃতিত্ব এখানে যে তিনিই প্রথম দেখালেন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গেলে ঔপন্যাসিকের তথ্যনিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বটে কিন্তু সেখানে তথ্যের অভাব লক্ষিত হয়। এদিক থেকে প্রতাপচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পথিকৃতের কাজ করেছেন। এই উপন্যাস রচনা করবার সময়ে তিনি তথ্যের জন্যে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছিলেন।

ইতিপূর্বে রামরাম বসুর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছি। প্রতাপচন্দ্রের কৃতিত্ব এদিক থেকে আরও বেশি। রামরাম বসুর বইতে প্রতাপাদিত্যের স্বদেশহিতৈষণার দিকটি তেমন স্পষ্ট নয়। বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রথম খণ্ডে প্রতাপচন্দ্রেরও কণ্ঠ তেমন উঁচু নয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যে পথের ইঙ্গিত দিলেন সেই সরণীই অন্যান্য ঔপন্যাসিক-নাট্যকাররা অবলম্বন করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্রও বোধ হয় এইটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই প্রতাপাদিত্যকে বলতে শুনি—'আগামীস্তন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতাররূপে জানিবে।'

রামগতি ন্যায়রত্ন

রামগতি ন্যায়রত্নের ইলছোবা একখানি স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রামগতি আরও একখানি আখ্যায়িকা লিখেছিলেন 'রোমাবতী' নামে। ইলছোবা মণ্ডলাই অথবা ইলছোবার ইতিহাস বইখানির পুরো নাম

হতে পারে। কিংবা এ দুখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও হতে পারে। সুধীরকুমার মিত্র স্বতন্ত্র দুটি বই মনে করেন। যতদূর মনে হয় শেষের বইটি প্রথম বইটির বিস্তৃততর রূপ।

রামগতি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুকরণে যে সমস্ত লেখক অনুবাদে সাফল্য লাভ করেছিলেন রামগতি তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত নন বটে কিন্তু তাঁর রচনাপদ্ধতিও বিদ্যাসাগরীয়। রোমাবতীর ভূমিকায় রামগতি বলেছেন যে তিনি ঐ বইটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আখ্যায়িকাকে অনুসরণ করে লিখেছেন। ভূদেব যেমন প্রাট সাহেবের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন রামগতিও সে রকম উড্রো সাহেবের পরামর্শ পেয়েছিলেন। রোমাবতী সম্পূর্ণ সংস্কৃত আখ্যায়িকার রীতিতে লিখিত। ভাষাও কিঞ্চিৎ পণ্ডিতী। ইলছোবা অনেকটা সরল গদ্যে লিখিত। কিন্তু কাহিনী পরিকল্পনায় এ বইটিও সংস্কৃত কথা কিংবা আখ্যায়িকার অনুরূপ। দণ্ডীর সূত্র অনুযায়ী কথা কিংবা আখ্যায়িকা কতগুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এবং 'কথা'তে কন্যাহরণ কাহিনীর অন্যতম বিষয়বস্তু। ইলছোবাও 'উচ্ছ্বাসে' বিভক্ত। কন্যাহরণ তো আছেই। তা ছাড়া কাহিনীটি কোন্ ছাঁদে লেখা তা লেখক কথারম্ভে পাদটীকায় নারদ-বিষ্ণুর গল্প উদ্ধার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থে শকুন্তলা থেকে শ্লোক উদ্ধারও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের আর এক প্রমাণ।

ইতিহাসের প্রতি লেখকের আস্থা ছিল। রামগতির অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (১৮৫৮), বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ (১৮৬৯) যদিও অনুবাদগ্রন্থ তথাপি লেখকের ইতিহাসচর্চার প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হিসেবে এইগুলি বিবেচ্য। রামগতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং ইলছোবার ইতিবৃত্ত নিয়ে কাহিনী রচনার উৎসাহ কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তার উপর ইলছোবা লেখকের নিজের জন্মভূমি। জন্মভূমির কথা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করবার আকাঙ্ক্ষা রামগতির পক্ষে স্বাভাবিক। এ বস্তু বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। প্রাচীন কবিরা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে স্বগ্রামের কীর্তিকথা বলতে ভোলেন নি। কৃত্তিবাস বলেছেন—

> গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
> দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিনী॥

রামগতির 'গ্রামরত্ন' ইলছোবার পুরাকীর্তি তাঁকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। ইলছোবার কাহিনীটি এই।

ভগবতীতলায় ইলছোবা গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছেন। এমন সময়ে দেবী ভগবতী দেখা দিলেন। এই ভগবতী-তলা এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের বর্তমান জীর্ণ অবস্থা পূর্বে ছিল না। রাজা গণেশের সময়ে এর ঐশ্বর্য প্রাচুর্য ছিল। দেবী সেই ইতিহাস ব্রাহ্মণকে বলে গেলেন।

লক্ষ্মীকান্ত যশোরে থাকেন। পুত্র কন্যা নিয়ে তিনি সৎভাবে জীবন যাপন করতেন। তখন গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। রাজ্যে অত্যাচার ইত্যাদি দেখা দিল। লক্ষ্মীকান্ত করীম খাঁর বিষনজরে পড়লে। সে এক সন্ন্যাসীর কাছে রূপা থেকে সোনা করার অলৌকিক কৌশল জেনে নিলে। রামধন লক্ষ্মীকান্তের প্রতিবেশী। তার কন্যা দামিনী, পত্নী মঙ্গলা। দামিনীকে করীম খাঁ অপহরণ করলে। দামিনী করীম খাঁকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করলে। লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলবিলা এবং পুত্র হরিদাস। হরিদাস করীম খাঁর পাইক পেয়াদার সঙ্গে লড়াই করে আহত হল। ব্যাপার দেখে লক্ষ্মীকান্ত কন্যা ইলবিলা এবং পত্নী গোবিন্দমণিকে নিয়ে ঝিঁটকীপোতা চলে এল। রামধনও সঙ্গ ছাড়লে না। এখানে তারা পরিচয় পেল নীলমণি পাল এবং তার পত্নী বাঁকা ও কন্যা মাধবীর। ইলবিলা, নীলমণির কন্য। মালতী ও মাধবী শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ংদার মতো সুখে দিন কাটাতে লাগল। অতুল সোনা সপ্তগ্রাম এবং পাণ্ডুয়ায় বেশ বাজার পেলে। সন্ন্যাসী এসে একদিন লক্ষ্মীকান্তকে গৌড়রাজসমীপে যেতে বললেন। লক্ষ্মীকান্ত গৌড়রাজকে তার সৌভাগ্যের কথা জানালে। রাজা গণেশ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রাড়্বিবাকের পদ দিলে। উজীর রহিম খাঁর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল। লক্ষ্মীকান্তের নামে লক্ষ্মীকান্তপুর হরিদাসের নামে দাসপুর গ্রাম হল। লক্ষ্মীকান্তের কন্যা ইলবিলা রাজা গণেশের পুত্র যদুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। যুবরাজ অসম সাহস প্রদর্শন করে ব্যাঘ্রযুদ্ধে জয়ী হল। আহত হয়ে লক্ষ্মীকান্তের গৃহে তিনি এলেন। ইলবিলা সেবাশুশ্রূষার দ্বারা তাকে আরোগ্য করলে। উভয়ে বিবাহ-প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। ওদিকে লক্ষ্মীকান্তের পুত্র হরিদাস উজীর কন্যা সোনাবিবির প্রেমে পড়ল। এর পর লক্ষ্মীকান্ত কন্যা নিয়ে

স্বগ্রামে এল। ইলবিলার বিবাহ স্থির হল। দেবপল্লীর রাজা যখন বিবাহ বাসরে এল তখন যুবরাজ ছদ্মবেশে এসে ইলবিলাকে হরণ করে নিলে এবং তাদের বিবাহ হল। মালতী ও মাধবীকে দেবপল্লীর রাজা দেবপাল বিবাহ করলেন। ইলার বিবাহ সভা যেখানে স্থাপিত হয়েছিল তার নাম হল ইলাসভা বা ইলছোবা।

রামগতি নিজ গ্রামের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। দৌলতাবাদ, ইন্দ্রপুরী, জাহাঙ্গীরনগর ইত্যাদি নামের পশ্চাতে ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। এগুলির মূলে বাস্তব ঘটনা কতটা আছে তা বলা দুরূহ কিন্তু স্মৃতিবাহিত হয়ে এই সমস্ত ঘটনা লোকের মনে দানা বেঁধেছে। সুতরাং এগুলি নিছক বাস্তব অপেক্ষা সত্য। রামগতির কৃতিত্ব এখানে যে সেই সমস্ত অল্পপ্রচলিত ইঙ্গিতগুলি নিয়ে একটি কাহিনী রচনা করে সমস্ত ঘটনাগুলির ঐক্যসাধন করেছেন। এই ঐক্যবিধায়ক শক্তির চমৎকারিত্বই কাহিনীটির প্রাণ।

ভগবতীতলা লক্ষ্মীকান্তের গৃহদেবীর নাম অনুসারে। যেখানে দেবীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে তার পাশের পুকুরটির নাম দেউলগড়ে। দেবকুল থেকে দেউল। চম্পকলতা রস দিয়েই সোনা প্রস্তুত করা হত। চম্পকলতা যেখানে পাওয়া যায় তার নাম চাঁপ্‌তা। দেবপল্লী নাম কালে দেপাড়া হয়েছে। ইলছোবা, দাসপুর, লক্ষ্মীকান্তপুরের কথা আগে বলেছি। দেবপাল মালতী মাধবীকে বিবাহ করলেন। মালতী-মাধবী অন্ত্যজ শ্রেণীর। রাজা এদের পুকুরের ধারে বাড়ি করে দিলেন। দুই সতীনে মিলে মিশে আছে। এজন্যই স্থানটির নাম হল দোসতীনা। ইলাসভার জাঁকজমক ঐশ্বর্য লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। একে আর গ্রাম বলে চেনা যায় না। হঠাৎ মনে হয় এ বুঝি নগর। সুতরাং ইলছোবার কিয়দংশ 'হঠ নগর' নামেই খ্যাত হইয়া গিয়াছে"।

ঐতিহাসিক তথ্যগুলির প্রামাণিকতা একেবারেই নেই। গণেশ বিঠুরের জমিদার নন। সন্ন্যাসী কর্তৃক গণেশ রাজা হন। এইটিও কল্পনা। যদুর অপর নাম ফিরিস্তার তারিখ-ই-আকবরীতে জিতমল। রামগতি বলেছেন চেৎমল। পাণ্ডুয়া অবশ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। যদুর মুসলমানধর্ম গ্রহণের কোনো কারণই লেখক দেন নি।

ইলবিলার প্রথম দর্শনেই প্রেম, সেবা, শুশ্রূষা প্রেমিকের প্রতি আত্যন্তিক

নিষ্ঠা সবই রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। যতুর ব্যাঘ্রযুদ্ধ ইংরেজি উপন্যাসের ছাঁদে পরিকল্পিত। সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ এ জাতীয় উপন্যাসে বিশেষ বেমানান হয় নি। নিদ্রিত ব্রাহ্মণ লেখক স্বয়ং।

জঙ্গলা এবং বাঁকার কার্যকলাপ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আচারআচরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দুটি চরিত্র বাস্তবসম্মত। লালবিবি কূটনীতির প্রতীক। দামিনীর সাহসিকতা ও মৃত্যুবরণ রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।

ইলছোবার এই কটি অংশ। প্রথম, কাহিনীর ভূমিসংস্থান; দ্বিতীয়, কথারম্ভ; পরে আটটি উচ্ছ্বাস।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের চিত্তবিনোদিনী হল 'সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস'। বইটি বার হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৪)। এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটিও প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালির দেশচর্চার (দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য পরিষৎ প্রবন্ধ) নিদর্শন হিসেবে এই সমস্ত বইয়ের মূল্য অনস্বীকার্য। চিত্তবিনোদিনী গ্রন্থটি দু ভাগে বিভক্ত। একটি ইংরেজ পরিবার এবং একটি বাঙালি পরিবারের যোগসূত্র এই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্তু। সিপাহী বিদ্রোহের টানাপোড়েনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই দুই পরিবারের কাহিনী গোবিন্দচন্দ্র বর্ণনা করেছেন।

বাংলার বারাসত অঞ্চলের প্রতাপচন্দ্র বসুর পুত্র চারুচন্দ্র এবং তারই ইংরেজ স্ত্রীর গর্ভজাতপুত্র বিজয়ের সঙ্গে মিঃ রেমণ্ডের দুই কন্যা এমি ও হেলেনা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা লেখক বিস্তৃতভাবে বলেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে বিজয় চারুচন্দ্রকে বিশ্বাস-ঘাতক সিপাহীদলভুক্ত বলে প্রতিপন্ন করে। চারুচন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। এর পর চারুচন্দ্র নানা কৌশলে মিঃ রেমণ্ডের পরিবারকে সিপাহীদের কবল থেকে মুক্ত করে। বিজয়ের অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায়। এমির সঙ্গে চারুচন্দ্রের এবং হেলেনার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ হয়।

সিপাহীবিদ্রোহে বিশেষত নানা সাহেবের অত্যাচারকাহিনীর এরকম

বর্ণনা অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে নেই। সিপাহীদের নিষ্ঠুরতার দিকগুলি লেখক পুংখানুপুংখ বর্ণনা করেছেন। বিদ্রোহীদের প্রতি লেখকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। এর প্রমাণ পাই চারুচন্দ্রের উক্তিতে—

> ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সদ্বিচার, দস্যু তস্করের ভয় হইতে নিষ্কৃতি, নিরাপদ ভাব বিদ্যালোকে, ধর্মবিষয়ক স্বাধীনতা, কর্তব্য, জ্ঞান, জীবন্তভাব, কুসংস্কার হইতে নিষ্কৃতি ইত্যাদি অসংখ্য উপকার কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে; ঐরূপ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন্ পাষণ্ড হস্তোত্তোলন করিতে চাহে? ভারতবর্ষে এরূপ রাজ্য কখন হয় নাই, হইবে কিনা সন্দেহ। হিন্দুরাজার সময় স্বাধীন থাকিয়াও ভারতবর্ষ এরূপ সুখে ছিল না। আর কোন্ রাজ্যে প্রজারা স্বাধীন থাকিতে পারে?

এই উক্তিতে উচ্ছ্বাস থাকলেও তখনকার শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজ সম্বন্ধে এই ধারণাই বলবৎ ছিল। 'পলাশির যুদ্ধে' ব্রিটানিয়া দেবীর বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। চারুচন্দ্র বলেছেন—

> মাতঃ ভারতভূমি। আর তোমার যন্ত্রণা দেখিতে পারি না। তোমার কুসন্তানেরা বিদেশীয়ের প্রতি কি না অত্যাচার করিতেছে— সেই বিদেশীয়েরা আবার প্রতিহিংসায় কি না করিবে।

সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা অপর উপন্যাস 'নানা সাহেবে'ও আমরা দীনেন্দ্র রায়ের খেদ একইভাবে প্রকাশ পেতে দেখেছি।

এই বইটি চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসগুলির উপর প্রভাব ফেলেছে বলে অনুমান করি। কাহিনীতে চমকসৃষ্টির প্রয়াস আছে। পরিশেষে পিতাপুত্রে মিলন, সকলের পরিচয় উদ্‌ঘাটন এগুলি গল্পের খাতিরে করা হয়েছে। এই জাতীয় চমকপ্রদকাহিনী এবং রহস্যবর্ণনা চণ্ডীচরণের বইতে সুলভ।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর রশিনারা ১২৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এটিকে ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান বলেছেন। বইটি দ্বারকানাথ লাহিড়ীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। বইটি লেখকের বহু পর্যটনক্ষম শ্রমের ফল। ইতিপূর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় প্রকাশিত হয়েছিল। রশিনারার বিষয়বস্তু অঙ্গুরীয় বিনিময়ের অনুরূপ। ভূদেবের বই বার হয়েছিল বঙ্কিমের রচনার পূর্বে। রশিনারাতে বঙ্কিমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে প্রভাব অপেক্ষা লেখকের মৌলিকতাও কম নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে

ইতিহাস মুখ্য নয়, রশিনারাতে ইতিহাসের স্থান অপ্রধান নয়। রশিনারাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায় স্বপ্নবৃত্তান্তে এবং পাঠকসম্বোধনে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে শিবজীর চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। রশিনারাতেও তাই। রশিনারা এবং শিবজীর প্রেমোপাখ্যান ভূদেবের উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত। রশিনারাতে এই উপাখ্যান বিস্তৃত। দূতী গোলাবীর মধ্যস্থতায় এই প্রেমের বিকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রেমের চিরন্তন ধারাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূদেব গোলাবীর উল্লেখ করেন নি। শিবজীর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতা ভূদেবের অপেক্ষা বেশি। শিবজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উদার মনোভাব এবং বীরত্ব লেখক কয়েকটি দৃশ্যে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

রশিনারাতে রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের পূর্বসূচনা দেখা যায়। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য যে তিনটি গ্রন্থ আছে অর্থাৎ অঙ্গুরীয় বিনিময়, রশিনারা এবং মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত তাতে শিবজীর চরিত্রের ঔপন্যাসিক রূপটি অতি সুন্দরভাবে পাই। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রশিনারার উল্লেখ নেই। বাঙালি যে শিবজীকে অবলম্বন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল এই তিনটি গ্রন্থ তার প্রমাণ।

বইটির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উৎস কন্টারের 'দি চীফ মার্হাটা'। রোমান্সের আতিশয্য বিশেষ নেই। তবে প্রেমবর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের মতো। শিবজীর পলায়নের দৃশ্যটি এখানে সংক্ষিপ্ত। ভূদেবের গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গোপযোগী। ভূদেবের বর্ণনায় আওরঙ্গজেব চরিত্র তাঁর ভালোমন্দ নিয়ে দীপ্যমান। বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের সন্দেহপ্রবণতার নিদর্শন হিসেবে তাঁর পত্রলেখা এবং সেই সময়ে আওরঙ্গজেবের পূর্বাপর চিন্তার দৃশ্যটি চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর গ্রন্থে রশিনারার জীবন অনেকটা বাংলাদেশের নারীসমাজের সমধর্মী। কিন্তু ভূদেবের গ্রন্থে রশিনারা রাজকীয় মর্যাদায় বিভূষিত। ভূদেব রশিনারার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি সাজাহানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কালীকৃষ্ণ সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেপথ্যে রেখেছেন বলে ভূদেবের রচনার মতো প্রশংসা দাবি করতে পারে না। তবে ঘটনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিস্ফুটনে লেখকের আগ্রহ সমধিক হওয়ায় রশিনারার অন্যতর স্বাদবৈচিত্র্য উপেক্ষণীয় নয়।

হারাণচন্দ্র রাহা

হারাণচন্দ্র রাহার রণচণ্ডী (১৮৭৬) স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। হারাণচন্দ্র কাছাড় অঞ্চলের অধিবাসী, লোকমুখে কাছাড়ের গালগল্প শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। পরে যখন উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা জাগল তখন তিনি ইতিবৃত্তগুলিকে ঐক্যের বন্ধনে নিয়ে এলেন। লোকপ্রচলিত কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> কোন ইতিহাসে রণচণ্ডী সম্বন্ধে কিছু পাঠ করি নাই। রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে সকল কথা কাছাড় দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল। রাজকৃষ্ণ রায় নামে জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোক কাছাড়ের বিধবা রানীদিগেব উকিল ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কাছে বসিয়া আমি রণচণ্ডী সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিতাম। তদ্ভিন্ন কাছাড়ের এক রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের এক নাপিত ছিল। ক্ষৌর কর্ম শেষ হইলে তাহাকে আমি অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিতাম ও তাহার মুখে রণচণ্ডী সম্বন্ধে বিস্তর কথা শুনিতাম।

এর পর লেখক কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সে প্রাচীন রাজবংশ এখন লুপ্ত (১২৯৪)। হারাণচন্দ্রের বইটির জনপ্রিয়তা ছিল। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তিনটি সংস্করণই তাব প্রমাণ!

স্থানীয় ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিকের কাছে বিশেষ আবেদন নিয়ে আসে। রণচণ্ডীর সঙ্গে স্কটের বইগুলির তুলনা করি না। কিন্তু ব্রাইড অফ ল্যামারমুরের কাহিনীও স্থানীয়। স্কট ভূমিকাতে সে ইতিবৃত্ত বলেছেন বিস্তৃতভাবে। আমাদের দেশে স্থানীয় গালগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলন নেই। এ-অভাব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক পূরণ করেন কল্পনার অনুরঞ্জনের দ্বারা। হারাণচন্দ্র স্থানীয় ইতিবৃত্তের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজাদের মিলন-সংঘর্ষের কাহিনী মিলিয়ে দিয়েছেন। তবে ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা যে একেবারে ছিল না সে কথা বলা যায় না। সে কথা পরে বলছি।

মির জুমলা শ্রীহট্ট এবং কাছাড় অভিযান করেন। মির জুমলার সৈনাধ্যক্ষ শিয়ার শা এ অভিযানের নায়ক ছিলেন। শিয়ার শা কাছাড়ের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণকে বধ করে কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। উপেন্দ্র-নারায়ণের পত্নী মন্দাকিনী এবং পুত্র চন্দ্রনারায়ণ (শত্রুদমন) শিয়ার শা-র প্রাণবধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করলেন। মন্ত্রী রামজীবন রায়ও এদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ইতিহাস মুখ্য নয়, রশিনারাতে ইতিহাসের স্থান অপ্রধান নয়। রশিনারাতে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায় স্বপ্নবৃত্তান্তে এবং পাঠকসম্বোধনে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটিতে শিবজীর চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। রশিনারাতেও তাই। রশিনারা এবং শিবজীর প্রেমোপাখ্যান ভূদেবের উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত। রশিনারাতে এই উপাখ্যান বিস্তৃত। দূতী গোলাবীর মধ্যস্থতায় এই প্রেমের বিকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রেমের চিরন্তন ধারাটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূদেব গোলাবীর উল্লেখ করেন নি। শিবজীর চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতা ভূদেবের অপেক্ষা বেশি। শিবজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, উদার মনোভাব এবং বীরত্ব লেখক কয়েকটি দৃশ্যে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

রশিনারাতে রমেশচন্দ্রের মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের পূর্বসূচনা দেখা যায়। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য যে তিনটি গ্রন্থ আছে অর্থাৎ অঙ্গুরীয় বিনিময়, রশিনারা এবং মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত তাতে শিবজীর চরিত্রের ঔপন্যাসিক রূপটি অতি সুন্দরভাবে পাই। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতে রশিনারার উল্লেখ নেই। বাঙালি যে শিবজীকে অবলম্বন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল এই তিনটি গ্রন্থ তার প্রমাণ।

বইটির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উৎস কন্টারের 'দি চীফ মার্হাটা'। রোমান্সের আতিশয্য বিশেষ নেই। তবে প্রেমবর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের মতো। শিবজীর পলায়নের দৃশ্যটি এখানে সংক্ষিপ্ত। ভূদেবের গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গোপযোগী। ভূদেবের বর্ণনায় আওরঙ্গজেব চরিত্র তাঁর ভালোমন্দ নিয়ে দীপ্যমান। বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের সন্দেহপ্রবণতার নিদর্শন হিসেবে তাঁর পত্রলেখা এবং সেই সময়ে আওরঙ্গজেবের পূর্বাপর চিন্তার দৃশ্যটি চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর গ্রন্থে রশিনারার জীবন অনেকটা বাংলাদেশের নারীসমাজের সমধর্মী। কিন্তু ভূদেবের গ্রন্থে রশিনারা রাজকীয় মর্যাদায় বিভূষিত। ভূদেব রশিনারার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটি সাজাহানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কালীকৃষ্ণ সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেপথ্যে রেখেছেন বলে ভূদেবের রচনার মতো প্রশংসা দাবি করতে পারে না। তবে ঘটনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিস্ফুটনে লেখকের আগ্রহ সমধিক হওয়ায় রশিনারার অন্তুতর স্বাদবৈচিত্র্য উপেক্ষণীয় নয়।

হারাণচন্দ্র রাহা

হারাণচন্দ্র রাহার রণচণ্ডী (১৮৭৬) স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। হারাণচন্দ্র কাছাড় অঞ্চলের অধিবাসী, লোকমুখে কাছাড়ের গালগল্প শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। পরে যখন উপন্যাস রচনা করার প্রেরণা জাগল তখন তিনি ইতিবৃত্তগুলিকে ঐক্যের বন্ধনে নিয়ে এলেন। লোকপ্রচলিত কাহিনীকে উপন্যাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> কোন ইতিহাসে রণচণ্ডী সম্বন্ধে কিছু পাঠ করি নাই। রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে সকল কথা কাছাড় দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল। রাজকৃষ্ণ রায় নামে জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোক কাছাড়ের বিধবা রানীদিগের উকিল ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কাছে বসিয়া আমি রণচণ্ডী সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা শুনিতাম। তদ্ভিন্ন কাছাড়ের এক রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের এক নাপিত ছিল। ক্ষৌর কর্ম শেষ হইলে তাহাকে আমি অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিতাম ও তাহার মুখে রণচণ্ডী সম্বন্ধে বিস্তর কথা শুনিতাম।

এর পর লেখক কাছাড় রাজবংশের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। সে প্রাচীন রাজবংশ এখন লুপ্ত (১২৯৪)। হারাণচন্দ্রের বইটির জনপ্রিয়তা ছিল। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তিনটি সংস্করণই তার প্রমাণ!

স্থানীয় ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিকের কাছে বিশেষ আবেদন নিয়ে আসে। রণচণ্ডীর সঙ্গে স্কটের বইগুলির তুলনা করি না। কিন্তু ব্রাইড অফ ল্যামারমুরের কাহিনীও স্থানীয়। স্কট ভূমিকাতে সে ইতিবৃত্ত বলেছেন বিস্তৃতভাবে। আমাদের দেশে স্থানীয় গালগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলন নেই। এ-অভাব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক পূরণ করেন কল্পনার অনুরঞ্জনের দ্বারা। হারাণচন্দ্র স্থানীয় ইতিবৃত্তের সঙ্গে প্রান্তীয় রাজাদের মিলন-সংঘর্ষের কাহিনী মিলিয়ে দিয়েছেন। তবে ঘটনাগুলির ঐতিহাসিকতা যে একেবারে ছিল না সে কথা বলা যায় না। সে কথা পরে বলছি।

মির জুমলা শ্রীহট্ট এবং কাছাড় অভিযান করেন। মির জুমলার সৈনাধ্যক্ষ শিয়ার শা এ অভিযানের নায়ক ছিলেন। শিয়ার শা কাছাড়ের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণকে বধ করে কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। উপেন্দ্র-নারায়ণের পত্নী মন্দাকিনী এবং পুত্র চন্দ্রনারায়ণ (শত্রুদমন) শিয়ার শা-র প্রাণবধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করলেন। মন্ত্রী রামজীবন রায়ও এদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

কাছাড়ের সীমান্তে কুকিদের বাস। রামজীবন এবং শক্রদমন হৃতসর্বস্ব হয়ে কুকি অঞ্চলে চলে আসেন। কুকিদের সর্দার কুলপিলালের পালিতা কন্যা রণু তাদের নিয়ে এল। কুলপিলাল এদের যথাযোগ্য সমাদর করে আশ্রয় দিলে। রামজীবন এবং শক্রদমনের চেষ্টা ছিল সৈন্যবল সংগ্রহ করে কাছাড় আক্রমণ করা। কুকিরা সরল প্রাণ। পার্শ্ববর্তী মণিপুর অঞ্চলে কুকিদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিল না। মণিপুররাজের আশ্রিত কুকিজাতি শোষিত। বিজেতা-বিজিত সম্বন্ধ তিক্ততার সৃষ্টি করলে। মণিপুররাজ বীরকীর্তি কুকিদের শৌর্যবীর্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না। রামজীবন কুকিদের বোঝালেন। তাঁর ইচ্ছা কুকি এবং মণিপুর সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন। মণিপুর অভিমুখে সকলে রওনা হল। রণু শক্রদমনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। পথে কোনো বিপদের সম্ভাবনা সুতরাং সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। মণিপুরের আশ্রিত ভরতসিংহ রামজীবন এবং শক্রদমনকে বন্দী করলে। রণু শক্রদমনকে উদ্ধার করলে। এর পর নানা বাধাবিপত্তি কাটিয়ে শক্রদমন মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হল। মণিপুররাজ এঁদের অভ্যর্থনা করলেন। মণিপুররাজ কাছাড় আক্রমণ করতে রাজী হলেন একটি সর্তে। সর্তটি হল রানী মন্দাকিনীর সাহায্যে আসামরাজ থেকে আসালু রাজ্য মণিপুরকে দিতে হবে। মন্দাকিনী ছিলেন আসামরাজের ভগ্নী। রামজীবন শক্রদমনকে পাঠালেন মণিপুররাজের দাবি জানাতে। বীরকীর্তির দাবি শক্রদমন মাতাকে জানালে। মন্দাকিনী এতে সম্মত হলেন না। ওদিকে বীরকীর্তি কুকিদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেন না। কুলপিলাল ইত্যাদি মণিপুরের বিরুদ্ধে লেগে রইল। রামজীবন কুকিজাতির প্রতি স্নেহ পোষণ করলেও বীরকীর্তির পক্ষ অবলম্বন করলেন। এর পর কতগুলি যুদ্ধের বর্ণনা পাচ্ছি। শক্রদমন কুকিদের সাহায্যে মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে। মণিপুররাজ-দুহিতা ইরাবতীর সঙ্গে তার বিবাহের ঠিক ছিল। কিন্তু শক্রদমন এতে রাজী হল না। শক্রদমনের সঙ্গে রণু এসে দাঁড়াল যুদ্ধক্ষেত্রে। রণু অসম সাহস প্রদর্শন করে আহত হল। আহত অবস্থায় সে শক্রদমনকে অনুরোধ জানালে অন্নদাকে বিবাহ করতে। অন্নদাকে যুদ্ধের সময় পাওয়া গিয়েছিল শত্রুর বন্দী অবস্থায়। সেও মুসলমান অত্যাচারে প্রপীড়িতা। রণুও তাই ছিল। রণু নবদ্বীপ অধিবাসী ব্রাহ্মণ কন্যা। শক্রদমন অন্নদাকে গ্রহণ করতে রাজী হল। রণচণ্ডীর (রণু) মৃত্যু ঘটল।

রণচণ্ডী যে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছিল সে তরবারি পূত এবং রাজগৃহে গৃহদেবীর সম্মানে পূজিত হতে লাগল।

রণচণ্ডী স্থানীয় ইতিবৃত্ত নিয়ে লেখা হলেও এর মধ্যে পাচ্ছি একটা বৃহত্তর পটভূমিকা। আসামরাজ, মণিপুররাজের দ্বন্দ্ব-কলহ কতখানি ঐতিহাসিক তা বলা কঠিন। কিন্তু মণিপুররাজ এবং আসামরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব প্রায়ই দেখা দিত। মণিপুর এবং কুকিদের দ্বন্দ্বও কৌতূহলোদ্দীপক।

শত্রুদমন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। 'শুক্রধ্বজ' চিলারায় জয়ন্তিয়া নৃপতি বিজয়মানিকের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং বিজয়মানিকের পুত্র প্রতাপ রায় জয়ন্তিয়ার করদরাজ্যরূপে স্বীকৃত হয়। প্রতাপ রায়ের পুত্র ধনমানিক সিমারয়ার রাজা প্রভাকরকে পরাজিত করলে ধনমানিক শত্রুদমনের আশ্রয় চান। সেই অনুসারে শত্রুদমন জয়ন্তিয়াপতিকে পরাজিত করেন। এর পর ধনমানিকের ভাগিনেয় যশোমানিক শত্রুদমনের বিরোধিতা করেন। যশোমানিক আহোমরাজের সহায়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু পরিণামে শত্রুদমনই জয়লাভ করলে। গেইটের আসামের ইতিহাসে এর পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যাবে। এই কীর্তিকে স্থায়ী করবার জন্য শত্রুদমন রাজধানীর নাম রাখলেন কীর্তিপুর।

ইতিহাসে শত্রুদমনের বাল্যইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। লেখকের জনশ্রুতিই এ ক্ষেত্রে প্রধান সহায় ছিল। এই শত্রুদমনের নামান্তর নির্ভয়-নারায়ণ। লেখক রণচণ্ডী সম্বন্ধে যে গল্পটি শুনেছিলেন তার অন্য একটি রূপ এখানে তুলে দিচ্ছি। গল্পটি চিত্তাকর্ষক।

> একদা তিনি (নির্ভয় নারায়ণ) স্বপ্নদর্শনে নদী তীরে গিয়া সর্পরূপিণী রণচণ্ডী দেবীকে দর্শন করেন। বিষধর সর্পকে তাঁহার ভয় হইল না, দেবী জ্ঞানে নির্ভয় চিত্তে তাহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেন, সর্প তৎক্ষণাৎ অসিতে পরিণত হইল। এই দেবীরূপী তরবারি লইয়া তিনি গৃহে আগমন করিলেন। পরে রাত্রে পুনঃ স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, এই অসি সযত্নে সংরক্ষিত হইলে, তৎকৃপায় রাজবংশে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না। এই তরবারি তদবধি রাজবংশে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়।[২]

হারাণচন্দ্রের রণচণ্ডীর সঙ্গে এ গল্পের কোনো মিল নেই। তবে নির্ভয়নারায়ণ বা শত্রুদমনই যে রণচণ্ডীর প্রতিষ্ঠাতা তার প্রমাণ পেলাম।

১ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত

২ অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, 'উপসংহার, কাছাড়ের কথা'।

রণচণ্ডীর বিষয়বস্তু সারালো। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ জাতীয় ঘটনা বিশেষ পাওয়া যায় না। পার্বত্য অধিবাসীদের নিয়ে কাহিনী রচনায় মধ্যে অভিনবত্ব আছে নিশ্চয়ই। লেখক কাছাড় অঞ্চলের। এই কারণে সীমান্তে অবস্থিত পার্বত্যবাসীদের রীতিনীতি তার পক্ষে জানা সহজ হয়েছিল। রুদ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রবীণ এবং নবীনের মতদ্বৈত চিত্তাকর্ষক। রুদ্র চায় মণিপুরের বিরুদ্ধে অভিযান কিন্তু কুলপিলাল সন্ধি এবং আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র। রুদ্রের কাছে দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ পরম শ্লাঘার বিষয়। মণিপুররাজের কাছে তার দম্ভোক্তি, শত্রুদমনের দ্বৈরথযুদ্ধে জাতিগত বিশেষ প্রবণতার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, রণুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেম নিবেদন উপন্যাসটির অন্যতম প্রশংসনীয় দিক। কুলপিলাল, আতঙ্গী, রুদ্র, পাহাড়ী জাতির বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু দিককে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকৃতিপ্রভাবিত মানবজীবনের কথা হারাণচন্দ্র ব্যাখ্যাবিশ্লেষণেই সমাপ্ত করেছেন। দু-একটি চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে আরণ্যক প্রবৃত্তির বিশেষ কোনো স্বাক্ষর দেখতে পাই না। পার্বত্য অধিবাসীদের সঙ্গে সমতলবাসীর মৌল প্রভেদ লক্ষগোচর হয় না বলে' উপন্যাসটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত। মণিপুররাজ সম্বন্ধেও একই কথা।

তবে উপন্যাসটির মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার রোমান্স যতই থাক না কেন পরবর্তী উপন্যাসের মতো নীতিকথনের চাপে লেখক গল্পের খেইকে কোথাও ব্যাহত হতে দেন নি। রণচণ্ডীর আখ্যান অংশ দ্রুতগতিতে চলেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশিষ্ট ধর্ম অনুযায়ী প্রেম, আদর্শবাদ, সুন্দরী নারীর প্রতি মোহ, যুদ্ধের তূর্যনিনাদ থাকলেও লেখক এদের বিস্তৃত বর্ণনায় কাহিনীর অবারিত গতিকে রুদ্ধ করেন নি।

মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসুর দীর্ঘ ঐতিহাসিক নবন্যাস দুলীন ১২৮০ সালে আরম্ভ হয়। প্রথমে বইটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পরে পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৮১৩ শকাব্দে। বইটির পুরো নাম

ছিল 'তুলীনের আশ্চর্য জীবন বা মহারাজা রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নবন্যাস'। গ্রন্থটির নাম দীর্ঘ হওয়াতে লেখক পরে নাম দিলেন তুলীন।

বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, ভারতের কোনো-এক স্বাধীন রাজার রাজত্বকাল প্রদর্শন করবার জন্যেই উপন্যাসটি লিখেছেন্। নানা কারণে রণজিৎসিংহের রাজত্বকালই লেখকের মনোভাব প্রকাশের অনুকূলে বলে মনে হয়েছিল। হেনরি লরেন্সের বইটি লেখকের অবলম্বন ছিল। ঐতিহাসিক তথ্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত জুড়ে আছে। তবে কল্পনার স্থান যে একেবারেই নেই সে কথা বলা যায় না।

গ্রন্থটিতে সেকালের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে লেখক যত্নের ত্রুটি করেন নি। সামরিক কৌশল, যুদ্ধের অস্ত্র ইত্যাদির বর্ণনা, দস্যুদের অত্যাচার, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র লেখকের বর্ণনার অন্যতম অংশ। যুদ্ধের অস্ত্র-বর্ণনায় লেখকের বিরাম নেই। তুলীনের প্রতি লেখকের সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট। গ্রন্থ লেখবার সময়ে তুলীন জীবিতও ছিলেন।

কিন্তু সব মিলে গ্রন্থটির মধ্যে একটা ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কাহিনীর গতি অত্যন্ত শ্লথ। কাহিনীটি পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। ভাষাও অত্যন্ত নীরস। অবান্তর বিষয়ের সংযোজনা সর্বত্র। অন্য দিকে উপন্যাসের আঙ্গিকের প্রতি লেখকের নিষ্ঠার একান্ত অভাব লক্ষ করা যায়। সেকালের নাটকের মতো দীর্ঘ বিলাপ, ভাবাবেগের আতিশয্য গ্রন্থটির আষ্টেপৃষ্ঠে। সুতরাং এই দীর্ঘ উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক যে উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন তা সফল হয় নি।

কেদারনাথ চক্রবর্তী

কেদারনাথ চক্রবর্তীর ঐতিহাসিক উপন্যাস চন্দ্রকেতু ১২৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে লেখা এই উপন্যাসটির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই। ভূমিকাতে লেখক ম্যাক্সমূলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রাচীন ইতিহাসচর্চা করেছেন এ কথা বলেছেন।

বালণ্ডা নগরীর (অধুনা বালণ্ডা পরগণা) রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে পীর গোরাচাঁদের যুদ্ধ গ্রন্থটির বিষয়। লক্ষ্মণসেনের পর রাজা চন্দ্রকেতু সাহসের

সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মহম্মদ গোরাচাঁদ চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত করেন। বিজয়কেতুর সাহসিকতায় সাময়িকভাবে রাজ্য রক্ষা হলেও রাজা চন্দ্রকেতু পত্নীর শোকে আত্মবিসর্জন করলেন। বিজয়কেতু প্রণয়ী মালতীর শোকে সেই পথ অবলম্বন করলেন।

লেখক যুদ্ধের বর্ণনা অপেক্ষা মালতী-বিজয়কেতুর প্রেম বর্ণনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সে বর্ণনা তরল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। ভাবাবেগ প্রবণতা আত্যন্তিক হওয়াতে গ্রন্থটিতে চরিত্র এবং ঘটনার আকর্ষণ বিশেষ কিছু নেই। চন্দ্রকেতু স্বাধীন রাজা বটে কিন্তু তাঁর মুখে স্বদেশপ্রেমের বাণী অত্যন্ত বেমানান। কেননা তাঁর দম্ভ ছিল কিন্তু যুদ্ধ করবার মতো শক্তি ছিল না।

গ্রন্থটির আরম্ভ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা-তিলোত্তমা যথাক্রমে ইন্দুমতী এবং মালতী। বিমলার অনুসরণে চম্পকলতা চিত্রিত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুসরণ ছাড়া লেখকের চরিত্রঅঙ্কনে কোনো কৃতিত্ব নেই।

বইটির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে গোরাচাঁদের উল্লেখে। পরে এই গোরাচাঁদ পীরে পরিণত। এই পীর গোরাচাঁদকে কেন্দ্র করে নানাবিধ কেচ্ছা রচিত হয়েছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাল প্রতাপচাঁদ ১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শনে বার হয়। পরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বইটিকে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলেছেন। বিজ্ঞাপনে লেখক যথার্থ বলেছেন—

> আমাদের ইতিহাস নাই। যাহা আমরা বাঙ্গালীর ইতিহাস বলিয়া পাঠ করি, তাহা ইংরেজের ইতিহাস। বঙ্গভূমে ইংরেজের কীর্তিকলাপকে বাঙ্গালীর জিনিস বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি। এই ভ্রম দূর করিবার সময় এখনও হয় নাই। যখন সে সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইতিহাস উপযোগী উপকরণের অভাব না হয়, এই প্রত্যাশায় এক এক সময়ের সামাজিক দুই চারিটা কথা লিখিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সে জন্য আপাততঃ জাল-রাজাকে উপলক্ষ্য করা গিয়াছে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রথম রচনা গল্পকাহিনী। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি তাঁর আগ্রহ গোড়া থেকেই ছিল। *Bengal Ryot* রচনার সংবাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র কি অপরিসীম পরিশ্রম করে এই বইটির জন্য উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। *Bengal Ryot*-এর সঙ্গে জাল প্রতাপচাঁদের অন্তত এক জায়গায় মিল পাচ্ছি। সেটি হচ্ছে উভয় গ্রন্থেই ইংরেজ আইনকানুনের পর্যালোচনা। পূর্বে আমাদের দেশের অবস্থা কিরকম ছিল সেইটি জানানোও এই দুই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জাল প্রতাপচাঁদ সঞ্জীবচন্দ্রের বিশিষ্ট রচনা। এ বইতে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। জাল প্রতাপচাঁদ আর-এক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তার আলোচনা করি। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচনে কিংবা চরিত্রসৃষ্টিতে সঞ্জীবচন্দ্রের একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন প্রতিবিম্বিত। পীতম চরিত্র এ দিক থেকে স্মরণীয়। দামিনী, রামেশ্বরের অদৃষ্টে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা বলা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র প্রতিভাবান হয়েও জীবনযুদ্ধে পরাজিত। তাঁর উন্নতির পথ ছিল রুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র এজন্য আক্ষেপও করেছেন। জাল প্রতাপচাঁদও তাঁর অদৃষ্টকে বারবার অস্বীকার করতে চেয়েছেন কিন্তু অবস্থার চাপে সত্যও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, জাল প্রতাপচাঁদের জীবনের সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের আরও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জাল প্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন, 'প্রতাপচাঁদের রাগ কেবল সিভিল সার্বেন্টদের উপর ছিল, তাহাদিগকেই তিনি বেয়াদপ বলিতেন'। সঞ্জীবচন্দ্র নিজের চাকরী-ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন ইংরেজ কর্মচারীদের। ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি তাঁর মনোভাব কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। জাল প্রতাপ-চাঁদের ক্ষেত্রে ওগলবি, লিটন ইত্যাদি ইংরেজ কর্মচারীর ষড়যন্ত্রের কথা সঞ্জীবচন্দ্র সবিস্তারে বলেছেন। তাঁদের মিথ্যাচার, কৌশল, ছলনাকে প্রকাশ করে তিনি বেনামিতে আসলে নিজের কথাই বলেছেন।

প্রতাপচাঁদ বাল্যে লেখাপড়া বেশি শেখেন নি। তবে ইংরেজি অনর্গল বলতে পারতেন। পরীক্ষা পাস সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনেও ঘটে নি। তবে শিক্ষা সংস্কৃতিতে তার মানসিক গঠন ছিল রাজকীয়। জাল রাজার

অধঃপতনের কাহিনী বলতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদের সংসর্গদোষ, প্রমারা খেলার কথা বলেছেন। আর সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্র বানরসম্প্রদায় (বন্ধুবর্গ) পরিবৃত হয়ে পরীক্ষার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

> কিন্তু পরীক্ষার দিন, কলেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। বিদ্যার মধ্যে এইটী তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল।[১]

প্রতাপচাঁদ কুসংসর্গে পড়ে যখন অধঃপাতে গেলেন তখন তাঁর অনুশোচনা এসেছিল এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রও বারবার পরাজিত হয়ে 'ভগ্নোৎসাহ' হয়ে পড়েন। এই-সকল ঘটনার সাদৃশ্য দেখে অনুমান করি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতাপচাঁদকে গ্রহণ করবার পশ্চাতে কেবলমাত্র তাঁর বিচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করাই মূল লক্ষ ছিল না বরং প্রতাপচাঁদের মধ্যে নিজ জীবনের সাধর্ম্য লক্ষ করে সঞ্জীবচন্দ্র পুলকিত হয়েছিলেন। ফলে ব্যক্তিগত সহানুভূতি দিয়ে প্রতাপচাঁদের ব্যথাস্নিগ্ধ দিকটিকে অপরূপভাবে প্রকাশ করতে সঞ্জীবচন্দ্র প্রেরণা পেয়েছিলেন। জীবনীও যে রচনাগুণে সাহিত্যসৃষ্টি হতে পারে জাল প্রতাপচাঁদ তার অন্যতম প্রমাণ।

জাল প্রতাপচাঁদ নিয়ে ইতিপূর্বে দুখানা ঐতিহাসিক কাব্য লেখা হয়েছিল। একখানি 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত'। তার কবি অনুপচন্দ্র দত্ত।[২] অপরটি দু পাতার একখানি পুথি। অনুপচন্দ্রের গ্রন্থের নামেই প্রকাশ কবি প্রতাপচাঁদকে ভক্তের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভক্তির আবেগে প্রতাপচাঁদ সেখানে মানুষরূপী দেবতা। প্রতাপচাঁদের 'অন্ত্যলীলা' কবিকে মুগ্ধ করেছিল। সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদের শেষ জীবনের সংবাদটুকু দিয়েছেন—তাকে বিস্তৃত করেন নি। কেন করেন নি তার কারণ সুস্পষ্ট। প্রাচীন ও নবীন লেখকের মধ্যে ইতিহাসচেতনা ভিন্নরূপ ছিল। পূর্বে বলেছি প্রতাপচাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের রূপটি দেখানোই সঞ্জীবচন্দ্রের বাসনা ছিল। প্রতাপচন্দ্রের শেষ জীবন তো আসলে উৎসাদিত বাসনার ধূসরিত পরিণাম। সঞ্জীবচন্দ্র প্রতাপচাঁদের শোচনীয় পরিণামের বর্ণনায় উল্লাস-

১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী
২ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

বোধ করতে পারেন না। অমৃতচন্দ্র নিজে সত্যনাথ প্রতাপচাঁদের শিষ্য ছিলেন। ধর্মশাসিত মনের আবেগ-বিহ্বলতার সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীতে'। আর সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকের মেলবন্ধন ঘটেছে। জাল রাজার সমগ্র কাহিনীটি বর্ণনা করতে সঞ্জীবচন্দ্র গল্পরসের কোথাও ব্যাঘাত করেন নি। তাঁর অন্তর্ধান, আবির্ভাব, বিচার-কাহিনী, স্বীকারোক্তি সাহিত্যসম্মত উপায়ে বর্ণিত। পরিশেষে সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন—

> তিনি প্রতাপচাঁদ হউন, আর জালরাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নয়। এর উদাহরণস্বরূপ তিনি জাল প্রতাপচাঁদের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> 'জাল প্রতাপচাঁদ'-নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র যে ঘটনাসংস্থান প্রমাণ-বিচার এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না— কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে জাল প্রতাপচাঁদের কৃতিত্বের দিকটি জানতে পারছি। ত্রুটির কথা যা উল্লেখ করেছেন তা সঞ্জীবচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী এবং প্রতিভার ঐশ্বর্যের দিকে লক্ষ রেখে। সে আলোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এ কথা ঠিক প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করলে হয়তো সঞ্জীবচন্দ্রের কৃতিত্ব আরও ভাস্বর হত কিন্তু এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎ-করতা সত্ত্বেও সঞ্জীবচন্দ্র জাল প্রতাপচাঁদকে হৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বীরবরণ' (১২৯০ সাল) ইতিবৃত্তমূলক নবন্যাস। এই নবন্যাস হিন্দুরাজা আদিশূরের গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে বিজয়কাহিনী। লেখক দেখিয়েছেন বৌদ্ধ রাজত্বে হিন্দুসমাজ উৎপীড়িত,

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, 'সঞ্জীবচন্দ্র'

লাঞ্ছিত। এই উৎপীড়ন এবং লাঞ্ছনা প্রজাদের নির্বীর্যের জন্য প্রতিকারহীন। পূর্ববঙ্গের রাজা বীরসেন যুদ্ধে বৌদ্ধরাজাকে পরাজিত করে আদিশূর উপাধি পান। মলয়ার মাতা বলেছিলেন, যে বৌদ্ধরাজাকে নিহত করবে সেই তার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। বীরেন্দ্র এই বীর। তাকেই মলয়া বরণ করলে। এজন্য গ্রন্থের নাম বীরবরণ। রোমান্সের বাহুল্যও আছে। মলয়া-বীরেন্দ্র প্রেমকাহিনী ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারের আকার লাভ করেছে। গ্রন্থের শেষে দেখি বীরেন্দ্র রাজসেনাপতি বিজয়চন্দ্রের পুত্র, মলয়া রাজারই কন্যা, মলয়ার মাতা উপেক্ষিতা রাজমহিষী। এই জাতীয় মিলন চমকপ্রদ বটে কিন্তু সাহিত্যের দরবারে এর কোনো স্থান নেই।

বৌদ্ধদের অত্যাচার পালরাজাদের আমল থেকেই চলে আসছে—এ সংবাদ অনৈতিহাসিক। উদ্দীপনাময়ী স্বদেশাত্মক বক্তৃতা দীর্ঘ এবং সাহিত্যরস-বর্জিত। বাংলাদেশের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক নিজের কালটিকে ভুলতে পারেন নি। এজন্য ঘটনাটি যে সুদূরের সে প্রত্যয় পাঠকের হয় না।

আর-একটি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালায় হিন্দু অত্যাচারের কাহিনী আছে। বৌদ্ধরাজার প্রতিষ্ঠার কথা আছে। এই বইটিতে তার বিপরীত অবস্থা দেখি। কাহিনী-রচনায় গোপালচন্দ্র সম্ভবত কাঞ্চনমালার কথা মনে রেখেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন দত্ত

কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়' (১২৯১) সিপাহীযুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের চিত্তবিনোদিনীর পর সিপাহীযুদ্ধ নিয়ে লেখা এ উপন্যাসটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন দত্তও সিপাহীবিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। কিন্তু তিনি এ বিদ্রোহকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি সিপাহীযুদ্ধের সম্পর্কে দুটি মূল্যবান্ মন্তব্য করেছেন। এক, ইংরেজের অত্যাচারের জন্য এই বিদ্রোহ। দুই, এ বিদ্রোহ সময়োপযোগী নয়। পরে বলেছেন

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। কিন্তু দেশের জনসাধারণ যদি শাসনভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত না হয় তবে বিদ্রোহের পরিণাম হবে ভয়াবহ। কেননা দেশ তা হলে আবার ফিউডাল যুগে পিছিয়ে যেতে পারে। সিপাহী বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত বীর ছিলেন সন্দেহ নেই। এঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও হয়তো সংশয় নেই। তথাপি এঁদের মধ্যে যেই জিনিসটির অভাব ছিল তা হচ্ছে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করবার মতো ক্ষমতার।

সুতরাং বিজয় উপন্যাসে এক দিকে সিপাহীদের ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্য দিকে সেই সংগ্রামের ব্যর্থতাই চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির নায়ক তান্তিয়া টোপি। লক্ষণীয়, প্রায় সকল ঔপন্যাসিকই বিদ্রোহের প্রতি প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করলেও তান্তিয়া টোপিকে এঁরা সহানুভূতির চোখে দেখিয়েছেন। তান্তিয়া টোপির বীরত্ব এঁদের মুগ্ধ করেছিল। এর কারণও আছে। তান্তিয়া বন্দী হয়ে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তাতে নির্ভীক সাহসী বীরেরই আত্মপ্রকাশ দেখি। কাপুরুষতার আশ্রয় নিয়ে আত্মদোষক্ষালন করতে চান নি তান্তিয়া টোপি। কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনিই প্রথম উপন্যাসে তান্তিয়ার বীরত্বমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল দিকটি লিপিবদ্ধ করলেন। পরবর্তী কালে চণ্ডীচরণ সেন, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।

বিজয়ের কাহিনী খুব সারালো নয়। কাহিনী অপেক্ষা সিপাহীদের বিদ্রোহসংক্রান্ত মনোভাবই এ উপন্যাসের বৃহত্তর ভূমিকা। মাধবরাও বেরারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তার দুই কন্যা বেলা ও মালতী এবং এক পালিত পুত্র বিজয়। বিজয় মাধবরাওয়ের অসম্মতি সত্ত্বেও সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দেয়। এবং তান্তিয়া টোপির সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিজয় এবং মালতী পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত। বিদ্রোহে তান্তিয়া টোপি নানা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ-সকল যুদ্ধে তান্তিয়া প্রথমে সাফল্যলাভ করলেও পরে পরাজিত হতে বাধ্য হন। নানা সাহেবও পরাজিত হয়ে নেপাল অঞ্চলে আশ্রয় নেন। সেখানে তার অন্তিম জীবন অতিবাহিত হয়। বিজয়ও যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করে। অবশেষে তান্তিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে নেপাল অঞ্চলে চলে আসে। নেপালে দস্যু মর্দনের আশ্রয়ে এরা থাকে।

বিজয়ের সঙ্গে মালতীর, মর্দনের সঙ্গে বেলার বিবাহ হল। যুদ্ধের অপর সৈনিক প্রতাপ ফুলকুমারীকে বিবাহ করে।

পূর্বে বলেছি, বিদ্রোহসংক্রান্ত মনোভাবই বিজয়ের আসল মূল্য। বিদ্রোহীরা এককালে ছিল নিমকহালাল। এখন নিমকহারাম কেন হল তার কারণ বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন ইংরেজরা বিদেশী। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি সহানুভূতি ইংরেজের ছিল না। অথচ

> সিপাহী ক্ষত্রিয়ের সন্তান, যুদ্ধ তাহার ধর্ম ; স্বার্থত্যাগ, উদারতায় তাহার অস্থিমাংস গঠিত ; সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু তাহার অক্ষয় স্বর্গের সোপান ; আর অপমান, অবহেলা প্রভৃতি তাহার নিকট বিষ। অপমানিত হইয়া যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রতিশোধ না লয়, অনন্ত নরক তাহার বাসস্থান।

ইংরেজ কর্তৃক অপমানিত হয়েই সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। নীল সাহেবের অত্যাচারে দেশ যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হল তখন কালীপ্রসন্নের তীব্র জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে এই কয় ছত্রে—

> কিন্তু তাহাতে কর্ণেল নীলকে আপনারা নিন্দা করিতে পারেন না, যে হেতু তিনি খৃষ্টান, তাহাতে আবার প্রতিহিংসা লইতেছেন মাত্র।

নিরীহ ইংরেজের প্রাণহনন তাস্তিয়ার ইচ্ছা ছিল না। নানা সাহেবেরও না। কিন্তু বিদ্রোহে সৈন্যরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাস্তিয়া এবং নানা সাহেবের নিষেধ শোনবার জন্য কেউ দাঁড়াল না। অত্যাচারের পরিবর্তে সিপাহীরাও নৃশংস অত্যাচার করলে। তাস্তিয়া এবং নানা সাহেব স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই দুই বীরকে এর জন্য দায়ী করলেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন—

> হা হতভাগ্য নানা ধুন্ধুপন্থ! হা হতভাগ্য তাস্তিয়া তুপি। একবার আসিয়া দেখ কৃতজ্ঞ ইংরেজ ইতিহাস লেখক আজ কি রঙ্গে তোমাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকের পক্ষপাতদুষ্ট চিত্র কালীপ্রসন্নকে পীড়িত করেছিল। সে যুগের পক্ষে কালীপ্রসন্নের মর্মবেদনার এই নির্ভীক প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে। ভারতবাসীদের নির্বিচারে নির্ধন করলে পর সেই সমস্ত হতভাগ্যদের প্রতি লেখকের সমবেদনা লক্ষণীয়।

> যাও, নির্দোষী ভারতশিশু, ভারতনন্দিনী, যাও, এ সংসার ছাড়িয়া সেই দেশে যাও, যে দেশে বলবান্ দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না, যে দেশে এক মানুষ অপর মানুষকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় হিংসা করে না, যেখানে তাপ নাই, দুঃখ নাই, যাও সেই অনন্ত সুখের ধামে। নির্দোষিতার, সরলতার নিমিত্ত এ পাপময় পৃথিবীর বসতি নহে।

রচনারীতিতে চন্দ্রশেখরের কথা মনে করিয়ে দিলেও লেখকের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো কারণই নেই। তান্তিয়া টোপি বলেছেন—

> আমি ভারতবাসী ভারতবর্ষের স্বত্ব, স্বাধীনতা এবং ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত আমি অস্ত্র ধরিয়াছি, আর ইংরেজ অপরের ধর্ম স্বাধীনতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, ধর্মের নিকট প্রকৃত অপরাধী কে? আমি আমার বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি আমি অপরাধী না।

তান্তিয়ার জবানিতে দেশের আপামর জনসাধারণের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ক্ষেত্রগোপাল রায়

ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 'ইন্দ্রকুমারী' (১৮৯১) রমেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গীত। বর্গির হাঙ্গামা উপন্যাসটির বিষয়। বাংলাদেশে নবদ্বীপ অঞ্চলে আমদহের রাজা রাঘবেন্দ্র সিংহ জৈনুদ্দীনের শত্রু কর্তৃক নিহত হন। রাঘবেন্দ্র মহারাষ্ট্রীয়। তাঁর কন্যা ইন্দ্রকুমারী পিতার মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থায় পতিত হন। ও দিকে নাগপুরাধিপতি রঘুজী এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি ভাস্কর বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। রঘুজীর এক সেনাপতি সমরসিংহ ইন্দ্রকুমারীর প্রণয়াসক্ত হয়। ভাস্কর ছলে বলে কৌশলে সমরসিংহের মৃত্যু ঘটাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভাস্করের সমস্ত দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হল। সমরসিংহের প্রতি রঘুজীর আস্থা অটুট রইল। ইন্দ্রকুমারী-উদ্ধারের জন্য সমরসিংহকে পাঠান হল। এ দিকে আলিবর্দী মারাঠা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সন্ধিপ্রার্থনা করলেন। উপন্যাসের সমাপ্তিও এইখানে। সমরসিংহ সম্ভবত রঘুজীর পুত্র, ভাস্করের চক্রান্তে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অজ্ঞাত ছিল।

ক্ষেত্রগোপাল রমেশচন্দ্রের অধীনে কিছুদিন সরকারী কাজ করেছিলেন। সেই সূত্রে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি লেখার প্রেরণাও বোধ হয় রমেশচন্দ্রের কাছেই পান। কয়েকটি পরিচ্ছেদ রমেশচন্দ্র সংশোধন করে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটির ঘটনাবিন্যাসে রমেশচন্দ্রের অনুকরণ সুস্পষ্ট। রমেশচন্দ্র মোগলবাদশার এবং হারেমের কূটচক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। তারই অনুকরণে ক্ষেত্রগোপালবাবু ভাস্কর, মীর হবিব, রিজিয়া বেগম ইত্যাদির

ষড়যন্ত্র বর্ণনা করেছেন। বইটিতে বর্গির হাঙ্গামার দৃশ্য দেখানো হয় নি। গল্পটির আকর্ষণ ইন্দ্রকুমারীকে কেন্দ্র করে ভাস্কর, সমর সিংহ, মীর হবিব ইত্যাদির মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দৃশ্যগুলির বর্ণনায়। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাইঘনীদুর্গে' মীর হবিবের একটি উজ্জল চিত্র পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবাবুর লেখা ভালো, অযথা বাক্‌বিস্তার নেই; তবে রোমান্স-সৃষ্টির আত্যন্তিক মোহ থেকে তিনি মুক্ত নন।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীশচন্দ্র ঘোষের 'রামপাল' বার হয়েছিল ১৮৯১ সালে। বইটির অনেকগুলি সংস্করণ (৪র্থ সংস্করণ ১৩২০) দেখে মনে হয় উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্রীশবাবু মুনসীগঞ্জে থাকবার সময় রামপালের কাহিনী সংগ্রহ করেন। বইটি সাহিত্যরসিক অবিনাশচন্দ্র দাসের প্রশংসা পেয়েছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের উপদেশক্রমে শ্রীশবাবু তৃতীয় সংস্করণে 'বল্লাল চরিতে'র বিবরণ অনুসরণ করেন। শ্রীশবাবু রামপালে বর্ণিত কতগুলি ঐতিহাসিক স্থানে গিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

বল্লাল চরিত্রের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীশবাবু বণিক-সমাজের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধটি ফুটিয়েছেন। বল্লাল সেন রাজ্য পাবার পর দেশে নানা অত্যাচার করতে থাকেন। বিশেষত বণিক বল্লভানন্দের উপর তার ক্রোধ ছিল মারাত্মক রকমের। ফলে বিরোধ ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়। এই বিরোধে বল্লভানন্দ বিদেশীর সাহায্য নেয়। ফলে দেশ ধীরে ধীরে বিদেশীর হাতে চলে যায়।

লেখক বল্লাল চরিত, টডের রাজস্থান, হাণ্টারের *Statistical Account* ইত্যাদি পাঠ করেছিলেন। ঐতিহাসিকতার দিক থেকে বিচার করলে প্রথমোক্ত বই দুটিকে প্রামাণিক বলে মেনে নিতে পারি না। সুতরাং রামপালে বর্ণিত তথ্য অনৈতিহাসিক। রামপালই যে বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল এমন কথাও জোর করে বলা যায় না।

কিশোরীমোহন রায়

কিশোরীমোহন রায়ের 'হামির' রাজপুত শৌর্যবীর্যের নিদর্শন। বইটি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পরিচয়পত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ইতিপূর্বে রাজপুত বীর হামিরের জীবনী নিয়ে কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি। কিন্তু লেখকের গ্রন্থ হামিরের (১২৯৮) পূর্বে হরিশ্চন্দ্র হালদারের 'হামির' নাটক এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' (১৮৮১) নাটকের প্রকাশ ঘটেছিল।

> হামীর মহিষী ক্ষেত্রকুমারীর অদ্ভুত পতিভক্তি ও হামীরের প্রগাঢ় দেশভক্তি একত্র মিশ্রিত হওয়ায় যেন সোনায় সোহাগা যোগ হইয়াছে। এই দুই দেবভাবের সংমিশ্রণের ফল চিতোর উদ্ধার। অধীন জাতির পক্ষে এরূপ উপদেশপূর্ণ জীবনী অতি বিরল।

বইটি টডের রাজস্থানের ছায়াবলম্বনে লিখিত। টাইটেল পেজে টডের উদ্‌ধৃতি আছে। উচ্ছ্বাসবহুল রচনা। প্রথম রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি বইটিতে প্রচুর। তথাপি যোগেন্দ্রনাথের কথাই হয়তো ঠিক। 'দুই দেবভাব'কেই পাঠক গ্রহণ করেছিল।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য

বিধুভূষণ ভট্টাচার্যের 'রায়বাঘিনী' স্থানীয় ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী। এটিকে উপন্যাস বলি না, কারণ এতে উপন্যাসোচিত গুণ বিশেষ কিছুই নেই। তবে 'পড়িলে নবেলের' মতো লাগে। বিধুভূষণবাবু ভুরসুট অঞ্চলের জনশ্রুতি অবলম্বন করে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল (ধর্মমঙ্গল) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং স্থানীয় ছড়া ইত্যাদি উদ্ধার করে তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। লেখক গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, নানা দেবমন্দিরের ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এবং জমিদারদের বংশাবলী সংগ্রহ করে গ্রন্থ বিস্তৃত করেছেন। কয়েকটি চিত্র দিয়ে সেকালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে পাঠকের দৃশ্যগোচর করেছেন। বিধুভূষণবাবু অনুমান করেন ভুরসুটের জমিদার রাজা রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা রাজীবলোচনই হচ্ছেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়। কালাপাহাড় প্রায় সব জায়গারই মন্দির বিগ্রহ, দেউল

দেহারা ভেঙেছেন। কিন্তু ভুরসুট অঞ্চলের কোনো ক্ষতি করেন নি। মুসলমান কন্যার প্রেমে পড়ে রাজীবলোচন যখন তাকে বিবাহ করতে উদ্যত তখন উড়িষ্যারাজ রাজীবলোচনকে বাধা দেন। এতে রাজীবলোচন ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা হারান এবং হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ করবেন সঙ্কল্প করেছিলেন। নিবেদন অংশে লেখক বলেছেন—

> পুস্তকের বর্ণিত ঘটনার একটিও কল্পনাপ্রসূত নহে। নরপতিগণের কীর্তিকলাপ, শিলালিপি ও দলিলাদি হইতেই অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

লেখকের এই পরিশ্রম প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তথ্যগুলি যে সর্বত্রই প্রামাণ্য এ কথা মানতে পারা যায় না। সে যাই হোক, লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে গ্রাম্য প্রবাদের উপর নির্ভর করে ভবশংকরীর চরিত্র-অঙ্কন। ভবশংকরী আকবর কর্তৃক 'রায়বাঘিনী উপাধি পান। পাঠানরা যখন আকবরের সৈন্যদ্বারা বারবার বিতাড়িত হচ্ছিল তখনকার ঘটনা এই উপন্যাসের বিষয়। ভবশংকরী পাঠান সেনাপতি ওসমানের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ওসমান পরাজিত হলে আকবর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রায়বাঘিনী উপাধি দেন। লেখক ভবশংকরীকে হিন্দুধর্মের এবং হিন্দু জাতির প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। ভবশংকরী মহীয়সী মহিলা। তাঁর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর। আবার ভবশংকরী কেবল গৃহীজীবনের আদর্শকেই বড়ো করে তোলেন নি। তাঁর ক্ষাত্রতেজ রাজপুত-রমণীসদৃশ। দেশের এবং দশের মঙ্গল চিন্তাই তাঁর জীবনের ধ্যান ছিল। মোটামুটি এই কথাগুলিই লেখক এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বলেছেন। কাহিনীর শেষে লেখক রানী ভবশংকরীর বংশধরদের পরিচয় দিয়েছেন আর ভবশংকরীর পূত চরিত্রের আদর্শে বঙ্গললনার জীবন যেন আবার জেগে ওঠে এই প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রুদ্রনারায়ণ (ভবশংকরীর স্বামী) সেকালের জমিদার। জমিদার লেখকের আদর্শগত রূপ নিয়েছে। প্রজাবৎসল, সাহসী, উন্নতচরিত্র, ধার্মিক ওসমান ঠিক ফুটে নি। ভবশংকরীকে দেখে তার ভীতিবিহ্বলতা এবং প্রেমের পর্যৎসুকীভাব বেমানান। সেকালের পরিবেশ পরিস্ফুটনের জন্যও বটে আবার মধ্যযুগীয় আদর্শ বীরের পরিকল্পনার জন্যও লেখক কালাপাহাড় এবং ভবশংকরীকে দিয়ে বরাহযুদ্ধ দেখিয়েছেন। বইটিতে লেখকের আন্তরিকতা এবং স্বদেশপ্রীতি সর্বত্র একটা উঁচুভাবের সূচনা করেছে।

'বনপ্রসূন রচয়িত্রী'

'বনপ্রসূন রচয়িত্রী'র 'সফল স্বপ্ন' ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। বইটির রচনাকাল জানতে পারি নি। দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে মনে হয় বইটি একেবারে অনাদৃত ছিল না। বইটি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গীত। ভারতবর্ষে যবন অধিকারের সময়ে (৭১৩ খ্রীস্টাব্দ) সিন্ধু-দেশাধিপতি দাহিরের রাজ্যের ঘটনাবলী এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। দাহিরের পুত্র মদনারি এবং কন্যা স্বর্ণপ্রভা। মিথুনরাজের পুত্র ধীরেন্দ্র এবং কন্যা রত্নপ্রভা। দাহিরের কন্যা স্বপ্নে এক রাজপুত্রকে বরণ করলে। এই রাজপুত্র ধীরেন্দ্র। কিন্তু জনশ্রুতি মিথুনরাজের কোনো সন্তান ছিল না। আসলে সপত্নীবিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে মিথুনরাজের প্রথমা পত্নী দেশত্যাগ করলে। ইতিপূর্বে তার দুটি সন্তান জন্মেছিল। তার অজ্ঞাতে এই দুই সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। রাজকুমারী স্বর্ণপ্রভা ধীরেন্দ্রের সাক্ষাৎ পেলে। মিথুনরাজও সব জানতে পারলেন। এই মিলনের দিনে দাহির এবং মিথুনরাজ যবন কাসিমের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। যুদ্ধে হিন্দুশক্তির পরাজয় ঘটল। সকলেই নিহত হলেন। স্বর্ণপ্রভা কাসিমের সঙ্গে আরবে উপনীত হল। বাদশাহ ওয়ালিদ্ কাসিম স্বর্ণপ্রভাকে উপহার পেলেন। কিন্তু স্বর্ণপ্রভা স্বামীহন্তা কাসিমের মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে স্বর্ণপ্রভা আত্মবিসর্জন দিলে। উপন্যাসটি গতানুগতিক, বিশেষত্ববর্জিত। আকস্মিক ঘটনা এবং রহস্য-উদ্‌ঘাটন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে চমক-সৃষ্টির প্রয়াস আছে। স্বাধীনতার কথাও আছে। কয়েকটি গান গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ। এই গল্পটিই শশিচন্দ্র দত্ত বলেছেন অন্যভাবে।

অজ্ঞাতনামা লেখকের বীরনারী (১৮৭৫)[১] এবং অঘোরনাথ ঘোষের 'দাহির সেনাপতি' (১২৮৫)[২] নাটকগুলি একই ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেনের 'ভানুমতী' (১৩০৭) চট্টগ্রামের আদিনাথ মাহাত্ম্য কাহিনী। ১৮৯৭ সালের প্রচণ্ড বন্যার ফলে চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের বিশেষ

১ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। নাটকটি স্বর্ণপ্রভা বসু ও বিধুমুখী রায়কে উৎসর্গীত
২ 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত, শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়)

তখন অচলসিংহ বলেছিলেন, 'হাঁ, আমরা তাই চাই।' কিন্তু দেশরক্ষা করবে কি ভাবে ? এর উত্তর দিয়েছেন অচলসিংহ

কেন পারিবনা—সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে, আর আমরা দেশের লোক হইয়া দেশ রক্ষা করিতে পারিব না।

ফাঁসীতে যাবার আগে অচলসিংহ কন্যা চামেলীকে বলেছিলেন—

তুমি আমার নন্দিনী হইয়া আবার রোদন করিতেছ ? মা আর কাঁদিও না, প্রফুল্লমুখে বিদায় দাও। আমি স্বদেশের হিতসাধনে ব্রতী হইয়া জন্মভূমির চরণে জীবন বিসর্জন দিয়া স্বর্গে যাইতেছি, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। তুমি আপন গৌরব গরিমা স্মরণ রাখিবে।

ভূমিকাতে লেখক যে 'কোমল' ভাষার কথা বলেছেন তা সত্ত্বেও লেখকের অভিপ্রায় এসকল সংলাপে আর প্রচ্ছন্ন থাকে নি। অচলসিংহ ইংরেজের দৃষ্টিতে একজন বিদ্রোহী। Achal Singh was the leader of the mutineers. কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে তিনি বীর।

গড়বেতা নামের উৎপত্তি, কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক জনশ্রুতি এবং এইচ. এল. হ্যারিসনের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেকালের উপন্যাসের মতো প্রবোধচন্দ্র পরিশিষ্টে ঐতিহাসিক উৎস নির্ণয় করেছেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি পাবার আগেই তিনি ছোটো গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। উপন্যাসে নগেন্দ্রবাবু অ্যাডভেঞ্চার-বহুল গার্হস্থ্যচিত্রময় ছবি এঁকেছেন। সিপাহীবিদ্রোহে অ্যাডভেঞ্চারের স্থান আছে। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহ কালগত ব্যবধানে খুব দূরের ঘটনা নয়। এই কারণে কোনো লেখকই রোমান্স-সুলভ আতিশয্যের পরিচয় দিতে বিশেষ সাহসী হন নি। যে সমস্ত রচনায় এই রোমান্স লক্ষণ দেখা দিয়েছে তা অবাস্তবতার স্পর্শে 'বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র মূল প্রতিপাদ্য বস্তুকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

'অমর সিংহ' (সন ১২৯৬ সাল) সিপাহীবিদ্রোহ-মূলক উপন্যাস। নগেন্দ্রবাবুর এই বইতে অ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শ আছে। কিন্তু উপন্যাসটি

অ্যাডভেঞ্চারসর্বস্ব নয়। নগেন্দ্রনাথ এই বইটিকে ঐতিহাসিক তথ্যে ভারাক্রান্তও করেন নি। রচনার প্রসাদগুণ, আন্তরিকতা পাঠকের চিত্তগহনে অনুরণন তোলে।

বিহারের বিদ্রোহী নেতা কুমারসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরসিংহের ঘটনাবহুল চিত্র এই উপন্যাসটি। কাহিনীটি এই। কুমারসিংহ রাজপুত বীর। একখণ্ড ভূখণ্ডের অধিকারী। কিন্তু যৌবনে বিলাসব্যসনে উৎসবে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অশীতিপর বৃদ্ধের সকল আশা যখন নির্বাপিত তখন সিপাহীবিদ্রোহ আবার বৃদ্ধের মনে বাসনার শিখা জ্বেলে দিলে। বিদ্রোহকে অবলম্বন করে কুমারসিংহ হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন এই আশা করলেন। কনিষ্ঠভ্রাতা অমরসিংহ এতকাল সন্ন্যাসীর জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ফকির ফুল শাহের প্রেরণায় তিনি ভ্রাতার পাশে দাঁড়ালেন। অসীম সাহস দেখালেও অমরসিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো বিচক্ষণতা কিংবা দূরদর্শিতা ছিল না। সেই কারণে বারবার করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হয়েছে। অবশ্য এই বিদ্রোহ একটা ঐক্যবদ্ধরূপ নিতে পারে নি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহকে দমন করতে ইংরেজ সরকারের বেগ পেতে হয় নি। অমরসিংহ যখন সংসারে ফিরে এসে ভ্রাতার পাশে দাঁড়ালেন তখন তার পত্নী রানী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। গতপ্রেম অনির্বাণ শিখায় জ্বলে উঠে অমরসিংহের কার্যে পথ দেখাতে লাগল। বিশ্বাসঘাতক রামশরণ রানীকে অপহরণ করে নিলে। ফুল শাহের সহায়তায় আবার রানীকে ফিরে পেলেন। অমরসিংহ নিজের ঔদার্যের পরিচয় দিলেন। রামশরণের বিশ্বাসঘাতকতায় অমরসিংহ যখন বন্দী হলেন তখন ইংরেজ রমণী মিস হাইলর (ওরফে লরা) অমরকে কৌশলে মুক্ত করে দিলে। অমরের প্রতি তার গোপন প্রেম ছিল। অমরের ভ্রাতৃবধূ লছমী রামশরণের গুলিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে দেবরকে রক্ষা করলে। অমরসিংহ যখন মুমূর্ষু ভ্রাতৃবধূকে স্পর্শ করলেন তখন বিধবার রুদ্ধপ্রেম আত্মপ্রকাশ করলে। শেষে অমরসিংহ সকল আশা ছেড়ে দিয়ে রানীকে নিয়ে নেপালে পালিয়ে গেলেন। কুমারসিংহের আগেই মৃত্যু হয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অমরসিংহ সুখপাঠ্য উপন্যাস। সিপাহীবিদ্রোহ-মূলক উপন্যাসে বিদ্রোহের উত্তেজনাটাই প্রবল, চরিত্রচিত্রণ কিংবা উপন্যাসো-

চিত প্লটনির্মাণ সেখানে গৌণ ছিল। নগেন্দ্রনাথের উপন্যাস এই হিসাবে ব্যতিক্রম। বিদ্রোহ অমরসিংহের পারিবারিক জীবনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিল তারও যথাযথ চিত্র এই উপন্যাসে পাচ্ছি। রাজপুতরমণী রানীর হিন্দু পাতিব্রত্য আদর্শ, স্বামীর গর্বে গর্বিতা রমণীর মাহনীয় রূপ ও লছমীর প্রতি অনুরাগ এবং ক্ষাত্রতেজ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লছমী এবং রানীর দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ অথচ স্বতোৎসারিত অনুরাগ-বিরাগ আমাদের পরিচিত জীবনের রহস্যমধুর চিত্রগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। এই-সকল চিত্রই ভাগ্যবিড়ম্বিত, নিয়তিতাড়িত শোচনীয় পরিণতিটিকে গাঢ়তা দান করেছে। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতোই।

> প্রকৃত পক্ষে উহা যুদ্ধ নহে, বিদ্রোহমাত্র। যে দিন ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইবে সেই দিন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজের বাস উঠিবে।

অথবা

> সিপাহী বিদ্রোহের মূলে স্বদেশানুরাগ না অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য দেখা যায় না। সিপাহীরা পিশাচের ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল, যুদ্ধধর্ম প্রতিপালন করে নাই।

এবং

> সিপাহীবিদ্রোহের সিপাহীরা নরপিশাচস্বরূপ, স্বদেশোদ্ধারস্বরূপরূপে মহাব্রত এরূপ নৃশংসেরা সাধন করিতে পারেনা।

এ-সকল কথা থাকলেও নগেনবাবুর বই কিন্তু অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন তিনিই সিরাজের জন্য দুফোঁটা অশ্রুজল ফেলেছিলেন। নগেনবাবুও গ্রন্থের নায়ক-চরিত্র অমরসিংহের জন্য সমবেদনা উজাড় করে দিয়েছেন, কুমারসিংহের মৃত্যু-দৃশ্যটিকে করুণাঘন করে তুলেছেন। স্বদেশপ্রেম না হউক উপযুক্ত বীরের প্রতি লেখকের এই শ্রদ্ধা মর্মস্পর্শী। ফুল শাহ মহাপুরুষ জাতীয় চরিত্র। তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী সেকালের উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

১ নগেন্দ্রনাথ জয়ন্তী (প্রবাসী, ১৩২৯-১৩৩০) নামে আর একখানি কল্পনাসর্বস্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল' (১৫ই আষাঢ় ১৩০৬ সাল, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট লিলি প্রেসে শ্রীরাম বিষ্ণুকুমার কর্তৃক মুদ্রিত) একখানি অভিনব উপন্যাস। এই অভিনবত্ব উপন্যাসটির গঠনবৈচিত্র্যে। কতগুলি দলিলদস্তাবেজ এবং পত্রের সাহায্যে উপন্যাসটির আখ্যানভাগ বর্ণিত। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন—

> এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যায়। পুরাণ কাগজকে উপন্যাস, এমন কি একটা গল্প বলিলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্যও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান বর্ণিত নায়কনায়কাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠন ও তাহার পূর্ণতাসাধন দূরের কথা। তবে যথাসাধ্য ত্রুটি করা হয় নাই।

অম্বিকাচরণের মাতামহ রাজবাড়ির বৈদ্য ছিলেন। সেই সূত্রে রাজবাড়ির প্রাচীন দলিল ইত্যাদি লেখকের হস্তগত হয়। এই দলিলদস্তাবেজ থেকে লেখক তাঁর কাহিনীটিকে খুঁজে পান। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হওয়াতে লেখক একে সর্বসাধারণে প্রচার করতে সাহসী হন। কাহিনীটি এই। জনার্দনগড়ের রাজা রত্নধ্বজ সিংহ। তাঁর দুই স্ত্রী সাবিত্রী এবং অনঙ্গমোহিনী। সাবিত্রীর গর্ভজাত কন্যা কৃষ্ণভাবিনী দেবী। সাবিত্রীর মৃত্যুর পরে সুবর্ণগড়রাজ-দুহিতা অনঙ্গমোহিনীকে রত্নধ্বজ বিবাহ করেন। রত্নধ্বজ অপুত্রক হওয়ায় সুবর্ণগড়ের রাজা রত্নধ্বজ সিংহের রাজ্যলাভের আশা পোষণ করেন। অনঙ্গমোহিনী পিত্রালয়ে থাকতেন। সেখান থেকে খবর পাঠানো হল রত্নধ্বজের এক পুত্র হয়েছে। রত্নধ্বজ এ খবর বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু একটা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি কন্যাকে ব্রহ্মানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ রাজগুরু। সেখানে অন্য এক রাজপুত্র (বিজয়গড় রাজ্যের অধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহ ধলদেব বাহাদুরের পুত্র) আদিত্য প্রতাপ সিংহও থাকতেন। সেখানে উভয়ের সখ্যতা, পরে প্রেম এবং শেষে বিবাহ হয়। সুবর্ণগড়রাজ কৃষ্ণভাবিনীর প্রাণনাশে উদ্যত হন। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারী সেনাপতি মীরজাফর আলির সহায়তায় কৃষ্ণভাবিনীকে নিহত করতে গেলে তীর্থযাত্রী রত্নধ্বজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দেন। কৃষ্ণভাবিনী পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু সকলে জানলে কৃষ্ণভাবিনী মৃত। কৃষ্ণভাবিনী পরে

মোকদ্দমা করেন। এই মোকদ্দমায় বাদী ময়ূরধ্বজ সিংহ (অনঙ্গমোহিনীর পুত্র বলে কথিত) প্রতিবাদিনী কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবং প্রতিবাদী দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ। দেবেন্দ্র রত্নধ্বজের ভাগিনেয়। মোকদ্দমায় কৃষ্ণভাবিনীর জয় হল। কাহিনীও এখানে শেষ।

ঘটনার কালবিচারে দেখি সিরাজদ্দৌলার রাজ্যপ্রাপ্তি এবং পতনের সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। উপন্যাসটিতে সিরাজের অত্যাচার কাহিনীও স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের ছায়াবলম্বনে লিখিত। লক্ষণীয়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণার পরেও লেখক সিরাজকে অত্যাচারীরূপেই দেখেছেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী সম্পূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের হরদেব ঘোষালের (বিষবৃক্ষ) প্রোটোটাইপ। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যেমন এই উপন্যাসেও ঘটনার অগ্রগতি এই বিরাগী পুরুষের পত্রের মধ্য থেকেই জানতে পারি। কৃষ্ণভাবিনীর মৃত্যু এবং পরে আবির্ভাব সঞ্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপচাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে তিনি ভাষা ব্যবহারে যথাসাধ্য 'প্রত্নরীতি' অবলম্বন করেছেন। সূচনাতে লেখক বলেছেন প্রাচীন ভাষার কিছুটা সংস্কার করে তিনি কাহিনীটিকে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু এ সংস্কার যৎসামান্য। মোকদ্দমার ভাষা এবং গদ্যের ব্যবহারে সেকালের রচনারীতি এবং শব্দভাণ্ডার গ্রহণ করে লেখক ঐতিহাসিক পরিবেশটিকে অক্ষুণ্ণ করেছেন। চরিত্র আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। কেবলমাত্র কাহিনী-বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য। সে বর্ণনায় লেখক সিদ্ধকাম। জমিদারগোষ্ঠীর দলাদলি সেকালের এক লক্ষণীয় ঘটনা। এই স্মরণীয় ইতিহাসকে লেখক কাহিনী-আকারে উপস্থাপন করেছেন।

হলধর বিশ্বাস এবং পোলিটিক্যাল এজেন্টের সংলাপ কিঞ্চিৎ স্থূল। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর পত্রে নীতিকথনের বাহুল্য ঈষৎ পীড়া দেয়। আদিত্য-কৃষ্ণার প্রেমকাহিনী গতানুগতিক।[১]

১ অম্বিকাচরণ গুপ্ত আরও দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন কপট সন্ন্যাসী (১৮৭৪) ও কমলে কণ্টক নামে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কাঞ্চনমালা

কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শনে (তখন সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ১২৯০ সালে প্রকাশিত। ১৩২২ সালে (১:২১) ১লা ফাল্গুন, আধুলি গ্রন্থমালা। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীমূলক একখানি বইর নামও কাঞ্চনমালা (১৮৭৩)।[১]

কাঞ্চনমালা লেখবার আগেই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নানা প্রবন্ধ রচনা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্যাতি পেয়েছিলেন। 'ভারত মহিলা', 'বাল্মীকির জয়' (গদ্যকাব্য) তখন প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত প্রাচীনভারতবিদ্যাবিদ্ হলেও রসরচনায়ও যে হরপ্রসাদ সিদ্ধ ছিলেন 'বাল্মীকির জয়' তার প্রমাণ।

বিশদ আলোচনার আগে এ সময়ের হরপ্রসাদের মানস-প্রকৃতির পরিচয় নিই। কাঞ্চনমালা প্রকাশের পূর্বে হরপ্রসাদ প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় আত্ম-নিয়োগ করেন। উল্লেখযোগ্য এই যে হরপ্রসাদ ১৮৭৮ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সান্নিধ্যে আসেন। *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র হরপ্রসাদের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। হরপ্রসাদ এই সমস্ত পুথির বিবরণী সংকলন করবার সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই পূর্ণ পরিচয় লাভ করেছিলেন। কাঞ্চনমালায় তিনি সেই সকল তথ্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় হরপ্রসাদ সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদের Friend, Philosopher and guide.[২] বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস নেই বলে আক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য সে অভাব অনেকটা মোচন করেছেন।

কাঞ্চনমালার উৎসের দুই সূত্র— রচনারীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুপ্রেরণা।

বলা বাহুল্য, হরপ্রসাদের নিজের গবেষণাও কাঞ্চনমালায় লক্ষ করা

১ শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)

২ মাসিক বসুমতী, ভাদ্র ১৩২৯

যাবে। কাঞ্চনমালায় বর্ণিত ঐতিহাসিক স্বরূপটি তিনি নিজেই নিজস্ব মতামতসহ ইতিপূর্বে ছাপিয়েছিলেন। বৌদ্ধকাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন বলে হরপ্রসাদ শিলালেখগুলির উপর বিশেষ নজর দেন নি। প্রিন্সেপ সাহেব তখন অনেকগুলি শিলালেখের পাঠোদ্ধার করেছিলেন। প্রত্নলিপির সবিশেষ পরিচয় হরপ্রসাদের জানা থাকলেও জাতক-কাহিনীর 'ঐতিহাসিকতা'কে হরপ্রসাদ সম্ভবত অস্বীকার করেন নি। অশোক যে বাল্যকালে অত্যাচারী ছিলেন এ তথ্য এখন সম্পূর্ণ স্বীকৃত নয়। 'দেবানাং প্রিয়দর্শী অশোক' রাজার একজন পত্নী চারুবাকী (কারুবাকী) এবং পুত্র তীবলের (তিবন) উল্লেখ পাই। সম্ভবত অশোকের আরও পত্নী ছিল। সুষীমের নামও পাওয়া যায় না। পরিষ্যরক্ষিতার ঐতিহাসিকতাও সংশয়ের ঊর্ধ্বে নয়। তবে শিলালেখের সাক্ষ্যে জানা যায় অভিষেকের সময় ছিল রাজ্যপ্রাপ্তির চার বছর পূর্বে। এ মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটলেও ঘটতে পারে। অশোক যে হিন্দু ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই।[১] আসলে হরপ্রসাদের মন সব সময়েই 'পাথুরে প্রমাণে'র ঊর্ধ্বে ছিল। এজন্য পৌরাণিক কাহিনীও তাঁর কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কাঞ্চনমালার ভূমিকায় হরপ্রসাদ বলেছেন—

> ত্রিশ বৎসর পূর্বে যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লেখা হইয়াছিল তাঁহাদের নাতিরা এই পুস্তক কি চক্ষে দেখিবেন, বলিতে পারি না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের খুশীর জন্যও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে দিতেন।[২] ফলে গুরুকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিষ্যের মধ্যেও গুরুর অনুকরণ প্রথম জীবনে আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। নচেৎ বাল্মীকির জয় গদ্যকাব্য রচনা করার পর এতটা অনুকরণাত্মক রচনা আশা করা যায় না।

কৃষ্ণকান্তের উইলের অনুকরণে কাঞ্চনমালায় তিষ্যরক্ষার মধ্যে 'সু ও কু'র দ্বন্দ্বটি কৌতূহলোদ্দীপক। চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের অংশটি তিষ্যরক্ষার দীক্ষা গ্রহণের পূর্বের দৃশ্যটিতে অনুসৃত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এ দৃশ্যবর্ণনায় যে রীতিগত সৌন্দর্য প্রকাশমান এখানে তা অনুপস্থিত।

১ ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, অশোক D. R. Bhandarkar *Asoka* এ ছাড়া রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ এবং চারুচন্দ্র বসুর গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

২ 'নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

অনুকরণের আতিশয্য লক্ষিত হয় তিষ্যরক্ষার পরিণতিতে। বিষবৃক্ষের হীরা আর তিষ্যরক্ষায় কোনো প্রভেদ নেই। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকুশলতা হরপ্রসাদে নেই। কাঞ্চনমালার গৃহত্যাগ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

কেবল ঘটনার সাদৃশ্যে নয় বর্ণনাতেও বঙ্কিম-অনুসৃতি দুর্লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমের প্রৌঢ় রচনারীতি হরপ্রসাদের আয়ত্তের বাইরে। প্রারম্ভে কুণাল কাঞ্চনমালার বিবাহোত্তর জীবনের দ্বৈতলীলা অতিপল্লবিত বর্ণনায় ভারাক্রান্ত। ভাবের তরল উচ্ছ্বাসও লক্ষণীয়। কুণালের পূর্বস্মৃতি রোমন্থন অনেকটা গতানুগতিক।

কাঞ্চনমালা চরিত্রটির উপর লেখকের সহানুভূতি। গ্রন্থের নামও নায়িকার নামানুসারে। তবে প্রতিনায়িকা তিষ্যরক্ষা গ্রন্থে প্রধান। কাঞ্চনমালার স্থান অপরিসর। এই কারণে তার চরিত্রের বিকাশ উপন্যাসোচিত নয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাক পরোক্ষ প্রভাবে কাঞ্চনমালা চিত্রিত। এজন্য চরিত্রটি উচ্চচিন্তার বাহক— তার ক্রমবিকাশ মানবোচিত নয়।

কুণাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার নেই। কেননা সে-ই লেখকের আদর্শবাদের যন্ত্রস্বরূপ। এই চরিত্রটিও নির্দ্বন্দ্ব অতএব নিস্তরঙ্গ।

তিষ্যরক্ষা চরিত্রে বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব আছে। তথাপি এই চরিত্রটিই পাঠকের কথঞ্চিৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে কাঞ্চনমালায় হরপ্রসাদ পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হন নি। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে তিনি নূতন পথ খুলে দিলেন। হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের কাহিনী অবলম্বন করে তিনি বিষয়বস্তু নির্বাচনের সীমাটিকে আরও বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন। এইখানেই কাঞ্চনমালার কৃতিত্ব।

বেণের মেয়ে

কাঞ্চনমালা প্রকাশিত হবার প্রায় বত্রিশ বছর পরে হরপ্রসাদ বেণের মেয়ে লিখলেন। বেণের মেয়ের প্রকাশকাল ১লা ফাল্গুন ১৩২২। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে হরপ্রসাদ যে উপন্যাসটি লিখলেন তার মধ্যে প্রৌঢ় জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সর্বত্র। তাঁর কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যে যে গবেষণালব্ধ ফল

সঞ্চিত হয়েছিল তাকেই গল্পাকারে প্রকাশ করেছেন হরপ্রসাদ এই গ্রন্থে। কাঞ্চনমালায় বঙ্কিমের অনুকরণ ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। বেণের মেয়েতে তার স্পর্শমাত্র নেই। বেণের মেয়ে হরপ্রসাদের কেবল মৌলিক সৃষ্টি নয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ বইটি অভিনব।

ইতিপূর্বে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে নভেলের দৈন্য দেখে।[১] নভেলের পরিবর্তে 'চুট্‌কী' রচনা হরপ্রসাদের সমর্থন লাভ করে নি। তিনি চেয়েছিলেন 'সিরিয়াস' বস্তু— যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। সুতরাং খাঁটি উপন্যাস রচনা করবার প্রয়াস থেকেই বেণের মেয়ের সূচনা। দ্বিতীয়ত কাঞ্চনমালায় যেমন, বেণের মেয়েতেও হরপ্রসাদ দেশপ্রীতির প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। হরপ্রসাদের রসিক মন 'পাথুরে প্রমাণে'র ঊর্ধ্বে তথ্যকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলতে সাহায্য করলে। হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আক্ষেপ করেছেন আমাদের ইতিহাস চেতনার অভাব দেখে। এই চেতনাকে জাগাতে সাহায্য করেছেন তাঁরই শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকবৃন্দ। ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণীত হল না। এবং তথ্যগুলি ভাসমান বন্যার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।[২] হরপ্রসাদ চেয়েছিলেন এই বন্যাগুলিকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে, ভাঙা ভাঙা তথ্যগুলিকে যুক্তি ও উপাদানের সাহায্যে নীরেট করে তুলতে। বেণের মেয়েতে এই প্রচেষ্টা। অতএব দেখা যাচ্ছে হরপ্রসাদের বেণের মেয়ে নিজের আবিষ্কার, দেশপ্রীতির প্রেরণা, খাঁটি নভেল লেখবার আকাঙ্ক্ষা, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যসূত্রে বিধৃত করবার প্রেরণা থেকেই রচিত। বেণের মেয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার 'বিজ্ঞান-সম্মত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। বেণের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে বাঙ্গালার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?

১ ১৩২১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার অভিভাষণ। রচনাবলীভুক্ত।

২ ১৩৩২ সালের ভাষণ, রচনাবলীভুক্ত

বেণের মেয়ের কাহিনী দীর্ঘ নয়, জটিল তো নয়ই। কাহিনীর প্রতি হরপ্রসাদ বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করেছিলেন বলেও মনে হয় না। কাহিনীটি এই।

তারাপুকুরের রূপনারায়ণ জাতে বাগ্দী, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই অভিষেকের সময়ে গাজন উৎসব। লুইসিদ্ধা শিষ্য বিক্রমণিপুরের রাজপুত্রকে নিয়ে অনুষ্ঠানে চলেছেন। সাতগাঁর বেণের মেয়ে মায়া গুরু-শিষ্যকে শ্রদ্ধা জানাতে এল। মায়াকে দেখে শিষ্যের চিত্ত টলোমলো। কিন্তু গুরুর দিকে তাকিয়ে সে চিত্ত নিরোধ করলে। মায়ার স্বামী জীবন ধনী রোগযন্ত্রণায় মারা গেলে মায়া বিধবা হল।

মায়ার সন্তান ছিল না। মায়ার বাবা বিহারীরও না। তখন বাংলা দেশে হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধ। বৌদ্ধরা মায়াকে মহাবিহারে ভিক্ষুণী করে তার সম্পত্তি হস্তগত করতে চাইলে। কিছুকাল পরেই মায়া ভিক্ষুণীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে। রূপা রাজার ইচ্ছা গুরুপুত্রের সাধন-সঙ্গিনী হোক মায়া। রূপা রাজারও ইচ্ছা মায়া মহাবিহারে যাক। বিহারী দত্ত হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দকে ডেকে মায়াকে রক্ষা করতে বলল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হল।

গুরুপুত্র কিন্তু মায়াকে ভুলতে পারে নি। মায়া তার ধ্যানধারণাকে বিচলিত করে দেয়। মহাসুখ যদি বিগলিত-বেদ্যান্তর হয় তবে তার উৎস হোক মায়া।

এ দিকে মস্করীর ছদ্মবেশে পিশাচখণ্ডীর এক ব্রাহ্মণ মায়াকে গোপনে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেল। মায়ার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সাতগাঁয়ে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হল। হিন্দুরা বৌদ্ধদের দায়ী করলে। রূপা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বহ্নি প্রধূমিত হতে লাগল।

কথাটা রাজা হরিবর্মদেবের কানে গেল। বিহারী হিন্দু জানতে পেরে তিনি বললেন—

> তবে ত উহাকে সাহায্য করা আমাদের আবশ্যক। বাগ্দী রাজা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবে, আমরা সহ্য করিতে পারিব না।

কিন্তু বাগ্দীরা রণবঙ্কা। সুতরাং উভয়পক্ষই যুদ্ধের আয়োজনে ত্রুটি রাখলে না। দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, হরিবর্মদেব, বেণেরা এক দিকে; মহীপাল, রূপা রাজা অন্য দিকে। পরিণামে হিন্দুদেরই জয় হল। কেবল ধর্মকে কেন্দ্র করে যে ক্ষণিক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছিল তা প্রশমিত হল। বিহারী সাতগাঁর রাজা নির্বাচিত হল।

মায়া ফিরে এল। কন্যাকে পেয়ে বিহারীর আনন্দের সীমা রইল না। বিহারী রাজা হওয়াতে বেণেদেরও আনন্দ হল। সকল সৈনিকই পুরস্কৃত হল। পিশাচখণ্ডীর ব্রাহ্মণ পুরস্কারের পরিবর্তে একটি রাজসভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। রাজা এতে খুশি হলেন। ভবদেবও রাজি হলেন। রাজসভায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে আনন্দ করলেন।

হরপ্রসাদ বেণের মেয়েতে বলেছেন মুসলমান আক্রমণের সময়ে ভারতের নরপতিরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন। জয়দেবের কল্কি অবতারের বর্ণনা হয়তো হরপ্রসাদকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। তবে হরপ্রসাদের ধারণা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে।[১]

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতই বেণের মেয়ের যুদ্ধের পটভূমিকা তৈরি করেছে। কিন্তু যুদ্ধবর্ণনা করেছেন হরপ্রসাদ ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে। তখনকার দিনে সাধারণ যোদ্ধা জাতি ছিল ডোম ও বাগ্দী। অন্যান্যেরাও অবশ্য যুদ্ধে যোগ দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম ও মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে এই যুদ্ধ-বর্ণনার চিহ্ন আছে।

বেণের মেয়েতে রাজা হরিবর্মদেব এবং মহীপালের উল্লেখ আছে। মুসলমান আক্রমণের কথা উল্লিখিত হওয়াতে মনে হয় এই রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। ইতিপূর্বে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মহীপালকে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ঔদাসীন্য বৈরাগ্য দেখিয়েছিলেন বলে অভিযুক্ত করেছেন।[২] তবে দ্বিতীয় মহীপালই যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তার প্রমাণ পাওয়া যায় হরিবর্মদেবের উল্লেখে। দ্বিতীয় মহীপাল এবং হরিবর্মদেব সমসাময়িক হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে রূপা রাজার বিদ্রোহের ঘটনাটির ঐতিহাসিক উৎস বিচার করি। বলা বাহুল্য, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবলম্বন ছিল। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে নেপাল থেকে তিনি এই গ্রন্থটি নিয়ে আসেন। ভোজবর্মদেবের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় জাতবর্মা দিব্য ও গোবর্ধনকে পরাজিত করেন। দিব্য কৈবর্ত বিদ্রোহের অধিনায়ক। রামচরিতে ইনিই দিব্বোক নামে অভিহিত। রামচরিত টীকা থেকে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহ

১ R. C. Majumdar, *History of Bengal, Vol-I*

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস

দমন করতে গিয়ে নিহত হন। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্যের বংশধর ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভও করেছিলেন। তা হলে দেখতে পাচ্ছি ঐতিহাসিক সূত্র ধরে বিচার করতে গেলে কৈবর্ত বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য মোট তিনজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। জাতবর্মা দ্বিতীয় মহীপাল এবং রামপাল। জাতবর্মার বংশধর হরিবর্মদেব। দিব্যের বিদ্রোহের সঙ্গে হরিবর্মার কোনো সম্বন্ধ নির্ণীত হচ্ছে না। সুতরাং বেণের মেয়েতে বাগ্দী-বিদ্রোহের সঙ্গে কৈবর্ত-বিদ্রোহের সম্বন্ধ-স্থাপন দুরূহ। আবার বেণের মেয়ের রূপা রাজার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন মহীপাল। ইতিহাসে আছে মহীপাল কৈবর্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। রূপা রাজার সেনাপতি রাজা হরিবর্মদেবের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে বলেছেন 'ভবস্তুআপদম্' এবং বিদ্রোহকে বলেছেন অলীক বিদ্রোহ। যাই হোক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনায় ঐতিহাসিকতা না থাকলেও তিনি কৈবর্ত বিদ্রোহের সাদৃশ্যেই বাগ্দী বিদ্রোহের চিত্রটি এঁকেছেন।

ভবদেব ভট্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী বালবলভীভুজঙ্গ। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন—

> বর্মণরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিল।[১]

সে যুগের কবির প্রশস্তি লিপিতেও ভবদেব ভট্টের নাম পাই।

সেকালে বণিকদের যে বিশেষ ক্ষমতা ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ ঐতিহাসিকেরা দিয়েছেন। এমন-কি বণিকরা রাজাদের শাসনকার্যে ডিক্‌টেটও করতেন।

বেণের মেয়েতে পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্যের পরিচয় পাই। এই পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্যের কথা সেযুগের ইতিহাস থেকেই পাওয়া। এই পুরোহিতরাই যে সে-যুগে প্রধান ছিলেন তার প্রমাণ পাই এঁদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে এবং রাজকার্যে বিভিন্ন পদপ্রাপ্তিতে। সুতরাং বেণের মেয়েতে যদি এঁদের কথা আত্যন্তিক হয় তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

হরপ্রসাদের গবেষণা অনুযায়ী হিন্দুবৌদ্ধ বিরোধের চিত্র পাই এই গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর ধারণা হয়তো ঠিক নয়। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন হিন্দু-

১ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব): ১৩৫৯ পৃঃ ২৯২

বৌদ্ধ বিরোধ বলতে আমরা যা বুঝি তা সে যুগে ছিল না। পালরাজারা ছিলেন পরমসৌগত কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের কোনো বিদ্বেষ ভাব দেখা যায় না।[১]

লুইসিদ্ধা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে এঁকে একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'লুইয়ের জীবৎকাল দশম শতাব্দী বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম'।[২] বেণের মেয়েতে চর্যাগুলি কীর্তনের মতোই গেয় এইরকম পাচ্ছি।[৩] এখানে কোনো ভুল আছে বলে মনে করি না। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সঙ্গে লুইর যোগাযোগ ছিল অনুমান করে লুইও তিব্বত নেপাল গিয়েছিলেন এইটি শাস্ত্রী মহাশয়ের মত। কিন্তু লুইর চরিত্রঅঙ্কনে হরপ্রসাদ কল্পনার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

যুদ্ধবর্ণনায় যে অশ্বারোহী, পদাতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে তা সন্ধ্যাকর নন্দীর সাক্ষ্যে ঠিক বলে মনে হয়। তবে বারুদের ব্যবহার সে যুগে ছিল না।

বেণের মেয়ের সম্পর্কে বাঙালি পাঠক উদাসীন কেন? এর কারণ সম্ভবত কাহিনীটির দুর্বলতা। বস্তুত সে কথা অস্বীকার করবার উপায়ও নেই। গল্পটি অত্যন্ত শিথিল। চরিত্রগুলির উত্থানপতন বিশেষ নেই। বিকাশও দেখানো হয় নি। গুরুপুত্রের প্রসঙ্গটিই এখানে অত্যধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। কারণ গুরুপুত্রের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বহুবার অথচ প্রত্যক্ষ ঘটনা নেই। উপন্যাসের বিশ্লেষণের ন্যূনতম দাবিও অস্বীকৃত হয়েছে। ভবদেব, মায়া, বিহারী, লুইসিদ্ধার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন নেই। রাজরাজড়ার যে সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে এমন কিছু উচ্চ রচনা-শক্তির পরিচয় দেয় না। কাহিনীটি শেষ হয়েছে হরিবর্মদেবের রাজ্যবিজয়ের সঙ্গেই। পরবর্তী বর্ণনা গ্রন্থে শিথিলবদ্ধ। এজন্য উপন্যাসটি দ্বিধাবিভক্ত।

সম্ভবত এই কারণেই বেণের মেয়ে কতকটা অবহেলিত এবং উপেক্ষিতও

১ But in spite of the existence of different religious sects side by side there was no sectarian jealousy of exclusiveness : R. C. Majumdar *History of Bengal Vol-I* শ্রীসুকুমার সেন, প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী

২ শ্রীসুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী

৩ শ্রীসুকুমার সেন, চর্যাগীতি-পদাবলী

বটে। কিন্তু অবহেলার অথবা উপেক্ষার যে কারণই থাক একে সুবিচার বলা যায় না। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। এবং তা সার্থকতায় মণ্ডিত।

আসল কথা, শাস্ত্রীমশায় বেণের মেয়েতে উপন্যাসের প্রচলিত পথ অনুসরণ করেন নি। এ উপন্যাসে ইতিহাসের আধারে রোমান্সের আতিশয্য নেই। বেণের মেয়েতে তিনি গল্পাকারে বাংলার ইতিহাস পরিবেশন করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবার জন্যই কাহিনীর অবতারণা। বিহারী দত্তের কাহিনীর স্বতন্ত্র মূল্য কিছু নেই, কিন্তু সমাজেতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। তবে ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বেণের মেয়েতে অনুস্যূত নয়। তা কল্পনার দ্বারা স্পৃষ্ট। গ্রন্থের মধ্যে লুইসিদ্ধার প্রাসঙ্গিক স্থান কতটুকু সেইটি বোঝা যাবে লেখকের উদ্দেশ্য-পরিকল্পনায়। কেবলমাত্র কাহিনীরস পরিবেশন করার ইচ্ছে থাকলে হরপ্রসাদ নিশ্চয়ই রূপা রাজার দবদবার চিত্রটি এত করে ফুটিয়ে তুলতেন না। সেকালে সহজিয়া সাধকদের আচার-আচরণ, রাজ-রাজড়ার বিলাস-ব্যসন, সাধারণ নরনারীর উৎসব-অনুষ্ঠান এইগুলিই লেখককে আকর্ষণ করেছে বেশি। গোলাভরা ধান, মুখে মুখে হাসি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু এখন একটা স্বপ্নের কাহিনী। সেই স্বপ্নজগৎকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেণের মেয়েতে।

ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বদা তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন নি সত্য কথা। তবে

> লেখক নির্দিষ্ট স্থান কালের বেড়াকে একটু আধটু সরিয়ে নিলে ছবিগুলিকে ঐতিহাসিক বলা চলে।[১]

—এইটিও অন্যতম সত্য। এজন্যেই দেখতে পাই বিহারী দত্তের সাগর-সঙ্গমে যাত্রার বর্ণনায় লেখক মঙ্গলকাব্যের নৌযাত্রার বর্ণনাটির অনুসরণ করেছেন। চাঁদ সদাগর, ধনপতি-শ্রীপতি ইত্যাদির বাণিজ্যযাত্রার সঙ্গে আমরা পরিচিত। সেই কল্পনাকে আশ্রয় করে বিহারী দত্তের সাগরসঙ্গমে যাত্রাপথ লিপিবদ্ধ। সাগরে ঝড়ের সাক্ষাৎলাভ এবং তা থেকে পরিত্রাণ মঙ্গলকাব্যের নায়কের সাগরে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে তুলনীয়।

১ শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য (২য় খণ্ড), 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

তথাপি মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় গতানুগতিকতা এবং একঘেয়েমি লক্ষ করা যায়। ভৌগোলিক বিবরণ অনেক সময়ই রসগ্রহণে বাধা জন্মায়। হরপ্রসাদ নিজস্ব রচনারীতির মাধ্যমে যাত্রাপথটি বাস্তবতায় ভাস্বর করে তুলেছেন। লেখক বিগত যুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আত্মপ্রসাদের নিবিড়তায় উপলব্ধি করেছেন। সেকালের ধনী সমাজের কেবল পারাবত ওড়ানোর কাহিনী নয়, বিলাসব্যসনে সুখস্বপ্ন দেখার বিবরণ নয়, বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার প্রাচুর্য ঐশ্বর্যকেও হরপ্রসাদ ফুটিয়ে তুলেছেন। মাঝি-মাল্লাদের একান্ত অসহায় অবস্থাটিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসে যুদ্ধবর্ণনার প্রাচুর্য আছে। সেখানে যুদ্ধের ভীমকান্ত রূপটিই পরিস্ফুট। হরপ্রসাদের বর্ণনাপদ্ধতি ভিন্ন। রূপকথার কল্পনার জগতের সঞ্চিত রসভাণ্ডার এ যুদ্ধ বর্ণনায় বিস্তৃত।

> বাগ্‌দীরা অন্য জাতিকে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য রূপা রাজার সেনায় কেবল বাগ্‌দী, বাগ্‌দীর সংখ্যাও খুব বেশী, দরকার হইলে এক লক্ষ বাগ্‌দী যোদ্ধা অগ্রসর হইতে পারে। রাজা হুকুম দিলেন, সব বাগ্‌দী সাজ, বাগ্‌দীরা কেবল লড়ে। কিন্তু রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি দেখা ডোমদের কাজ, আর ঘোড়সওয়ারেরাও ডোম। দশহাজার বাগ্‌দী সাজিলে, সঙ্গেসঙ্গে পাঁচ হাজার ডোমও সাজিল। তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা বাজাইতে লাগিল, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিল। গান উঠিল—
>
> আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
> ডাল মৃগেল ঘাঘর বাজে
> বাজতে বাজতে পড়লো সাড়া
> সাড়া গেল বামন পাড়া।
>
> ডোমদের সাড়া বামন পাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এ বর্ণনা পাথুরে প্রমাণের নয়—রসিক মনের। পড়তে পড়তে শৈশব-স্মৃতি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথও ছড়াকে এইভাবেই দেখেছেন। এই ছড়াগুলির পশ্চাতে যে ইতিহাস, নরনারীর হাসিকান্না অন্তঃশীলা তাকেই প্রকাশ করেছেন অপরূপ ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ। স্কট যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে বড়ো বড়ো 'অথরিটি'র উপর নির্ভর না করে জনজীবনে প্রচলিত গাথাগল্প, ছড়া-গানকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন (এমন কি Ivanhoe নামটি পর্যন্ত) সে রকম শাস্ত্রী মহাশয়ও বেণের মেয়েতে লৌকিক গালগল্পগুলি, কল্পনাজল্পনাগুলিকে মর্যাদা দিয়েছেন।

আমাদের স্তূপীকৃত সংস্কারের তরীতে পাল খাটিয়ে তিনি হাজার বছরের পুরানো বাংলাকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন।

রূপকথার আঙ্গিক অবতারণা লেখকের সচেতন লিপিকৌশলের উদাহরণ। হরিবর্মদেবের শিকার কাহিনীটিও তিনি রূপকথার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষত রামায়ণ-মহাভারতে রাজাদের শিকার কাহিনী অনেক পাই। হরপ্রসাদ সেই দুরবিস্তৃত ঘটনাবলীকে তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন। রূপকথার গল্প যেমন বলেন মা-দিদিমারা। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের একটি অংশ তুলে দিই—

> সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গার উপর দিয়া নানা রকমের পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, কত রকম শব্দ করে, গান করে, আকাশ যেন ছাইয়া ফেলে। মহারাজাধিরাজ একদিন ঐ সকল পাখী লক্ষ্য করিয়া পোষা বাজ ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইত, বাজ তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিত, চিল্ চিল্ চিল্ চিল্ শব্দ করিত। এক একটাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়া দিত, আবার আর একটাব উপর ধাওয়া করিত।

কেবল রূপকথার ভঙ্গী নয়, স্থানে স্থানে হরপ্রসাদ কথকতার আশ্রয়ও নিয়েছেন। বিশেষত ব্রাহ্মণ গাঞীগোত্র বিচারবিশ্লেষণের বর্ণনায়। ব্রাহ্মণদের কেবল যাজকতাবৃত্তিটিকেই তিনি প্রাধান্য দেন নি, ব্রাহ্মণেরা যে একাধারে 'শাস্ত্রে ও শস্ত্রে তুল্য ছিলেন' এইটিও তিনি বিশদ করেছেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ তুচ্ছ ঘটনাকেও অবহেলা করেন নি।

প্রাচীন সাহিত্যে মেঘদূত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য লক্ষ করেছিলেন। এই নাম-বৈশিষ্ট্য বেণের মেয়েতেও পাওয়া যাবে। বিভিন্ন প্রশস্তিলিপি এবং কাব্যগ্রন্থে যে সমস্ত প্রায় অপরিচিত নাম, সম্বোধনরীতি পাওয়া গেছে হরপ্রসাদ তাদের অবিকৃত রেখেছেন। যেমন বিহারীর ডিঙ্গার নাম মধুকর; কোনো কোনো ডিঙ্গাতে লেখা ওঁ মণিপদ্মে হুঁ; মূর্তির বিশেষণ কেয়ূরবান্, কর্ণককুণ্ডলান্, কিরীট, হিরণখরপুর; গ্রন্থ অভিসময়বিভঙ্গ; গুরুকে সম্বোধন করবার রীতি— শ্রীশ্রী১০৮ সিদ্ধাচার্য লুইদেব। ভবদেব ভট্টের উপাধি বালবলভীভুজঙ্গ, মন্ত্রের কথা— ওঁ আং হ্রীং ক্রোং চং বং ইত্যাদি (এইটি আতিশয্যদোষে দুষ্ট), পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী১০৮ হরিবর্মদেব। এইগুলি প্রাচীনত্বের দ্যোতক কিন্তু উপস্থাপন কৌশলে জীর্ণতার জোবরা পরিত্যাগ করে ভাস্বরতায় দীপ্যমান।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরপূজা

শচীশচন্দ্র বীরত্বের পূজারী। বাঙ্গালীর বল উপন্যাস তার প্রমাণ। কিন্তু বাংলার বীর রাজার কাহিনী তখনও ইতিহাসচর্চার অধীন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতো শচীশচন্দ্র রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করলেন। বীর-পূজাতে রাজপুত জীবনপ্রভাত। উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা শচীশচন্দ্রের এই প্রথম। 'সূচনা'তে তিনি জানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের শিক্ষাকে জনসাধারণে প্রচার করাই তাঁর উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল ১৩১২ সালে। পরে বর্ধিতাকারে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১৭) হয়। বীরপূজা নামে অন্য একখানি গ্রন্থও ছিল।

জ্ঞাতিবিরোধ রাজপুতজাতির চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যাকে অবলম্বন করে শচীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থ রচনা করলেন। শচীশচন্দ্র যে টডের বইকে উপজীব্য করেছিলেন তার প্রমাণ পাই টডের উল্লেখে। প্রমদা চরিত্র-অঙ্কনে শচীশচন্দ্র বিষবৃক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দেবেন্দ্র এবং হীরার নিদর্শন আছে ভবানী ও দেবলের চরিত্রে। হীরা এবং দেবেন্দ্রের প্রতিরূপ প্রমদা। ভ্রাতৃভক্তির প্রভুভক্তির পরিচয় পাই জনার্দনের ভূমিকায়, পিতৃব্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ভবানী চরিত্রে।

রাজা গণেশ

শচীশচন্দ্রের রাজা গণেশ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে বীরপূজা ব্যর্থ রচনা। গতানুগতিকতা থেকেও বীরপূজা অব্যাহতি পায় নি। বরং স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ এইদিক থেকে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু শচীশচন্দ্রের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজা গণেশ লেখকের রচনাক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে শচীশচন্দ্র রীতিমত কল্পনার রঙিন দীপ জ্বাললেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস যে উপেক্ষার বিষয় নয়, বরং ইতিহাসের

মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন এই বোধটি এই উপন্যাসে সর্বত্র বিরাজিত। শচীশচন্দ্র যে সময়ে তাঁর বইটি রচনা করেন সেই সময় ইতিহাস-চর্চার নূতন দিগন্ত উন্মোচিত। ইতিহাসবিদ্যা নীরস তথ্য অনুসন্ধিৎসুর গবেষণার বিষয় নয়। ইতিহাসচর্চার পশ্চাতে দেশের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি এসেছে। রাজা গণেশে তার প্রকাশ।

বইটিতে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান বর্ণিত। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দেশপ্রীতি, প্রজাবাৎসল্য, বীরোচিত নিষ্ঠা অসমসাহসিকতা ইত্যাদি গুণের সমাবেশে রাজা গণেশের চরিত্রটি উজ্জ্বল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণের উপর নির্ভর করে শচীশচন্দ্র রাজা গণেশ লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, শচীশচন্দ্র যে বই লিখেছেন তাতে সমসাময়িক যুগমনের পরিচয়ও আছে। মুসলমান সুলতানের অত্যাচারে যখন প্রজাকুল উদ্‌বিগ্ন, তখন 'কাজীদলনে'র প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রাজা গণেশ ধীরে ধীরে মুসলমানের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন।

ইতিহাসের এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে শচীশচন্দ্র তাঁর সময়ের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিচার করেছেন। গ্রন্থটিতে হিন্দুগৌরবগাথা কীর্তিত। কিন্তু মুসলমান সমাজের উপর লেখকের বিদ্বেষ নেই। মুসলমান জাতির প্রতীক জোনাব আলি খাঁ। জোনাব আলি খাঁ সর্বতোভাবে গণেশের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু যখন সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তিনি মুসলমান পতাকাকে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত, তখন—

> সকলে বিস্মিতনয়নে দেখিল, জোনাব খাঁর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে। তিনি ইসলাম পতাকা পানে চাহিলেন, একবার গণেশনারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর চৈতন্য হারাইয়া ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন।

এই একটি মাত্র দৃশ্যে শচীশচন্দ্র মানুষের বীরত্ব ও সংস্কারকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। চরিত্রের স্বকীয়তায় জোনাব খাঁ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা সবলতা নিয়ে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থিত। রাজা গণেশকে লেখক আদর্শ রাজা হিসেবে দেখেছেন। তৃতীয় খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে সুলতানের মৃত্যুদৃশ্যে রাজা গণেশ এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। রাজা সুলতান অনুগত। কিন্তু অত্যাচারী রাজপুত্র আলিমের ঘোর বিরোধী। সুলতানের অনুরোধেও রাজা কূটনীতির আশ্রয় না নিয়ে আলিমের বিরোধিতা করলেন। এ-বিরোধিতায় রাজা গণেশের চরিত্র প্রকৃত

রাজোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই অংশটি নাটকীয়গুণে সমৃদ্ধ। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ দৃশ্যটিকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা এবং দেশানুরাগে দৃশ্যটিকে দীপ্তিময় করে তুলেছে।

আগে বলেছি গ্রন্থটিতে সমসাময়িক মনোভাব বর্তমান। তার পরিচয় পাই বাঙালির মহিমাকীর্তনে। ইতিপূর্বে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালির বিশিষ্টতা নিরূপণ করেছিলেন। শচীশচন্দ্র উপন্যাসে তাকেই ভাস্বর করে তুললেন। কোনো কোনো জায়গায় বক্তৃতার মতো শোনালেও লেখকের এই বাঙালি-প্রীতি অশ্রদ্ধেয় নয়। এই উপন্যাস থেকেই বুঝতে পারি লেখক বাঙ্গালীর বল লেখবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তবে রানী করুণাময়ীর (রাজা গণেশের পত্নী) কাছে সন্ন্যাসীর উপদেশ কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট।

শচীশচন্দ্র আর্যধর্মে বিশ্বাসী। নারীর পাতিব্রত্য ধর্মকে তিনি বড়ো করে দেখেছেন। মন্দাকিনী (মলযা) রোমান্স-রাজ্যের অধিবাসিনী। স্ত্রীলোককে পুরুষ বেশে সাজিয়ে যত্রতত্র বিচরণ করানো শচীশচন্দ্রের অন্য উপন্যাসেও সুলভ। মন্দাকিনী চরিত্রে শচীশচন্দ্র অনেক কিছু দেখিয়েছেন কিন্তু সব-কিছুই আরোপিত— চরিত্র থেকে উদ্‌ভূত নয়।

রানী ব্রজসুন্দরী

রানী ব্রজসুন্দরী কালাপাহাড়ের জীবন-বৃত্তান্ত। কালাপাহাড়ের ইতিকথায় শচীশচন্দ্র ঔপন্যাসিকেব কল্পনা যোগ করেছেন। কালাপাহাড় সম্বন্ধে নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। এমন-কি আসাম বুরঞ্জীতে কালা-পাহাড়ের উল্লেখ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও কালাপাহাড়ের নাম করেছেন কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ কিছু দেন নি। শচীশচন্দ্র ইতিহাসের থেকে বিশেষ কিছু পান নি। কল্পনাবলে কালাপাহাড়কে কেন্দ্র করে তিনি বঙ্গ উড়িষ্যার রাজনৈতিক বিরোধের পটভূমিকা এঁকেছেন। বিশেষ করে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবের কাহিনী শচীশচন্দ্রের বর্ণনাতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

সুলেমান করনানীর কন্যাকে বিবাহ করলেন 'কালাচাঁদ'। ফলে হিন্দু ধর্মচ্যুত হয়ে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ স্বধর্মদ্রোহী হলেন। করনানী কালা-চাঁদের নাম দিলেন কালাপাহাড়। এ বিদ্বেষ বাঁকা পথ নিলে। হিন্দুর

দেবদেবী যাগযজ্ঞে অবিশ্বাসী কালাচাঁদ মন্দির ধ্বংসের আয়োজন করলেন। উড়িষ্যা অভিযানের মূল ছিল এখানে।

বইটিতে বিরোধের সূত্র দুটি। এক উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে বাংলার পাঠান-নবাবশাহীর। দুই কালাচাঁদ ও ব্রজবালার। অপর কতগুলি গৌণ বিরোধের সূত্র রয়েছে। যেমন কালাচাঁদের বন্ধু গদাধরের সঙ্গে ব্রজবালাকে নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ। প্রসঙ্গত শচীশচন্দ্র উড়িষ্যার জগন্নাথ মহিমার অবতারণা করেছেন। উপন্যাসটিতে ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতা নেই। কালাপাহাড় সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য প্রামাণিকরূপে পেয়েছি লেখক তাকে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। [১]

উপন্যাসটিতে পাঁচটি খণ্ড আছে— ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। কালাচাঁদ এবং ব্রজবালার জীবনে এই পাঞ্চভৌতিক প্রভাব দেখানো হয়েছে। রানী ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবেব ঘটনাটি সম্ভাব্য সীমা অতিক্রম করেছে। শচীশবাবু সম্ভবত রানী ব্রজসুন্দরীর মনের দোলাচল-চিত্ততাকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন।

বইটিতে কালাপাহাড়ের জীবনী বিস্তৃতভাবে দেওযা হয়েছে। অন্য দিকে উড়িষ্যার ইতিহাস বর্ণনাযও লেখকের উল্লাসের অবধি নেই। দুইটি বিষয় সমান প্রাধান্য পাওয়াতে উপন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে পারিবারিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের দুটি ঘটনাপ্রবাহ সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত। এদের মিলনবিন্দু কোথাও নেই। ঘরোয়া কাহিনী ইতিবৃত্তের আধারে স্থাপিত হয নি। এইটি উপন্যাসের অন্যতম ত্রুটি।

এই বইটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সর্বত্র। উড়িষ্যার প্রাচীন কীর্তির প্রতি লেখকের সশ্রদ্ধ প্রশংসা সীতারামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বসন্তের কোকিলে'র অনুকরণে দীর্ঘ খেদোক্তিও দেখতে পাই। রমেশচন্দ্রের মাধবী-কঙ্কণের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি দেখি কালাচাঁদের করনানীর কার্যভার গ্রহণের সময়। নবাবনন্দিনীর প্রেম, দণ্ড, আত্মসমর্পণ রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। কালাচাঁদের জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল নবাবনন্দিনী কিন্তু বিবাহোত্তর জীবনের কোনো পরিচয় না থাকাতে চরিত্রটি উপেক্ষিত।

কালাপাহাড়ের প্রতি লেখকের সমবেদনার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথা

১ J. N. Sarkar, *History of Bengal, Vol, II*

মনে রাখতে হবে শচীশচন্দ্রের কাহিনীতে কালাপাহাড়ের ধ্বংসাত্মক কার্যের সমর্থন নেই। শচীশচন্দ্র সংস্কারবিমুখ ছিলেন না। কিন্তু বিপ্লবীপন্থী নন বলে তিনি কালাপাহাড়কে ধর্মান্তরের বিধানও দিতে পারেন নি।

কালাপাহাড়ের দ্বিতীয় স্ত্রী ভূপবালা (বুনা, ব্রজবালার ভগ্নী) আদর্শ-বাদের চূড়ান্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীর বল

বাঙ্গালীর বল (১৩১৮) এককালে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙালির খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোখ্‌লের চিরস্মরণীয় উক্তির কথা বাঙালি স্মরণ রেখেছিল। কিন্তু ভেদনীতিই ছিল রাজকুলের অস্ত্র। এই অবস্থায় শচীশচন্দ্র তাঁর বই লিখলেন। বইটির ঘটনাকাল ১২২৬ খ্রীস্টাব্দের। প্রেরণাস্থল অবশ্যই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত। গিয়াস উদ্দীন, বীরসিংহ, ফতেসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সাদক খাঁ, ধ্রুব গোস্বামী, কাল্পনিক চরিত্র। ঘটনাক্ষেত্র আজও বর্তমান। গড়খাই, রানী-দহ, কালীমূর্তি আজও দৃষ্ট হয়।
>
> কোনও সমালোচক পুস্তকখানি পড়িয়া কোনও সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছিলেন, পুস্তকে তিনটি ভাব দৃষ্ট হয়। যথা— ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক।

ঐতিহাসিক আলোচনা পরে করছি। আধ্যাত্মিক অংশ যেটুকু বর্তমান সেইটি প্রকাশ পেয়েছে ধ্রুব গোস্বামীর বর্ণনায়। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সর্বত্র। সে প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্রও নয়। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রকেই উৎসৃষ্ট। বেলাবিবির চরিত্রে 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবির ছাপ সুস্পষ্ট। মতিবিবির মতোই সে সুন্দরী, নায়কের প্রতি তার প্রেম দুর্নিবার্য। সেও হিন্দু কিন্তু যবনী বলে পরিচিতা। দিল্লীতে তারও গতাগতি। তফাৎ শুধু বেলাবিবির আত্মত্যাগে। মতিবিবির ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন ছিল না। বেলাবিবি যুগাদর্শে পরিকল্পিত। সেও তার প্রেম অপেক্ষা দেশকে ভালোবাসে বেশি। রণক্ষেত্রে প্রেমিকের পাশে দাঁড়ায়। যুদ্ধ করে এবং একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন স্বল্প।

মায়া এবং বালার (চন্দ্রবালা) চরিত্র সম্পূর্ণ রোমান্স-লক্ষণাক্রান্ত। মায়া যেন [illegible]র (সীতারাম) প্রতিরূপ। মায়ার জন্মরহস্য অজ্ঞাত। উপন্যাসে

সে নিয়তির বেশে দেখা দিয়েছে। গ্রন্থের আকর্ষণীয় চরিত্র নর্মদা। এ চরিত্রটির আবির্ভাব স্বল্পক্ষণের জন্য। কিন্তু পাঠকের মনে সে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।

বীর সিংহ ফতে সিংহ আদর্শ বাঙালি বীর। এই বীরদ্বয়ের পতন করুণ মহৎ সম্ভাবনায় সূচিত। ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে একালের পরিচয় সুস্পষ্ট। সমসাময়িক রাজনীতির অন্যতম প্রভাব ধ্রুব গোস্বামীর রাজ্য পরিকল্পনায়। আগে বলেছি, বইটির মূল প্রেরণা স্বদেশী উদ্দীপনা থেকে এসেছে। তার প্রমাণ সর্বত্র। একটি উদাহরণ দিই। ফতে সিংহ বীর সিংহকে বলেছেন—

> এখন বুঝিয়াছি যে, আমরা দেশের সেবা করিতে আসিয়াছি।— ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া দেশের মঙ্গল কামনায় সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি।

উত্তরে বীর সিংহ বলেন—

> এখন তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। দেশের পূজা আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ধর্ম। রাজ্য আমাদের সংসার— প্রজা আমাদের সন্তান। অস্ত্র ও অর্থ পূজার উপকরণ— রাজ পরিচ্ছদ কৌষিক বস্ত্র।

বলা বাহুল্য, ফতে সিংহের উক্তির মধ্যে সে-যুগের বিপ্লবীদের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে অনেকগুলি স্বপ্নের ঘটনা আছে। নর্মদার স্বপ্নবৃত্তান্ত কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্তের অনুরূপ। অজয় নদীর বর্ণনা, মায়ার বাস্তবজ্ঞানের অভাব, দেবদ্বিজে ভক্তি 'কপালকুণ্ডলা'র অনুরূপ। জয়ার ঈর্ষাবিদ্বেষ স্বাভাবিক কিন্তু পরিণতি ফিকে।

শচীশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক পরিবেশটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালির উত্থান হয়তো কাল্পনিক কিন্তু সেনাবাহিনীর বর্ণনায়, সমরক্ষেত্রের পরিবেশ-সৃষ্টিতে এবং নদীতীরে সংগ্রামের যে-সমস্ত চিত্র দিয়েছেন সেগুলি বাস্তবানুগ। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিশেষত্ব হচ্ছে শচীশবাবু কোথাও যবন-বিদ্বেষ দেখান নি।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

ইংরেজি উপন্যাসের ইতিহাস লিখতে গিয়ে Walter Raleigh উপন্যাস-রচনায় প্রকাশকের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। স্কটের রচনার পূর্বে অক্ষম লেখকবৃন্দ কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের অনুসরণে এবং অনুকরণে অজস্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। কালের নির্মম সম্মার্জনী সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রকাশকরা পাঠকের চাহিদা বুঝে এই-সকল উপন্যাস ছাপাতে দ্বিধা করেন নি। স্থায়ী মূল্য অপেক্ষা সাময়িক মূল্যের দিকে তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। কেননা এতে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য ইত্যাদির উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অনেক সময় তাই হয়েছে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের হিন্দী সংস্করণ বাংলা উপন্যাস প্রকাশের অচিরকাল মধ্যেই ঘটেছে। এক-একটি সংস্করণও কয়েক মাসের মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে। হরিসাধনবাবুর লেখা অজস্র। কিন্তু বৈচিত্র্য বেশি নেই। একই সমস্যাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন বই রচিত হয়েছে। প্রকাশকরা গল্পখোর পাঠকের দিকে তাকিয়ে এই-সমস্ত বই ছাপিয়েছেন, নগদ বিদায়ীও পেয়েছেন। ফলে সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস সস্তা, গতানুগতিক হয়ে পড়ল। প্রকাশকের 'সিরিজ'এর দাবি মেটানোই ছিল যেন ঔপন্যাসিকদের প্রধান কাজ। বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের যেমন রহস্যলহরী সিরিজ, রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজ, কাঞ্চনজংঘা সিরিজ, পিরামিড সিরিজ, মোহন সিরিজ তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসেও দেখা দিল রঙ্গমহাল সিরিজ, আটআনা সিরিজ (এই সিরিজে অনৈতিহাসিক গল্পও আছে)।

রঙ্গমহাল

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গমহাল (১৯০১) এক দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের ভূমিকা হিসেবে এই বইটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। রঙ্গমহালে মোট ছয়টি গল্প আছে। রাজপুত এবং মোগল বাদশার কাহিনীই গল্পগুলির উপজীব্য। ঐতিহাসিক ভিত্তি গল্পগুলির বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু পরিবেশ, নামধাম, রাজা বাদশা

সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গল্পগুলির পশ্চাতে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও লেখকের রচনাগুণে এগুলিতে রোমান্সের খাঁটি সুরটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। গল্পগুলি এই— সেলিমা-বেগম, হিরণ্য মন্দির, পান্না-মহল, হীরক-বলয়, রত্ন মঞ্জিল, মতি-মিনার। নামগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায় অন্তঃপুরের চিত্র-রচনা করাই হরিসাধনবাবুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

নারীর প্রেমই গল্পগুলির প্রাণ। এই প্রেমের সাফল্যের পথে নানা বাধা, নানা জটিলতা। হরিসাধনবাবু প্রেমিক-প্রেমিকার ঘাতপ্রতিঘাতকে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই গল্পগুলি বলবার ভঙ্গিটি কিছু পরিমাণে আবেগাত্মক। লেখকের সহানুভূতি সেখানে পড়েছে যেখানে নারী অসহায়, যেখানে নারীর যৌবন অপচিত।

রচনাকৌশলে লেখক অভিনবত্ব দেখাতে পারেন নি। পুরানো আঙ্গিকই গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক বিভূতি, অন্তঃপুরের ছলনা ঈর্ষা, নিশীথে গোপন অভিসার, এ সবই আছে। উঁচু সুরে বাঁধা নায়ক-নায়িকার আদর্শবাদী রূপও দুর্লক্ষ নয়। কিন্তু বইটির প্রধান আকর্ষণ গল্পরসে এবং নরনারীর ভাববিশ্লেষণে। হরিসাধনবাবুর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে এই-সমস্ত ব্যাপারই লক্ষ্য করি। সেলিমা, নূরজাহান ইত্যাদিই অন্য নাম নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলিতে উপস্থিত। উপন্যাসগুলিতে ভাবদ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে লেখক আতিশয্যের পরিচয় দিয়েছেন। অযথা গল্পকে দীর্ঘ করেছেন, উপকাহিনীর উপর জোর দিয়েছেন। রঙ্গমহালের গল্পগুলিতে ভাবের আতিশয্য নেই এ কথা বলি না কিন্তু গল্পের পরিসর ছোটো হওয়াতে স্বভাবতই লেখকের দৃষ্টি ছিল গল্পের গতির দিকে। কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্লাইমাক্সে পৌঁছাবার চেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। দ্বিতীয়ত তিনি যে-সকল নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন তারা অনেকেই রাজা কিংবা বাদশার বংশধর। কিন্তু নারী-মানসের সরল-আন্তরিক সুরটি যে চিরন্তন খাতে প্রবাহিত তাকে হরিসাধন সুন্দররূপে ফুটিয়েছেন। পাঠক অতীতেও বর্তমানের নরনারীর প্রতিরূপ দেখতে পেয়ে অতীতের সঙ্গে একটা সাযুজ্য অনুভব করে।

হরিসাধনবাবু রঙ্গমহাল সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশকরা যে এই নামটি বেছে নিয়েছিলেন তার মূলে এই বইটি আছে বলে অনুমান করি। বইটি সচিত্র। এই কারণেও পাঠকের কাছে এর আদর হয়েছিল।

শীশ মহল

হরিসাধনবাবুর শীশ্‌মহল সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। বইটি বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসের প্যাটার্নে লিখিত। পাত্রপাত্রীর বক্তব্য নিজেরাই বলে গেছে। উপন্যাসটির দুটি অংশ। প্রথম তস্‌বীরের মূল্য, দ্বিতীয় ঋণ পরিশোধ। তস্‌বীরের মূল্য অংশে আকবর এবং পাঠান বীর সোহানীর দ্বন্দ্ব বর্ণিত, ঋণ পরিশোধে মালববীর রাজবাহাদুর এবং আকবর সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁর দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ভাসা ভাসা ধরণের। কাহিনীর মূল অংশ হল সোহানীর পত্নী গুল্‌সানার প্রতি ইস্কান্দার খাঁর প্রেম এবং পরবর্তী জীবনে মানবেশ্বরের কন্যা রুবিয়ার প্রতি ইস্কান্দারের প্রেম।

কাহিনীর প্রথম অংশে চমৎকারিত্ব আছে। এ চমৎকারিত্ব ফুটে উঠেছে ইস্কান্দার খাঁর রূপতৃষ্ণা বর্ণনায়, কুলসম-শেখজীর সম্বন্ধে, গুলসানার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পতিপ্রেমের অবিচলতায়। কাহিনীব মধ্যে আকস্মিকতার স্থান আছে সত্য কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেরকম রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ তেমন কিছু দোষাবহ নয়। সেনাপতি ইস্কান্দার খাঁর শৌর্যবীর্য ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে রূপমোহ কিভাবে বীর নায়কের পতনকে অনিবার্য করে তোলে তারও পরিচয় এ গ্রন্থে আছে। ইস্কান্দার খাঁর সদাজাগ্রত সৈনিকবুদ্ধি, অতন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠা সব-কিছুই গুলসানার উপস্থিতিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নারীপ্রেমের এই দাহ ও দীপ্তি লেখক যথাযথ বর্ণনা করেছেন। কুলসমের প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং তাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তর্দাহের পরিচয়ে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। এই ঘটনার সমাবেশে রোমাঞ্চকর ঘটনারও একটা বাস্তব ভিত্তি রচিত হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত দুর্বল। এই অংশে প্রেমের সেই চিরাচরিত বর্ণনা— রূপমোহ, মুহুর্মুহু আকস্মিক ঘটনার সূত্রপাত, রঙ্গমহলের রহস্য বর্ণনা। সবগুলিই একঘেয়ে, গতানুগতিক। শাহজামান ফকিরের ঘটনাটির মধ্যেও কোনো বৈচিত্র্য নেই। ফকিরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বেমানান।

গুলসানার চরিত্র এই অংশে অলৌকিকতার সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে নারী কোমলে-কঠোরে, দাহে, দীপ্তিতে প্রথম অংশে বাস্তব রূপ লাভ করেছে পরবর্তী অংশে তার আদর্শবাদ, পরোপকারবৃত্তি এবং ধর্মাশ্রয় একান্ত অপ্রত্যাশিত। চরিত্রটির পরিণতি কার্যকারণহীন।

তসবীরওয়ালীর ঘটনাটি অবশ্যই রাজসিংহের অনুকরণে রচিত। সোহানীর

দুর্গে প্রবেশের পর ইস্কান্দার দুর্গের সৌন্দর্যবর্ণনা অশোভন। সৈনিকের জীবনে এ জাতীয় ঘটনা সম্ভব নয়। ঘন ঘন স্বপ্নদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ।

নূরমহল

নূরমহল (১৩২০) বৃহৎ উপন্যাস। মোট উনসত্তরটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। নূরমহলের কাহিনী নূরজাহানকে কেন্দ্র করে রচিত। নূরজাহান, শের আফগান, যোধবাঈ, আকবর ইত্যাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নূরজাহানের বিবাহ-পূর্ব জীবনের কাহিনীই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য। শের আফগানের সঙ্গে তার প্রেমের লীলা গ্রন্থটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। আকবর-পুত্র সেলিমের নূরজাহানের প্রতি প্রেমে আবর্ত সৃষ্টি হল। লেখক নূরজাহানের দোলাচল-চিত্ততা পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। 'নিবেদন' অংশে লেখক বলেছেন—

> নূরমহল প্রকাশিত হইল। ইহা ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম জীবনের উজ্জ্বল চিত্র। "মেহের উন্নিসা" কি করিয়া "নূরমহল" হইয়াছিলেন, তাহাই এ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে চিত্রিত চরিত্রগুলির, ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি।

মেহের উন্নিসার এই বিবর্তন সম্পূর্ণ প্রেমের ইতিহাস। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহের জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন। এই ঘটনাটি ইতিহাসের সুপরিচিত অধ্যায়। লেখকের নিজস্ব কল্পনা যুক্ত হয়েছে সেলিমার ঘটনার অবতারণায়, মোগল হারেমের বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনায়। হরিসাধনবাবুর রঙ্গমহল রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই দেখি। সে-পরিচয় এই উপন্যাসেও আছে। গভীর নিশীথে রঙ্গমহলের অপরিচিত, রহস্যময় দৃশ্যের বর্ণনার দ্বারা লেখক বিস্ময় সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। শের আফগান, সেলিমের প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনায়ও লেখক উৎসাহ বোধ করেছেন। এতে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়ে নি। বরং অত্যন্ত শিথিল বর্ণনার দ্বারা লেখক গ্রন্থটির গতি ব্যাহত করেছেন।

সেলিমার কার্যকলাপে চরিত্রোচিত সংগতি নেই। সে নিয়তি, এবং নিয়তির মতোই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্ন। আবুল ফজলের মৃত্যুর দৃশ্যটিতে রোমান্স সৃষ্টি করা হয়েছে। মানসিংহের চরিত্র এ গ্রন্থে একটু ভিন্ন রকমের। লেখক আবুল ফজলের ইতিহাস পড়েছিলেন। অনেক ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যে তিনি আবুল ফজলের উপর বরাত দিয়েছেন।

কঙ্কণ চোর

হরিসাধনবাবুর উপন্যাসগুলির উপজীব্য প্রধানত মোগল রাজবংশ। কঙ্কণ চোরের কাহিনীর ঘটনাসংস্থান গুপ্তযুগ। ভিত্তিভূমি পরিবর্তিত হলেও উপন্যাসের প্রকৃতি অনুরূপ রয়েছে। হরিসাধনবাবু যখন এই উপন্যাসটি (১৯১৬) লেখেন তখন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস বার হয়েছে। গুপ্তযুগ তখন ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। হরিসাধনবাবুর ঋণ এই-সমস্ত গবেষকদের কাছে।

মহারাজ নন্দ রাজ্যপ্রাপ্তির পর পত্নী রজতকুমারীকে পরিত্যাগ করে মুরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হন। মুরলাকে বিবাহ করার ফলে রাজ্যে অশান্তি দেখা দিলে। মুরলার জীবন ভাগ্যবিড়ম্বিত। কাহিনীর সূত্র এই এক। এই দৈব-বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্য রাজা মুরলাকে এক মন্ত্রপূত কঙ্কণ পরিয়ে দেন। আকস্মিকভাবে এই কঙ্কণ অপহৃত হয়। কঙ্কণচুরির এই রহস্য উদ্‌ঘাটনই উপন্যাসটির কাহিনীজাল।

আগে বলেছি হরিসাধনবাবু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ঘটালেও স্বরূপত উপন্যাসের আঙ্গিকে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটান নি। চন্দ্রগুপ্ত-নন্দের দ্বন্দ্বটি অপেক্ষিত থাকলেও হরিসাধনবাবু পাঠকের সে কৌতূহল মেটান নি। এখানেও সাসপেন্স সৃষ্টি করা হয়েছে। শকটার-তড়িতা কাহিনী দীর্ঘ এবং উপন্যাসে অপ্রয়োজনীয়। শকটার-ললিতা কাহিনীর সার্থকতাও বিশেষ কিছু নেই। ললিতার চন্দ্রপালকে গুপ্তধনের গৃহে নিয়ে যাওয়া দৃশ্যটিতে রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধনের প্রভাব আছে বলে অনুমান করি। লেখক এই দৃশ্যগুলিকে রোমাঞ্চকর এবং ভীতিপ্রদ করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

চাণক্যের প্রতি লেখকের প্রীতিপক্ষপাত সর্বত্র। চাণক্যের যুদ্ধকৌশল বর্ণনা একঘেয়ে, গতানুগতিক। চাণক্যের বিধবা কন্যা নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আত্রেয়ী (চন্দ্রগুপ্ত)। কিন্তু বর্ণনায় হরিসাধনবাবু কৃতকার্য হতে পারেন নি। সমরকেতু-মন্দাকিনী উপন্যাসে মোটামুটি মানানসই। এদের স্বাধীনতাস্পৃহা, শৌর্যবীর্য এবং আতিথেয়তা আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে। সমরকেতুর এই উক্তি লক্ষণীয়।

> যে পার্বত্যরাজ্য বীরপ্রসবিনী, যাহার স্বাধীনতা আজও পর্যন্ত অক্ষুন্ন যাহা চিরদিন স্বাধীন থাকিবে বলিয়াই ভগবানের সৃজিত, সেই পুণ্যভূমি যে অধীনতার কলঙ্কময় শৃঙ্খল পরিয়া, সমগ্র ভারতে উপেক্ষিত হইবে, এ চিন্তা কল্পনাতেও অসহ্য।

সমরকেতুর রাজ্য ক্ষুদ্র পার্বত্যরাজ্য। পর্বতবাসীদের এই বীরত্ব এবং স্বাধীনতাস্পৃহা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ উপন্যাসটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

লালচিঠি

লালচিঠি আকবর বাদশার সময়ের ঘটনা। হরিসাধনবাবু ডিটেকটিভ উপন্যাসও লিখেছিলেন। রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি পক্ষপাত তাঁর স্বাভাবিক। পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তিনি একের পর এক রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করেছেন। লালচিঠির পরিবেশ ঐতিহাসিক বটে তবু একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে পারি না। কেননা ইতিহাসরসের এখানে আত্যন্তিক অভাব।

মোবারক নামে এক আমীর পুত্র ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে ডাকাতি ব্যবসা ধরে। এবং গিয়াসবেগের ভ্রাতুষ্পুত্রী গুলালকে হস্তগত করার চেষ্টা করে। মোবারকের ভাগ্যবিড়ম্বনার জন্য দায়ী ছিল বাদশার আমীর ওমরাহরা। সুতরাং মোবারকের ক্রোধ ছিল এঁদের উপর। নগরের কোতোয়াল আলী মর্দন খাঁকে সে হস্তগত করে। বীরবল তার তৃতীয় শিকারের অপেক্ষায়। মনিয়া তার লুণ্ঠিত সম্পত্তি। মোবারকের দুর্বলতা একমাত্র এই মনিয়ার কাছে। কিন্তু গুলালকে সে যখন হস্তগত করতে চায় তখন মনিয়ার নারীসুলভ ঈর্ষা জেগে ওঠে। এই ঈর্ষাই মোবারকের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। মোবারক গিয়াসবেগের কাছে ধরা পড়ে বন্দী হল। গুলাল মোবারককে মুক্ত করে পালিয়ে যায়। পরে উভয়ে মিলিত হয়ে সুখে জীবনযাপন করে। গুলালের সংস্পর্শে মোবারক ফকিরিবৃত্তি অবলম্বন করে কাশ্মীর উপত্যকায় বাস করতে থাকে। এই হল কাহিনী। মোবারক তার উদ্দেশ্য জানাত লালচিঠির সাহায্যে।

আগেই বলেছি ডিটেকটিভ উপন্যাসের 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। সে কাজে তিনি কিছুটা কৃতিত্ব দাবিও করতে পারেন।

মতিমহল

মতিমহল (১৩৩৮) বাংলার নবাব জমিদারের কাহিনী। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে বাংলাদেশে মোটামুটি শান্তি ছিল। কিন্তু ডাকাতের অত্যাচার ছিল। এই ডাকাতির বর্ণনা পেয়েছি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশ্বনাথ উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার কথাও এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেয়। এই উপন্যাসে ডাকাতের কথা বেশ খানিকটা অংশ জুড়েছে।

কিন্তু ডাকাতির কথা থাকলেও নবাবের কর্মচারী মীর আলির অত্যাচার প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে মুখ্য। আমিলদার কমললোচন রায়ের কন্যা রত্নময়ীর রূপলাবণ্যে মীর আলি মুগ্ধ হয়ে তাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করে। রত্নময়ীর স্বামী হরপ্রসাদ এ কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। নানা বিপদ কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত মীর আলির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা হয়। শায়েস্তা খাঁ এবং তাঁর কন্যা মতিয়া রত্নময়ীউদ্ধারে সহায়তা করে।

নবাব-বাদশার কথা থাকলেও এটি আসলে গার্হস্থ্য উপন্যাসেরই রূপ পেয়েছে। আখ্যানভাগে হিন্দু রমণীর পারিবারিক আদর্শকে বড়ো করে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটি অত্যন্ত শিথিলবিন্যস্ত। চমৎকারিত্ব কোথাও নেই। বিপদবরণ এবং উদ্ধার নিয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী লেখবার প্রেরণা থেকেই এ উপন্যাসের জন্ম। সে বর্ণনাতে নিছক বিবৃতি ছাড়া আর কিছু পাই না। শ্রীশচন্দ্রের ফুলজানি উপন্যাসেও ইতিহাস বিশেষ নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর যে প্রীতিস্নিগ্ধ বর্ণনা শ্রীশচন্দ্রের লেখায় মেলে হরিসাধনবাবুর লেখায় তার একান্ত অভাব।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি গতানুগতিক। সবই 'বইয়ের জগতের'। মতিমহল নামকরণটিও সার্থক নয়। কেননা মতিয়া বিবির আবির্ভাব ক্ষণিকের। উপন্যাসে তার ভূমিকা একান্ত সংকুচিত। সুতরাং যে গুরু দায়িত্ব লেখক মতিয়ার উপর ন্যস্ত করেছেন সে দায়িত্ব বহনে মতিয়া অক্ষম।[১]

শাহজাদা খসরু

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হরিসাধনবাবুর তখনও ক্লান্তি আসে নি। নূরমহল উপন্যাসে শাহজাদা খসরুর কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি।

১ এ প্রসঙ্গে ডাকাতি নিয়ে লেখা আর একটি উপন্যাসের নাম করতে হয়। সেইটি হচ্ছে দেওয়ান গোবিন্দরাম। বইটি সাধনা পত্রিকায় সমালোচিত হয়।

নুরমহলে যার পরিচয় চকিত এই উপন্যাসে তাঁরই কথা কাহিনী আকারে ব্যক্ত করেছেন। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' লেখক বলেছেন, 'ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর, তদুপরি কল্পনা সহায়তায়, শাহজাদা খসরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা।' মোগল রাজত্বের অনেক রহস্যময় ঘটনা এই উপন্যাসে চিত্রিত।

হরিসাধনবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসে কিন্তু রঙ্গমহল রহস্যের উদ্ঘাটন বেশি স্থান জুড়ে নি। এই উপন্যাসটিতে লেখক মোগল রাজপরিবারের দ্বন্দ্ব চিত্রিত করেছেন। সিংহাসন লাভের আশায় পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, কূটনীতিকে হরিসাধন সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। রাজনীতির দ্বন্দ্বে স্নেহের পরিণাম কি হতে পারে তাকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সে জন্য সে-যুগের প্রকৃত তথ্যের সমাবেশে হরিসাধনবাবু ঐতিহাসিক পরিবেশটি বেশ ভালোভাবেই ফুটিয়েছেন। এ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র পিয়ারাবানু। খসরুর পত্নী পিয়ারার প্রেমনিষ্ঠা, নারীসুলভ সতর্কতা, দৈবে বিশ্বাস, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য উৎকণ্ঠা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

পান্নার প্রতিশোধ

পান্নার প্রতিশোধ হরিসাধনবাবুর 'রঙ্গমহল কাহিনীর' দ্বিতীয় গ্রন্থ। আকবরের পুত্র দানিয়েলের পাঠানবীর মীরণশার বিরুদ্ধে অভিযান এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তর্দিবেগ মীরণশার কাছে পরাজিত হলে আকবর দানিয়েলকে বিজয় অভিযানে পাঠান। দানিয়েল মীরণশার দুর্গের অনতিদূরে ছাউনি ফেললেন। একদিন গোপনে মীরণশার কন্যা পান্নামতি দানিয়েলের শিবিরে গেল। গুপ্তচর বৃত্তিতে পান্না সাফল্যলাভ করলেও দানিয়েলের রূপ তাকে অভিভূত করলে। ফলে প্রেমনীতি এবং রণনীতিতে জট পাকাল। এই জটের প্রথম সূত্র পান্নার ভাবী স্বামী পাঠানবীর আফশান, দ্বিতীয় সূত্র পান্নার দানিয়েল সম্পর্কে দুর্বলতা।

পান্নার চাতুর্যে দানিয়েল বন্দী হলেও তারই সাহায্যে দানিয়েল পলায়নে সমর্থ হন। রাজ্যে এ নিয়ে কানাকানি চলল। পান্না নজরবন্দী হল। আর আফশানের জিম্মা থেকে পালিয়েছে বলে সে যতদিন পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত দণ্ডাদেশের অপেক্ষায় রইল। আফশান বুঝতে পারলে পান্না দানিয়েলের অনুরক্ত। বীরের রক্ত নেচে উঠল।

দানিয়েলকে হত্যা করতে গিয়ে সে বন্দী হল। এদিকে দানিয়েলের শর্ত ছিল যদি মীরণশা আকবর শাকে কিছু টাকা হাতী ইত্যাদি বাৎসরিক কর দেন এবং পান্নাকে দানিয়েলের হস্তে অর্পণ করেন তবে তিনি সন্ধি করতে পারেন। মীরণশা এ অপমানজনক প্রস্তাবে উপায়ান্তর না দেখে আত্মহত্যা করলেন। পান্না পিতাকে হারিয়ে বিমর্ষ হলেও হাল ছেড়ে দিল না। রাত্রিতে দানিয়েলের শিবিরে গিয়ে আফশানের মুক্তি চাইলে। দানিয়েল মুক্তি দিলেন। সন্ধি হল। দানিয়েলের প্রাসাদে পান্না অতিথি হিসেবে এল। আফশান ক্ষুব্ধ হল। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ব্যর্থ হল। পরে সে পান্নাকে হত্যা করতে এলে পান্না তাকে নিহত করলে।

পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চকর দৃশ্যের বর্ণনা সর্বত্র। এমন-কি যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত বপ্রক্রীড়াক্ষেত্রে পর্যবসিত। একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পাঠানবীরের স্বাধীনতাস্পৃহা। এইটি সমসাময়িক পাঠককে কিঞ্চিৎ সাড়া জাগিয়ে থাকতে পারে।

দেওয়ানা

রঙ্গমহাল সিরিজের দেওয়ানা (পৌষ ১৩২৬) তৃতীয় উপন্যাস। শাজাহানের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে আওরঙ্গজেব এবং দারাকে কেন্দ্র করে আমীর ওমরাহদের ষড়যন্ত্র চলছিল। উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি এখানে। আগরার মকিম (রত্ন ব্যবসায়ী) সুজা খাঁ এবং জুমলা খাঁর কন্যা আনার উন্নিসার প্রেমকাহিনী উপন্যাসটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। আনার উন্নিসার ভালোবাসার পাত্র ছিল মীর লতিফ। কিন্তু ঘটনাচক্রে আনা সুজাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। সুজা ছিল উচ্ছৃঙ্খল। প্রমারা খেলার উৎসাহে এবং রক্ষিতা পরিবেষ্টিত হয়ে সুজার জীবন কাটত। বাহারবানু ছিল এই রক্ষিতাদের অন্যতম। আনার সংস্পর্শে সুজার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি শান্ত হল। কিন্তু বাহারবানুর ঈর্ষা জাগল। সুজার আওরঙ্গজেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কিছু গুপ্ত চিঠি বাহারবানুর কাছে ছিল। সুজা সেই চিঠি হস্তগত করলে বটে কিন্তু বাহারবানু তাকে হত্যা করলে। আনার উন্নিসার ভালোবাসার সম্মান দিল মীর লতিফ বাহারবানুকে হত্যা করে। এর পর সুজার মৃত্যু ঘটল। আনার হয়ে গেল দেওয়ানা।

মীর লতিফের বীরত্ব, পরোপকারবৃত্তি এবং উদারতা আরোপিত। কেবলমাত্র গল্পের খাতিরে লেখক ঘটনার পর ঘটনা সংযোজিত করেছেন। লালচিঠিতে যেমন গুলালের সংস্পর্শে মোবারকের পরিবর্তন এখানেও সেরকম আনারের সংস্পর্শে সুজার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। গল্পখোর পাঠকদের জন্য লেখা এই বইটিতে অত্যন্ত সুলভ উপায়ে ঘটনা বিবৃত এবং তা বিশেষত্ববর্জিত।

শরৎকুমার রায়

মোহনলাল

মোহনলাল গ্রন্থটির আরম্ভ হয়েছে উর্মিলা প্রসঙ্গ দিয়ে। কিন্তু উমীচাঁদই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। উমীচাঁদ প্রথমে রানী ভবানীর গৃহে থেকে রামকৃষ্ণের কাছে অর্থলাভের আশায় ছিল। এমন সময়ে সেখানে মোহনলাল-পত্নী উর্মিলা এল। উর্মিলা আশ্রয় পেল। উমীচাঁদ উর্মিলার রূপে মুগ্ধ এবং বামা দাসীর সাহায্যে উর্মিলাকে হস্তগত করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। উমীচাঁদকে মুণ্ডিতমস্তক করে রাজবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করা হল। ওদিকে নবাব আলীবর্দী অন্তিম শয্যায় সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবার সংকল্প করেন। এতে ঘাসিটি বেগম ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকাতে রাজবল্লভের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। সে পত্র সরাই খানায় উমীচাঁদের হস্তগত হল। সেই সময়েই মীরজাফরপুত্র মীরণের সাক্ষাৎ পেয়ে চতুর উমী মীরণের বন্ধু সেজে মুর্শিদাবাদে এল। মুর্শিদাবাদে এসে উমীচাঁদ আপন উন্নতির চেষ্টায় লেগে রইল। সরল মীরণকে প্রলোভিত করে উমীচাঁদ অর্থ সংগ্রহ করলে। ঘাসিটির চিঠি দেখিয়ে সিরাজ, মীরজাফর ইত্যাদির বিশ্বাস উৎপাদন করলে। মীরণ ইয়ারলতিফের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত ছিল। উমী এই সুযোগে মীরণকে তারাসুন্দরীর কথা বললে। মীরণ উমীর কথায় বিশ্বাস করে তারাসুন্দরীকে পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ল। সিরাজের আদেশ ছিল রাজবল্লভকে বন্দী করা এবং ঘাসিটিকে নজরবন্দী করা। কিন্তু মীরজাফর রাজবল্লভ ও ঘাসিটি সিরাজের আদেশ অমান্য করলে। তখন সিরাজ উমীচাঁদ, ইয়ারলতিফ, মীরণের সামনে মীরজাফরকে ভর্ৎসনা করলে। নগর পাহারার জন্য ইয়ারলতিফ নিযুক্ত হল। উমী তার সহকারী নিযুক্ত হল। উমীচাঁদ সিরাজের কাছ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বন্দী করার জন্য দুখানি পরওয়ানা নিয়ে এল। ঘাটিতে পাহারা দেবার সময় একদিন তারাসুন্দরীর দাসী বালার সাক্ষাৎ পেল। মোহনলাল ঢাকা থেকে সিরাজ-সন্নিধানে আসার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে যায় তখন সন্ন্যাসী ভৈরবানন্দ মোহনলালকে

আশ্রয় দিলে। এই সন্ন্যাসী নাটোর রাজবাড়ির প্রণম্য ব্যক্তি। সন্ন্যাসী মোহনলালের সম্যক পরিচয় জেনে উর্মিলাকে নিয়ে এলেন মোহনলালের কাছে। মোহনলাল উর্মিলাকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তারাসুন্দরীও একদিন দেখে গেলেন। এখন তারাসুন্দরী উর্মিলার খবর নেবাব জন্ত বামা দাসীকে চিঠি দিয়ে পাঠাল। সঙ্গে কিছু গহণাপত্র। বামা উমীচাঁদের ঘাটিতে বন্দী হল। উর্মিলাকে লেখা তারার চিঠি উমী হস্তগত করলে। তারা বন্ধুকে 'উমী' সম্বোধন করেছিল। উমীচাঁদ এর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেলে। কেননা তারা যে এই চিঠি উমীচাঁদকেই লিখেছে তা মীরণকে বোঝানো যাবে। আবার উর্মিলার সংবাদও পাওয়া গেল। এইভাবে উমীচাঁদ এক দিকে নিজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করতে ও পরের সর্বনাশ করতে লাগলে। এদিকে রাজা রামকৃষ্ণকে একদিন উমীচাঁদ গ্রেপ্তার করলে। রামকৃষ্ণ উমীচাঁদের এবম্বিধ উন্নতি দেখে বিস্মিত হল। উমীচাঁদ দুর্বল রামকৃষ্ণকে তদীয় ভগ্নী তারাসুন্দরীর নামে কলঙ্ক রটাল। তারাসুন্দরী যে মীরণের প্রণয়াভিলাষী উমীচাঁদ তাঁর প্রমাণ দিলে। সরল রামকৃষ্ণ বিশ্বাস করলে। উমীচাঁদ রামকৃষ্ণ থেকে আট লক্ষ টাকা পাবার প্রতিশ্রুতিতে ফাঁড়ি থেকে ছেড়ে দিলে। উমীচাঁদ তার পূর্ব অপমান ভুলতে পারে নি। 'নিষাদ-উমীচাঁদ' উমরবেগের সহায়তায় এবং বামা দাসীর মাধ্যমে তারার সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হল। তারার স্বামী রঘুনাথ লাহিড়ী দরিদ্র। এই কারণে নির্ধন রঘুনাথ তারাকে সুনজরে দেখতেন না। উমরবেগের কাছ থেকে উমীচাঁদ রঘুনাথের সঙ্গে তারার মনোমালিন্য ছিল এইটি জানতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মীরণের তসবীর এবং তারাকে লেখা মীরণের চিঠি বামা দাসীকে দিয়ে রঘুনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে। ইতিমধ্যে একদিন উমীচাঁদ সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভৈরবানন্দের আশ্রম আক্রমণ করলে। মোহনলালকে আত্মপরিচয় দিয়ে মোহনলালের বিশ্বাস উৎপাদন করে উমীচাঁদ মোহনলালকে সিরাজ সমীপে পাঠিয়ে দিলে। অসহায়া উর্মিলাকে ইত্যবসরে বামার সহায়তায় উমীচাঁদ হরণ করে নিলে। উর্মিলা উমীচাঁদের দ্বারা অপমানিত হল। উমীচাঁদ বাইরে গেলে উর্মিলা সাহসে ভর করে একাকী পালিয়ে গেল মোহনলালের উদ্দেশ্যে। মোহনলালের বাড়ি পৌঁছে মোহনলালকে সে দেখতে পেলে না। মোহনলালের আসার আশায় তার চিত্ত যখন অধীর সেই সময়ে ইয়ারলতিফ সংবাদ নিয়ে এল যে মোহনলাল সেই রাত্রিতে

নবাবের কাছেই থাকবে। ইয়ার উর্মিলাকে দেখতে পেলে। 'বেওয়ারিশ মাল'কে হস্তগত করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে তার আদরের ববু বেগম থাকে। ববু একবার ইয়ারের ভালোবাসায় সন্দিহান হয়ে, তার নিজের দেশ লক্ষ্ণৌ চলে যাবে স্থির করেছিল। পথে অসীম কষ্ট সহ্য করে ভৈরবানন্দ সন্ন্যাসীর সহায়তায় সে ইয়ারের গৃহে পুনরায় ফিরে এসেছিল। সুতরাং ববু এবং উর্মিলার মধ্যে পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। উভয়েই সন্ন্যাসী কর্তৃক উদ্ধার পেয়েছে এবং সন্ন্যাসীর প্রতি উভয়েই কৃতজ্ঞ।

বৃদ্ধ আলীবর্দীর মৃত্যুর সময়ে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। এক পক্ষে ঘাসিটি, রাজবল্লভ, মীরজাফর, অন্য দিকে সিরাজ। মোহনলাল সিরাজের সহায়ক। সিরাজ কৌশলে মতিঝিল আক্রমণ করে ঘাসিটিকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে এলেন। উমীচাঁদ বন্দী হল। এই প্রথম উমীচাঁদের পরাজয়। উমী নিজের বিপদ বুঝতে পারলে। সিরাজ উমীকে ছেড়ে দিলে। উমী গৃহে এসে দেখলে উর্মিলা পালিয়েছে। ক্রোধে উমী দিশেহারা হল। এমন সময় তার আত্মীয় হাজারিমল্ল রামকৃষ্ণের দেয় দশলক্ষ টাকার হুণ্ডি নিয়ে এল। অর্থ পেয়ে উমী এই কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্ত থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলে। কলকাতায় গিয়ে পুনরায় ব্যবসা করবার তালে রইল সে। সিরাজের কাছে বিদায় নিতে গেলে সিরাজ তাকে কাজের ভার দিলে এবং কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিলে। মীরজাফরও কলকাতায় ইংরেজদের সিরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য উমীচাঁদকে পরামর্শ দিলে। বলা বাহুল্য, মীরজাফরও উমীকে প্রচুর ধন দিলেন। উমীচাঁদ বুঝে নিল যে সিরাজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। তা নলিনীদলগত জলবৎ। উমীচাঁদ এইভাবে প্রচুর অর্থ লাভ করে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কলিকাতাভিমুখী হল। কিন্তু যাবার আগেও সে রানী ভবানীর বড়নগরের বাড়ি আক্রমণ করলে। ওদিকে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। কাশিমবাজারের কুঠী আক্রান্ত হলে ইংরেজরা উমীচাঁদকে দোষী সাব্যস্ত করে তার গৃহ আক্রমণ করলে। ওদিকে মোহনলাল সিরাজকে সিংহাসনে নিষ্কণ্টক জেনে উর্মিলার খোঁজে এল। সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে উর্মিলাকে দেখতে পেলে না। মোহনলাল পরে উমীচাঁদের সমস্ত চক্রান্ত জানতে পারলে। ক্রোধে অধীর হয়ে মোহনলাল কাশিমবাজারের কুঠী আক্রমণ করতে গিয়ে উমীচাঁদের গৃহে উপস্থিত হল। উমীচাঁদকে নিহত করতে উদ্যত হলে উমী তার পদতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মোহনলালও যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান হলে দেখতে পেল সে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভের বাটীতে। সেখানে কৃষ্ণবল্লভ এবং তার ভগ্নী মোহনলালের বাগ্‌দত্তা এবং মাতা ইংরেজের বন্দী। কৃষ্ণবল্লভের ভগ্নী শোভা মোহনলালের নিকট তার প্রণয় নিবেদন করে ইহলীলা ত্যাগ করলে। মোহনলাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে এল। তার পর বড়োনগরে তারাসুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে। তারার স্বামী রঘুনাথও স্ত্রীর উপর অহেতুক সন্দেহ প্রকাশ করে জর্জরিত হচ্ছিলেন। পরে তিনিও মারা যান। রামকৃষ্ণ ভগ্নীর কলঙ্ক বিশ্বাস করেছিলেন। জগৎ সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি এই তিনি একমাত্র আচরণীয় ধর্ম মনে করলেন। রানী ভবানীর আর বিশেষ কোনো সংবাদ গ্রন্থে নেই।

মোহনলাল (১৯০৬) সুবৃহৎ গ্রন্থ। প্রকাশকের নিবেদনের অংশটি উদ্ধারযোগ্য।

> এই পুস্তক বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়া প্রায় তিন বৎসর হইল মুদ্রাযন্ত্রস্থ হইয়াছিল। নানা অনিবার্য কারণে ইহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। ইহা বাঙলার মুসলমান পতন সময়ের চিত্র ও চরিত্র লইয়া লিখিত। বর্তমান পুস্তকে ঐ সময়ের প্রথমাংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ হইয়া পড়ায় এই গ্রন্থে তৎসময়ের সম্পূর্ণ চিত্র প্রদান করায় সুবিধা হইল না। তজ্জন্য ইহাতে যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও আখ্যানাংশের ত্রুটি লক্ষিত হইবে তাহা ভবিষ্যতে পূরণের চেষ্টা করা যাইবে।

বলা বাহুল্য, ভবিষ্যতে এ ত্রুটি পূরণ করা আর সম্ভবপর হয় নি। শরৎবাবু গ্রন্থটি জগদিন্দ্রনারায়ণকে (নাটোরাধিপতি) উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ-পত্রে রানী ভবানীর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসচর্চায় লেখকের উৎসাহ ছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠায় এঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহযোগিতাও ইনি সব সময় পেয়েছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রেরণা শরৎবাবু মোহনলাল লেখবার সময়ে পেয়েছিলেন। মোহনলাল সুবৃহৎ গ্রন্থ বটে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো এই বইটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন লাভ কি সংকটময় মুহূর্তে ঘটেছিল তার বর্ণাঢ্য চিত্র এঁকেছেন শরৎবাবু। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে যে কয়টি পাত্রপাত্রীকে শরৎবাবু উপস্থাপিত করেছেন তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্র-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শরৎবাবু রাজনীতির জটিলতা এবং অনিশ্চয়তাকে ফুটিয়েছেন। বস্তুত পলাশির যুদ্ধ বাঙালির জীবনে একটি বেদনাময় স্মৃতি। অতীতের সে করুণ

ইতিহাস প্রকাশে সবচেয়ে বড়ো বাধা উচ্ছ্বাস। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর পলাশির যুদ্ধ কাব্যে সে স্মৃতিকে মূর্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে অনেক-ক্ষেত্রেই 'পলাশির যুদ্ধে'র সাহিত্যরূপটি ফোটে নি। তথাপি নবীনচন্দ্রের মহত্তম কীর্তি হচ্ছে মোহনলাল-পরিকল্পনার মৌলিকতায়। মোহনলালের মধ্য দিয়ে বাঙালির বীরত্বপিপাসা অনেকখানি মিটেছিল। শরৎবাবুর বইটির পশ্চাতে নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধের বিশেষ করে ঐ কাব্যের মোহনলাল চরিত্রটির প্রেরণা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শরৎবাবুর অপর কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি কোথাও উচ্ছ্বাসের দ্বারা সীমা ছাড়িয়ে যান নি। তাঁর ভাষা পর্বতের চূড়া স্পর্শ করে না। সানুদেশেই তার অধিষ্ঠান। কিন্তু মানব-ভাগ্যের করুণমধুর রূপটি প্রকাশ করতে এই ভাষাই সক্ষম। অশ্বারোহীর মতো তার গতি উদ্দাম নয় পদাতিকের মতো। এ ভাষার গতি সতর্ক কিন্তু অব্যর্থ-সন্ধানী। লেখক উমীচাঁদ, উমর, মীরণ, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ খাঁর চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের প্রত্যেকটি বাঁককে স্পষ্ট করেছেন। পাঠকও ষড়যন্ত্রের ভীষণতা, খলের ক্রূরতার স্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। শরৎবাবুর কৃতিত্ব এই যে তিনি চরিত্রগুলিকে যন্ত্ররূপে গড়েন নি। এদের এই খলতা নীচতার পশ্চাতে যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রচ্ছন্ন আছে তারও ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থের নাম যদিও মোহনলাল তথাপি এই বইয়ের প্রধান চরিত্র উমীচাঁদ। খল উমী মাকড়শার মতো তার লূতাতন্তু প্রসারিত করেছে। সকলেই উমীর ফাঁদে পা দিয়েছিল। উমীর গ্রাস থেকে কেউই মুক্তি পায় নি। রানী ভবানী, তারাসুন্দরী, ঊর্মিলা, রঘুনাথ, রামকৃষ্ণ, মীরণ, উমর, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, মোহনলাল, সিরাজদ্দৌলা সকলেই উমীচাঁদের ছলনায় ভুলেছিলেন। শরৎবাবু উমীচাঁদের পাপ প্রবৃত্তিকে এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন যে তা একাধারে যেমন বাস্তবসম্মত হয়েছে তেমনি অন্য দিকে সাহিত্যে পাপচরিত্র অঙ্কন-কৌশলের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই চরিত্রটি স্বতঃই সেক্সপীয়রের ইয়াগো এবং শাইলকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শরৎবাবু উমীচাঁদ চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে ঐ দুটি চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করি। উমীচাঁদের 'চিঠির' বৃত্তান্ত ইয়াগোর রুমাল প্রদর্শনের দ্বারা ওথেলোর ঈর্ষা উৎপাদনের অনুরূপ; অর্থলিপ্সা শাইলকের অনুরূপ।

গ্রন্থটির ত্রুটিবিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করতে হয়। রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য এবং শ্রীজী ও ভৈরবানন্দ সন্ন্যাসীর কাহিনী অতিপল্লবিত। বিশেষত মূল কাহিনীর

সঙ্গে এর বিশেষ যোগ নেই। গ্রন্থটির শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদে ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা যায়। উমীচাঁদের কলিকাতা গমনের পর তার কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। উর্মিলারও বিশেষ কোনো সংবাদ পাই না। পাঠকের অতৃপ্তিও সেইখানে। রাজবল্লভের কন্যা শোভার কাহিনী গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। মোহনলাল চরিত্রটি আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণালব্ধ ইতিহাস, এবং শরৎকুমারের নিজস্ব গবেষণা বইটির ঐতিহাসিক উপাদান জুগিয়েছে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী

রানী ভবানী

দুর্গাদাস লাহিড়ীর রানী ভবানী (১৩১৬) সমসাময়িককালে খ্যাতি পেয়েছিল। পনেরো দিনের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বার হয়। ১২৯১ সালে লেখক সংক্ষেপে রানী ভবানী (দ্বাদশ নারী)র জীবন আলোচনা করেছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই হারাণচন্দ্র রক্ষিতের রানী ভবানী প্রকাশিত হয়। কিন্তু হারাণচন্দ্রের গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বস্তুই ছিল প্রধান। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে দুর্গাদাসবাবুর গ্রন্থখানিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোট দুটি খণ্ডে রানী ভবানীর বিবাহ থেকে তাঁর শেষ জীবন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রামজীবনের পুত্রবধূ রানী ভবানী। রামজীবনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ এবং রামকান্তের মধ্যে শত্রুতা ছিল। এই শত্রুতা রামজীবনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। রামকান্ত অত প্যাঁচ বুঝতেন না। তিনি ছিলেন উদার কিন্তু চঞ্চলমস্তিষ্কের। দেওয়ান দয়ারামই সম্পত্তি দেখতেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদের চক্রান্তে রামকান্ত দেওয়ানকে পদচ্যুত করলেন। রাজ্য হারিয়ে রামকান্তের চেতনা হল। নবাবদরবারে গিয়ে তিনি দেওয়ানকে খুঁজে বার করলেন। এ দিকে দেবীপ্রসাদ নাটোরের রাজ্যাধিপতি হয়ে অত্যাচার নিপীড়ন করতে লাগল। দেওয়ান দয়ারাম রামকান্তের শোচনীয় অবস্থা বুঝতে পারল। প্রভুভক্ত দেওয়ান রামকান্তের সাহায্যে এগিয়ে এল। রানী ভবানী তাঁর গহনা দিলেন দয়ারামকে কাজের জন্য। দয়ারাম নবাব আলিবর্দীকে বলে কয়ে দেবীপ্রসাদকে বন্দী করবার জন্য রাজী করালেন। সৈন্যসামন্ত গিয়ে দেবীপ্রসাদের রাজ্য আক্রমণ করল। দেবীপ্রসাদ পরাজিত হয়ে বন্দী হল। রামকান্ত পুনরায় নাটোর রাজ্য পেল। রানী ভবানীর অনুরোধেই রামকান্ত দয়ারামকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। সুতরাং এবার থেকে রানী ভবানীর পরামর্শ যথাযোগ্য মর্যাদা পেতে থাকে। রানী নানা সৎপরামর্শ দিয়ে, জনহিতকর কার্য করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। সিরাজের নবাব হবার পর যখন দেশের প্রতিনিধিরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল তখন রানী ভবানী এদের ষড়যন্ত্রের ফাঁক ধরিয়ে দিল। কিন্তু রানী ভবানীর

পরামর্শ উপেক্ষিত হল। ইংরেজ রাজ্য জয় করলে। বণিকের মানদণ্ড শাসনদণ্ড রূপে দেখা দিতে লাগল। রানী ভবানীর রাজ্যের উপরও শ্যেনদৃষ্টি পড়ল। রানী রাজ্য হারাতে আরম্ভ করলেন। শেষ জীবনে তিনি অশেষ দুঃখ পেয়েছিলেন।

রানী ভবানীর আদ্যন্ত জীবন-কাহিনী বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের এক স্মরণীয় অধ্যায়। পলাশির যুদ্ধে নাটোরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কি ছিল সে নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার এখনো শেষ হয় নি। অথচ রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে নাটোরও আবর্তিত হয়েছিল এ কথা ইতিহাসসম্মত। সেই কারণে লাহিড়ীমশায় সিরাজের নবাবীপ্রাপ্তি এবং পলাশি-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে নবাবী আমলাতন্ত্রের যোগসূত্রটি দেখানো হয়েছে।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর গ্রন্থের নাম রানী ভবানী। কিন্তু রানীর ঘটনাবলীর সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার যোগাযোগ ক্ষীণসূত্রে আবদ্ধ। এজন্য রানীর চরিত্রটি ভালো করে ফোটে নি। কেবলমাত্র দানধ্যান, উৎসব-অনুষ্ঠানের কাহিনী রানীর মহত্ত্বের পরিচয় দেয় সন্দেহ নেই কিন্তু এর সঙ্গে ঐতিহাসিক আবর্তের ধ্বনিটি ক্ষীণ, শিথিলবিন্যস্ত।

বইটিতে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুকরণ আছে তার প্রমাণ সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। আনন্দমঠের 'স্বামী'দের অনুকরণে দুর্গাদাসবাবুও সন্ন্যাসী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন— হিন্দুরাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন এই-সকল সন্ন্যাসীরাও দেখেছেন। এর মধ্যে একটি চরিত্র অঙ্কনে দুর্গাদাসবাবু বিশেষ কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। সে কৃত্তিবাস। রানীর পিতা আত্মারামের কর্মচারী কৃত্তিবাস যেভাবে প্রভুভক্তি এবং তারাকে রক্ষা করবার জন্য আত্মবলি দিয়েছে তা সর্বকালের পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সিরাজের অত্যাচার, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে ঐতিহাসিক পরিবেশটি মন্দ ফোটে নি। কাহিনীটি শিথিল না হলে উপন্যাসটির উৎকর্ষ বাড়ত।

রাজা রামকৃষ্ণ

রাজা রামকৃষ্ণ ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। রানী ভবানী লেখবার সময়েই দুর্গাদাস লাহিড়ীর রানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের জীবনী লেখবার

ইচ্ছে ছিল। সেই কারণে সেই সময়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

গোপাল নামে ছেলেটি কিভাবে ধীরে ধীরে সংসারধর্ম ছেড়ে দিয়ে কালীসাধক হয়েছিলেন তারই জীবনবৃত্তান্ত লিখতে দুর্গাদাসবাবু উৎসাহী হয়েছিলেন। গোপালের রানী ভবানী প্রদত্ত নাম রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের গোড়া থেকেই সংসারবিরাগ দেখা যায়। রানী সেই কারণে তাকে বিবাহ দিলেন। কিন্তু সংসার-আসক্তি রামকৃষ্ণের হল না। বাংলাদেশে তখন বড়োই দুর্দিন। সিরাজের পতনের পর মীরজাফর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তার পর ইংরেজের আশ্রয়পুষ্ট নবাবরা বাংলাদেশ শোষণ করতে লাগল। রানী ভবানীও ইংরেজের লোভাতুর দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। রামকৃষ্ণের সম্পত্তি ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে গেল। এক দিকে সংসার অন্য দিকে অধ্যাত্মলোকের প্রতি আকর্ষণ। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে রামকৃষ্ণ বিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন। পরিশেষে কালীর আশ্রয়-ছায়াই তিনি সম্বল করলেন। রানী ভবানীর মধ্যেই তিনি মাতৃশক্তি প্রত্যক্ষ করলেন।

গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। পাঁচটি খণ্ডের আরম্ভেই গীতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং গীতোক্ত ধর্মসাধনার বীজই রামকৃষ্ণের জীবনে কিভাবে প্রকাশ পেল তার ইতিকথন হচ্ছে এই উপন্যাস।

এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মীরজাফর ভূমিকা। নবীনচন্দ্র সেন পলাশির যুদ্ধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে সিরাজের স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে অনুতাপদগ্ধ সিরাজের রূপ ফুটিয়েছেন। মীরজাফরের পূর্বস্মৃতিরোমন্থনের মধ্যেও একই অভীপ্সা দেখতে পাই। পাপাত্মার পরিণাম দেখিয়ে দুর্গাদাসবাবু জাতিকে সজাগ করতে চেয়েছিলেন। এইসঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের কথা উল্লেখ করতে হয়। গ্রন্থে নন্দকুমারের স্থান খুব বেশি নয়। কিন্তু নন্দকুমারের দোলাচলচিত্ততার বাস্তবানুগ ছবি সুন্দর ফুটেছে। সতীত্বের আদর্শরূপ ফুটেছে রামকৃষ্ণর স্ত্রী সুন্দরীর মাধ্যমে। ধর্মের উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয়েছে রামকৃষ্ণের সর্বস্বত্যাগের মধ্যে, আর সনাতন ধর্ম কীর্তিত হয়েছে শ্রীজীর দ্বারা।

লক্ষ্মণসেন

লক্ষ্মণসেন (১৩২০) 'সাহিত্য সংবাদ' মাসিকপত্রে বার হয়। এবং মাসিকপত্রে সমাপ্ত হবার আগেই বইটি প্রকাশিত হয়। রানী ভবানী এবং

রাজা রামকৃষ্ণ লিখে খ্যাতি পাবার পরে এই বইয়ের চাহিদাও বেড়ে যায়। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, 'লক্ষ্মণ সেন— ইতিহাস নয়— উপন্যাস্'। বইটি লেখবার আগে লেখক তথ্যসংগ্রহের জন্যে প্রচলিত ইতিহাস সবই দেখেছিলেন। ভূমিকার এক জায়গাতে তিনি কল্পিত কাহিনীর একটি নজির তুলে প্রচলিত ভুলও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ভূমিকাতে লেখক একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। 'এদেশের অনেক ইতিহাস উপন্যাস হইয়া আছে, আবার অনেক উপন্যাস ইতিহাস হইয়া আছে।' বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ইতিহাসের এই প্রকৃতি অস্বীকার করবার উপায় নেই।

লক্ষ্মণসেনের কীর্তিকাহিনী এবং তাঁর পরাজয় ও পরিশেষে বৈরাগ্য-অবলম্বন উপন্যাসটির বিষয়। বইটিতে আর-একটি কাহিনী আছে জয়দেব-পদ্মাবতী প্রসঙ্গ। কিংবদন্তীই জয়দেব-পদ্মাবতী কাহিনীনির্মাণে সহায়তা করেছে। দুর্গাদাসবাবুর উপন্যাসগুলিতে ভক্তিধর্মের পরিচয় আছে। জয়দেব-পদ্মাবতী কাহিনী তারই উদাহরণ। লেখক দ্বাদশ শতাব্দীর যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেশকালপাত্রের বিশেষ চিহ্নটি স্পষ্ট নয়। এদের যে-কোনো যুগে যে-কোনো সময়ে আবির্ভাব ঘটতে পারত। এক কথায় ঐতিহাসিক ভাবমণ্ডলটি অস্পষ্ট, ধূসর।

বঙ্কিম-পরবর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিক

হারাণচন্দ্র রক্ষিত

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' (১৩০৪) প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের পর প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে কিছু কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা দেখা গেল। এর মধ্যে সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হারাণচন্দ্রের অবলম্বনও ছিল এই গ্রন্থটি। কোথাও উল্লেখ না থাকলেও ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যও যে হারাণচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই। গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যই তার প্রমাণ। 'কায়স্থ বংশাবলী' থেকেও হারাণচন্দ্র তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ভূমিকায় হারাণচন্দ্র বলেছেন—

> বাঙ্গালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন না,— তাই এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা। উপন্যাসের যথাসাধ্য পরিপুষ্টির জন্য, আমাকে অনেকস্থলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কোথাও সত্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। খুব বড় একটা আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, যতটা ইতিহাসের গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া অনিবার্য হয়, আমি ততটা গিয়াছি মাত্র। খুঁটিনাটী ধরিয়া এ কথার বাদানুবাদ করিলে, হয়ত আমার এ মত টিকিবেনা। তবে ইহা নিশ্চয় যে, উপন্যাস ইতিহাস নহে।

সত্যচরণ শাস্ত্রীর বইয়ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে হারাণচন্দ্র নিঃসন্দেহ। সেই কারণে ইতিহাসের অপলাপ নেই বলে তিনি দাবি করেছেন। 'বড় একটা আদর্শ' মানে লেখক প্রতাপাদিত্যের মহিমা সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা বলতে রবীন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে অনুমান করি। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা লেখক বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। ভূমিকাতে তিনি উপন্যাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। হারাণচন্দ্র ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়ের সঙ্গে প্রতাপের যে মনোমালিন্য দেখিয়েছেন তা অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের বিচ্যুতির প্রশ্নটি এখানে অপ্রয়োজনীয়। তথ্যকে লেখক যেভাবে যুগোচিত আদর্শে রূপায়িত করেছেন ঐতিহাসিকের আপত্তি সেখানে। প্রতাপাদিত্য লেখকের কাছে বঙ্গের বীর সন্তান। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম পুরোহিত। হারাণচন্দ্র প্রতাপের নিষ্ঠুর

কার্যের যেভাবে সমর্থন করেছেন তা থেকে বোঝা যায় বঙ্গবীরের এই আদর্শ লেখক যুগোচিত ইতিহাসচর্চা থেকে সংগ্রহ করেছেন। আগে বলেছি লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফুলজানি রোমান্সরাজ্যের অধিবাসিনী। সে শ্রী-র আদর্শে পরিকল্পিত। এবং শ্রী-র অনুকরণে ফুলজানিও উড়িষ্যাফেরত সন্ন্যাসিনী। উপন্যাসটিতে সেই নীতিকথা অতিকথনে পর্যবসিত হয়েছে। দাতা কর্ণের আদর্শে প্রতাপের মহিষীদান হাস্যকর দৃষ্টান্ত।

মন্ত্রের সাধন

মন্ত্রের সাধনের (১৩০৫) নায়ক প্রতাপসিংহ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখক রাণা প্রতাপকে 'দ্বিতীয় প্রতাপ' বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের প্রথম উপন্যাস সাফল্য অর্জন করেছিল। লেখকের আশা ছিল এই বইটিও সমাদর পাবে। বলা বাহুল্য, লেখকের সে আশা বিফল হয় নি।

ভীলবাসীদের বিশ্বস্ততা, চন্দাবৎ এবং ভীমশার প্রভুভক্তি লেখকের আদর্শবাদের রঙে রঞ্জিত। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ উপন্যাসের প্রভাব গ্রন্থটিতে আছে। অমরসিংহ-যমুনা কাহিনী রোমান্সের রঙে রঞ্জিত। কিরণময়ী প্রতাপাদিত্যের পত্নীর প্রতিরূপ। লেখক আকবরকে যেরকম কামুক এবং লোলুপ দেখিয়েছেন তা ইতিহাসসম্মত নয়।

প্রতিভাসুন্দরী

খনার প্রবচন বাংলাদেশে বিখ্যাত। এই খনা সম্বন্ধে নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। হারাণচন্দ্রের অবলম্বন এই পাঁচপাঁচি।

বরাহের পুত্র মিহির পিতা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তাম্রপাত্রে ভাসমান অবস্থায় মিহির সিংহলরাজের আশ্রয়ে আসে। সিংহলরাজ চন্দ্রচূড় অপুত্রক। মিহির চন্দ্রচূড়ের আশ্রমে পুত্রবৎ লালিত হতে লাগল। বহুদিন পর চন্দ্রচুড়ের এক কন্যা জন্মাল। এই কন্যার নাম ক্ষমা— দেশীয় উচ্চারণে খনা। হারাণচন্দ্রের উপন্যাসে ইনিই প্রতিভাসুন্দরী। কালে কালে প্রতিভা ও মিহিরের বাল্য-প্রণয় জন্মাল। খনা-মিহির বিবাহে আবদ্ধ হল। প্রতিভা মা-বাপের কাতর অনুনয় উপেক্ষা করে মিহিরের সঙ্গে ভারতবর্ষে এল। এরা উভয়েই জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় মিহির নিজের

যোগ্যতার পরীক্ষা দিলে। রাজা সন্তুষ্ট হলেন। বরাহ মিহিরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পরে মিহিরকে তিনি পুত্র বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু বরাহের প্ররোচনায় খনা মিহির কর্তৃক নিহত হল।

ভূমিকাতে তাঁর ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্লট-নির্মাণে হারাণচন্দ্র মোটামুটি সিদ্ধকাম। খনার জীবনের অলৌকিকতা উপন্যাসের বাস্তবতাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। বরাহের ক্রূরতা, ভূষণ-দূষণের শাঠ্য, চন্দ্রচূড়-চিত্রাবতীর কন্যাপ্রীতি ইত্যাদি উপন্যাসটির মধ্যে প্রকৃত বাস্তবতার সুরটি ফুটিয়ে তুলেছে। বরাহের মিহিরকে শিপ্রা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া ঘটনাটি কর্ণের বাল্য-ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়। ভূষণ যেভাবে মিহিরকে ছদ্ম বিপদের আহ্বান জানিয়ে মৃত্যুপথে ডেকে এনেছিল তা অনেকটা স্বর্ণমারীচের সীতাহরণের মতো। উপন্যাসটির প্লট-নির্মাণে চাতুর্য আছে কিন্তু এই চাতুর্য অনুকরণাত্মক। শেক্সপিয়রের ওথেলো নাটকে ব্র্যাবেনশিওর শাপ চন্দ্রচূড়-চিত্রাবতীর শাপের মতো। ইয়াগো ওথেলোর মনে পাপ প্রবেশ করিয়েছিল। এখানে অবশ্য ইয়াগো নেই। কিন্তু বরাহের প্ররোচনায় মিহিরের চিত্তবিভ্রান্তি অনেকটা সেইরকম। হত্যার দৃশ্যে মিহিরের আচরণ ওথেলোর ডেসডিমোনাকে নিহত করবার প্রাক্‌মুহূর্তের দৃশ্যটিকে মনে করায়। প্রতিভার অন্তিম উক্তি ডেসডিমোনার উক্তির অনুরূপ।

জ্যোতির্ময়ী

রোমান্স অফ ইণ্ডিয়া বইয়ের *The Light of the World* অবলম্বনে হারাণচন্দ্র জ্যোতির্ময়ী (১৩০৭) বইটি বার করলেন। জ্যোতির্ময়ী নূরজাহানের কাহিনী। এতে নূরজাহানের জন্মবৃত্তান্ত, দিল্লীর রাজদরবারের উপস্থিতি, সের আফগানের সঙ্গে বিবাহ এবং পরিশেষে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পরিণয় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। হারাণচন্দ্র ইতিবৃত্তে নিজের কল্পনা যোগ করেছেন নূরজাহানের প্রণয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাহিনী অবতারণা করে।

প্রথম খণ্ড হচ্ছে অদৃষ্ট— অহংকার, দ্বিতীয় আশা— আলোক, তৃতীয় সিদ্ধি —ভোগ। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের প্রভাবে এইরকম বিভাগ বৈচিত্র্যহীন।

বইটিতে অনেকগুলি গান আছে। গানগুলি বিদ্যাপতির। নূরজাহানের কণ্ঠে বিদ্যাপতির গান একটু অভিনব।

রানী ভবানী

রানী ভবানী (১৩১০) লেখকের কথায় একটু 'অভিনব' পন্থায় রচিত।

রানী ভবানী যে হিসাবে দার্শনিক কাব্য বা ধর্মমূলক উপন্যাস, সে হিসাবে প্রত্যক্ষ ঘটনামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে।

রানী ভবানীর শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উপন্যাসটির বর্ণনীয় বিষয়। রানী ভবানীকে লেখক ভগবানেরই অংশ বলে মনে করেছেন। ভক্তির আবেগে গ্রন্থটি রচিত। তার প্রমাণ গ্রন্থশেষে লেখকের সই 'সেবক— হারাণচন্দ্র রক্ষিত'। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রবন্ধ লেখকের অবলম্বন। অপর উৎস— লোকনাথ ঘোষের *The History of the Indian Chiefs, Rajas, Zemindar etc.*

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'যোগরানী' উপন্যাসটি ১৩১১ সালে প্রকাশিত হয়। 'প্রবেদন' অংশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার স্থান যে যথেষ্ট আছে লেখক সে কথাটি সবিস্তারে বলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে সমস্ত প্রজাবর্গ যখন অত্যাচারিত, নিপীড়িত তখন দুই হিন্দু বীরের অভ্যুত্থান হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ভূষণার জমিদার সীতারাম রায়, অপরজন রাজশাহীর রাজা উদয়নারায়ণ রায়।

বঙ্কিমবাবুর প্রসাদে বাঙ্গালী পাঠক সীতারাম রায়কে চিনিয়াছেন—যোগরানী উপন্যাসে রাজা উদয়নারায়ণের কাহিনী বিবৃত করিতে চেষ্টা করিলাম।

বইটিতে প্রসঙ্গত কল্যাণীর ভ্রাতা গোবিন্দরামের কাহিনী স্থান পেয়েছে। কাহিনী হিসেবে যোগরানী অতি তুচ্ছ। ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ, অত্যাচারের বিষদ বিবরণই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বেশি। উদয়নারায়ণের মহৎ আদর্শের কথা সুরেনবাবু সবিস্তারে বলেছেন।

বইটির ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য লেখক স্থানীয় কিংবদন্তী এবং রিয়াজ উস সালাতিনের নিকট ঋণী। যেখানে যেখানে স্থানীয় কিংবদন্তীর সাহায্যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে পাদটীকায় লেখক কিংবদন্তীটি সবিস্তারে বলেছেন। বইটিতে কতগুলি গানও আছে। কল্যাণকুমারী

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রী-র আদর্শে কল্পিত। রাজা উদয়নারায়ণ সীতারামের ছাঁচে ঢালা। শ্রী-র সিংহবাহিনী মূর্তি এবং শেষে অধ্যাত্মন্তরে উন্নয়নের অনুরূপ ঘটনা দেখি কল্যাণকুমারীর জীবনে। কল্যাণের কল্যাণসিংহে রূপান্তর এবং শত্রুশিবিরে গতাগতি অসম সাহসিকতার পরিচয়। আবার পরিণামে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের আশ্রয় অলৌকিকতার স্বাক্ষর। বলা বাহুল্য, কল্যাণকুমারী এবং রাজা উদয়নারায়ণ আদর্শবাদের প্রতীক।

স্বপ্নসুন্দরী

স্বপ্নসুন্দরী (১৩১৫) সিপাহীবিদ্রোহমূলক উপন্যাস। নিবেদনে লেখক লিখেছেন—

> ১৮৫৭ সালের প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে জীবিত মিষ্টার জে. এফ. ফাটোমি (Mr. J. F. Fahtomi) গ্রন্থকারের একখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইল। তাহার সমস্ত ঘটনা ইহাতে নাই। এবং নূতন কথাও অনেক প্রকাশিত করা হইয়াছে।

একটি ইংরেজ পরিবার (মিঃ ল্যাভেটর) সিপাহীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে কিভাবে পুনরায় শান্তি ফিরে পেল তারই কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে স্বপ্নসুন্দরীতে। অপর একটি উপাখ্যান জিনাত ও ফারহাতের প্রেমকাহিনীও গ্রন্থটির অনেকখানি জায়গা জুড়েছে।

সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে রচিত বইগুলিতে বিদ্রোহের নায়কের কার্যাবলীই লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। এই বইতে নায়কদের অনুচরবৃন্দের কার্যকলাপের বিবরণ স্থান পেয়েছে। ফারহাত ও জিনাতের প্রেমকাহিনীর মধ্যে অলৌকিকতা মুসলমানী কেচ্ছার অনুরূপ। সম্ভবত মুসলমানদের প্রেমকাহিনীর আদর্শ হিসাবে এই কেচ্ছার আদর্শ গ্রহণ করতে ফাটোমিকে প্রলোভিত করে থাকবে। স্বপ্নসুন্দরী ভিখারিনীরূপ প্রহেলিকা। ভিখারিনী লেখকের প্রচারের বাহন। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে ফাটোমির মতামত দেশীয় লেখকদের মতোই। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকের কোনো মোহ ছিল না। দেশীয় ও ইংরেজ লেখকের মত হিসাবে এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য—

> ইংরেজ ন্যায়বান ও জ্ঞানবান জাতি। ভারতবাসী শিক্ষাদীক্ষা ভুলিয়া গিয়াছে। কুসংস্কার ইহাদের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদের উন্নতির জন্যে এক আদর্শসমাজের

প্রয়োজন। স্বীকার করি, মানুষ মাত্রেরই দোষ আছে, ইংরেজও নির্দোষ নহে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানানুশীলন তাহাদের বিজ্ঞান অনুশীলন, তাহাদের অর্থ ও বাণিজ্য নীতি এবং সর্বাপেক্ষা তাহাদের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি ভারতবাসীর শিক্ষণীয়। একদিন ভারতবাসী জগতের নিকট সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এখন কি হইবে? পূর্ণিমার দিন সমস্ত আকাশে জ্যোৎস্নোদ্ভাসিত ছিল বলিয়া অমাবস্যার দিন কি হইবে? সে দিন একটি তারকার আলোরই লক্ষ্যস্থানীয় হওয়া কর্তব্য।

কাহিনীনির্মাণে কৃতিত্ব কিছু নেই। অভিনবত্বও নেই। অত্যন্ত শিথিল প্লট। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে যে বাঙালির আগ্রহ ছিল এই বইটি তার প্রমাণ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শোভাসিংহ (১৩১৫) নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বই। যোগেন্দ্রনাথ অনেক সামাজিক-ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। লেখাতে পূর্বগামীদের অনুসরণ থাকলেও যোগেন্দ্রনাথ ভাব-দৃষ্টিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শোভাসিংহ উপন্যাসে যোগেন্দ্রনাথ মোগল-শাসকের পতনের সময়ের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিতুয়া-বর্দার জমিদার বর্ধমান-রাজকুমারী মানকুমারীর প্রণয়াসক্ত। জমিদার শোভাসিংহ অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। বাহুবলের উপর অত্যধিক আস্থাসম্পন্ন শোভাসিংহ গুরু শঙ্কররামের আজ্ঞায় সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তিনি বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে নিহত করলেন। তার এই কাজে সহায়তা করলেন উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ। রহিম খাঁ মোগলবিদ্বেষী। পাঠানরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর। উভয়ের শত্রু মোগল। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। শোভাসিংহ এবং রহিম আপাতত মোগল উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হল। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম মোগল সহায়তার জন্য যশোহর চাকলার মির্জানগরে ফৌজদার নুরউল্লার সাহায্য চাইলে। নুরউল্লার দেওয়ান রামভদ্র এবং তার পুত্র সুবোধরাম জগৎরামের সহায়তায় এগিয়ে এল শোভাসিংহের উচ্ছেদের জন্য। জগৎরামও চেষ্টা করতে লাগল। মোগল ফৌজদার নুরউল্লাও এগিয়ে এল। এ দিকে শোভাসিংহ বর্ধমানাধিপকে পরাজিত করে উৎসাহিত হয়ে

উঠলেন। রহিম এবং শোভাসিংহ দেশ লুণ্ঠনে ব্রতী হলেন। ক্ষুদ্রতর এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জন দিলেন। নূরউল্লা শোভাসিংহের কাছে পরাজয় বরণ করল। শোভাসিংহ রহিম খাঁর অত্যাচারের ফলে একটি সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটে গেল। সেইটি হল ইংরেজের সুতানটী ইত্যাদি গ্রাম ক্রয় এবং দুর্গনির্মাণের অধিকার লাভ। ইংরেজরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এবং দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবার প্রতিশ্রুতিতে সৈন্যবল সংগ্রহে ব্যস্ত রইল। সে যাই হোক জগৎরাম শোভাসিংহকে হুগলীতে আক্রমণ করলে। শোভা এবং রহিম খাঁ পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। শোভাসিংহ বর্ধমান অভিমুখে চললেন মানকুমারী পাবার আশায়। মানকুমারীর সাক্ষাৎ তিনি পেলেন বটে কিন্তু মানকুমারীর হাতেই তিনি জীবন বিসর্জন দিলেন। মানকুমারীও আত্মহত্যা করল। জগৎরাম এসে দেখল সব শেষ হয়ে গেছে। শোভাসিংহের এই শোচনীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। শংকররাম বুঝতে পারলেন ইংরেজ অধিকার আসন্ন। গ্রন্থের মধ্যে নূরউল্লা ও তার দুই বিবি মুন্না এবং করিমন্নেসার কাহিনী স্থান পেয়েছে। নূরউল্লা বিলাসী, আয়েসী আমোদপ্রিয়। করিমন্নেসার চক্রান্তে নূরউল্লা মুন্নাবিবির চরিত্রে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তিনি তাকে বহিষ্কৃত করে দেন। মুন্না পাগলিনীর মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল শোভাসিংহের শিবিরে, মোগলের শিবিরে। একমাত্র উদ্দেশ্য করিমন্নেসার নিধন। করিমন্নেসা নিহত হল। মুন্না শেষ পর্যন্ত নূরউল্লার সঙ্গে মিলিত হল।

বলা বাহুল্য, নূরউল্লা-মুন্না-করিমন্নেসার কাহিনী গ্রন্থের অপ্রয়োজনীয় অংশ। যোগেন্দ্রনাথ রোমান্সপ্রিয় পাঠকদের জন্য এই কাহিনীগুলি উদ্ভাবন করেছেন। সন্ন্যাসী-যোগী-বৈষ্ণবী চরিত্রে বাস্তবতার স্পর্শমাত্র নেই। এই সবই রোমান্সের উদাহরণ। শোভাসিংহের আবির্ভাবও রোমান্সসুলভ পরিবেশে। কিন্তু এই-সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে তদানীন্তন ইতিহাসের করুণ অথচ বাস্তব দিকটি। ইংরেজের বৈঠকে বঙ্গের জমিদারদের সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী। শোভাসিংহের অত্যাচার ইংরেজদের পরম আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পথেই বাংলা-দেশে শনি প্রবেশ করেছিল। এইটি ঐতিহাসিক সত্য। শোভাসিংহের মধ্যে মহত্ত্বের বীজ ছিল না। জগৎরামের ভাষায় সে ডকু-ডাকাত। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যস্থাপন তাঁর ক্ষমতায় ছিল না। কিন্তু তিনিই পরোক্ষভাবে

ইংরেজদের সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে তিনি শোভাসিংহের আবির্ভাবকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন নি। যে ঐতিহাসিক দৃষ্টি থাকলে একটি ঘটনার মধ্যে বৃহত্তর সম্ভাবনার বীজকে দেখা যায় যোগেন্দ্রনাথের তা ছিল। এই কারণে এই বইটির বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য। ভারতচন্দ্র এক সভাসিংহের নাম করেছেন। এই সভাসিংহ এবং শোভাসিংহ এক ব্যক্তি কি না বলা দুষ্কর।[১]

'আশালতা' প্রণেতা

'আশালতা' প্রণেতার ভ্রমর উপন্যাসটি (তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৬) রাজপুত এবং ভীলদের নিয়ে লেখা। রাজপুত শক্তির পতনের কারণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। মাড়োয়ারের রাজা কুমারসিংহ এবং ললিতসিংহের অন্তর্বিরোধ একদা রাজ্যে তুমুল আলোড়ন এনেছিল। এই আলোড়নে ভীলরাও যোগ দিয়েছিল। কুমারসিংহের স্ত্রী সৌরব ললিতসিংহের বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করে এবং কুমারসিংহ স্ত্রীর প্ররোচনায় ললিতসিংহকে তাঁর ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করে। ললিতকে ভীলরা সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। ললিতসিংহের সন্তান লাবণ্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হল। ললিতসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সব কিছুর মূলে লেখিকা ভ্রমর নামে একটি মহিলাকে স্থাপন করেছেন। এই ভ্রমর ছদ্মবেশে জুমেলিয়া নামে ভীলদের উৎসাহিত করেন, তাদের স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দেন, শক্তি ও সাহসের শিক্ষা দেন। ভ্রমর ললিতসিংহকে বিবাহও করেন। ললিতসিংহও ভ্রমরের উৎসাহ উদ্দীপনায় যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস পান। লাবণ্য ললিতের অপর স্ত্রী সৌরভের সন্তান। ললিতের মৃত্যুর পর ভ্রমর লাবণ্যকে রাজপুত সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে রক্ষা করতে অগ্রসর হল।

গ্রন্থটির বিষয় টডের রাজস্থান থেকে নেওয়া। লেখিকা গ্রন্থের নামপত্রে ম্যাকবেথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। লেডি ম্যাকবেথের ছায়ায় কুমারসিংহের

১ এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা।

স্ত্রী গৌরব অঙ্কিত। ভীলদের আচার আচরণ স্বর্ণকুমারী দেবীর বিদ্রোহ উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভ্রমরের অতীত পরিচয় না থাকাতে তাঁকে অনেকটা প্রহেলিকা বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁর কার্যাবলীর পশ্চাতে সন্ন্যাসীর অলৌকিক মহিমার বর্ণনা করে লেখিকা একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

শশিভূষণ বিশ্বাস

শশিভূষণ বিশ্বাসের সোনাবিবি (১৩১৮) আকবরের সেনাপতি মুনীম খাঁ এবং দাউদ খাঁর দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা। মোগলপাঠান যুদ্ধে বাংলার জমিদার ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায় ইত্যাদিও জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাংলার জমিদাররা পাঠানদের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু বিপুল মোগলসৈন্যের সামনে পাঠান এবং বাঙালিসৈন্য পরাজিত হল। এই পরাজয়ের মূলে অবশ্য বাঙালি জমিদারদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং কলহও ছিল।

চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের ভগ্নী স্বর্ণময়ী। তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে স্বর্ণময়ী পাঠান-শিবিরে আশ্রয় পেয়েছিল। তেলিয়াগড়ি দুর্গ মোগল-অধিকৃত হল। স্বর্ণময়ী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ঈশা খাঁর নজরে এল। ঈশা খাঁ চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হবে জেনেও স্বর্ণময়ীকে বন্দী করলেন। চাঁদ রায় কেদার রায় যুদ্ধ করল। কিন্তু ঈশা খাঁই জয়ী হলেন। স্বর্ণময়ী প্রথমে ভ্রাতৃশত্রু ঈশা খাঁর প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হলেও শেষে ঈশা খাঁর প্রণয়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করল। স্বর্ণময়ীর নাম হল সোনাবিবি।

গ্রন্থে পাঠান-আশ্রিত সেনাপতি রাজু খাঁ ওরফে কালাপাহাড়ের কীর্তিকলাপও বর্ণিত হয়েছে। মোগলপাঠান সৈন্যদের আচার আচরণও অনেক অংশ জুড়েছে। আবার ঈশা খাঁ-স্বর্ণময়ীর পরস্পরের প্রতি প্রণয়নিবেদন লেখকের সহানুভূতি লাভ করেছে। এই দুই বিস্তৃত অংশ লেখক সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। কাহিনীটি শিথিল হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঈশা খাঁর জীবনী বিশেষ পাই না। সেই দিক থেকে এর কিঞ্চিৎ মূল্য স্বীকার করতে হয়।[১]

১ অনুরূপা দেবীর রামগড় ও ত্রিবেণী উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থ।

নানা সাহেব

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের নানা সাহেব (১৯২৯) সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী। দীনেন্দ্রকুমারের পরিচয় বাংলা সাহিত্যে প্রধানত রহস্য লহরী সিরিজ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে। ডিটেকটিভ উপন্যাসের অজস্রতা এবং জনপ্রিয়তার জন্য দীনেন্দ্রকুমারের অন্যান্য গ্রন্থগুলির কথা বর্তমান-পাঠক মনে রাখে নি। কিন্তু তাঁর পল্লীচিত্র, পল্লীবৈচিত্র্য, পল্লী-চরিত্র এককালে বাংলার জনসমাজে সমাদৃত ছিল। নানা সাহেবের জনপ্রিয়তাও কম ছিল না। ইতিপূর্বে চণ্ডীচরণ সেন নানা সাহেবের কাহিনীকে বিস্তৃত করে বলেছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু সেই কাহিনীকে নিজের মতো করে বলেছেন।

নানা সাহেবের বিচিত্র কার্যকলাপ আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য চণ্ডীচরণ সেন)। দীনেন্দ্রবাবু নানা সাহেব সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা শিক্ষিত বাঙালির কামনার প্রতিধ্বনি। উপন্যাসটি সম্বন্ধে দীনেন্দ্রবাবু বলেছেন—

> ইহা নানা ধুন্দুপান্তর বিফল চেষ্টার ও ভাগ্য পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী সত্য কাহিনী সিপাহী যুদ্ধের প্রধান নায়কের সাংঘাতিক ভ্রমের অনতিরঞ্জিত চিত্র। নরহত্যা ও অরাজকতার বিস্তার অধঃপতিত পরপদানত দেশের উদ্ধারের উপায় নহে—, ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ তাহার জ্বলন্ত জীবন্ত প্রমাণ।

অন্যত্রও বলেছেন, নানা সাহেব ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশপ্রাণতা তাঁর মধ্যে ছিল না।

শূয়ার এবং গোমাংস ভক্ষণের ভীতি থেকে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা। নিকটতম কারণ হিসেবে আমরা এই তথ্যটি পাই। চণ্ডীচরণবাবু এই ঘটনাটিকে বিস্তৃত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। দীনেন্দ্রবাবু স্বরূপপুরের গ্রামবাসীদের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকৃত উত্তেজনার স্বরূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের অলৌকিক বিশ্বাসের নিদর্শন হিসাবে মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্নদর্শনের কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের উপন্যাসে এরকম অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি। সুতরাং মহারানী যবন এবং হিন্দু উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখতে পারেন বৈকি! আবার এই বিদ্রোহে ইংরেজদের ভীতির নিদর্শন রয়েছে কানপুরের দুর্গের মহিলাদের সংলাপের

১ অনুরূপা দেবীর রামগড় ও ত্রিবেণী উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থ।

মধ্যে। মোট কথা ইতিহাসকে চরম করবার উদ্দেশ্যে দীনেন্দ্রবাবু নিজস্ব কল্পনার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। আগে বলেছি নানার কার্যকলাপের প্রতি দীনেন্দ্রবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। তাই নানার বিশেষণ 'নিষ্ঠুরতার অবতার', নানার স্ত্রী সুমিত্রা বাঈ স্বামী সম্বন্ধে ভাবেন, অদূরদর্শী, কোপণস্বভাব, দর্পান্ধ, দুরাকাঙ্ক্ষী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নানার রামরাজত্বের বর্ণনা পাই। নানার নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর দীনেন্দ্রবাবু কয়েকটি লোমহর্ষক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। এ বর্ণনা বাস্তবসম্মত। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তার বিবরণ দিয়েছেন। অত্যাচারের 'এ-পিঠ' দেখিয়ে দীনেন্দ্রকুমার ক্ষান্ত হন নি। 'ও-পিঠ' দেখিয়েছেন শঙ্করের মা এবং স্ত্রীর উপর ম্যাকেঞ্জী বার্ণার্ডের অত্যাচারের কাহিনী উদ্‌ঘাটন করে। এ ক্ষেত্রে রোগ সাহেবের ক্ষেত্রমণির (নীলদর্পণ) উপর অত্যাচারের দৃশ্যটি অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

নানা সাহেব উপন্যাসটিতে একটি উপকাহিনী স্থান পেয়েছে। সেইটি হল শঙ্কর, প্রভুদয়াল এবং অলকা ইত্যাদির কাহিনী। কাহিনীটির উৎস অবশ্যই শশিচন্দ্র দত্তের *Shunker, A Tale of the Indian mutiny of 1857*। দীনেন্দ্রকুমার শশিচন্দ্রের কাহিনীটিকে বিস্তৃত করেছেন। শঙ্করের স্ত্রীর উপর ম্যাকেঞ্জী বার্ণার্ডের পাশবিক অত্যাচার এবং শঙ্করের প্রতিশোধ-স্পৃহা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইংরেজ চরিত্রের একটি দিককে লেখক পরিস্ফুট করেছেন।

নানা সাহেব উপন্যাসে দীনেন্দ্রবাবু সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর নির্দিষ্ট কোনো মত উপস্থাপিত করেন নি। এর কারণও আছে। লেখক সিপাহী-বিদ্রোহ সমর্থন করতে পারেন নি। অপর দিকে ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যও তাঁকে উদ্দীপিত করেছে। এই কারণে একবার 'এক দিক' আর-একবার অপর দিক, একবার 'এ পিঠ' আর একবার 'ও পিঠ' বর্ণনা করেছেন। অরবিন্দের (লেখক অরবিন্দের গৃহশিক্ষক ছিলেন) প্রেরণা লেখককে উৎসাহ জুগিয়েছিল। সেজন্য দেখি জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি রোমন্থনে লেখকের উৎসাহ সমধিক। নানার অত্যাচার কাহিনী বর্ণনার পর দীনেন্দ্রকুমারের এই মূল্যবান উক্তিটি উদ্‌ধৃত করছি—

> পরলোকবাসিনী বিদেশিনী মাতৃগণ ও ভগিনীগণ। ভারতের ভাগ্যাকাশের ধূমকেতুতুল্য নানার পৈশাচিক অত্যাচারে তোমরা আত্মবিসর্জন করিয়া দুর্বহ জীবনভার হইতে মুক্তিলাভ

করিলে বটে কিন্তু নানা সাহেবের সেই দুর্বহ পাপের ভার আজ তাহার ত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে সমভাবে বহন করিয়া নিত্য লাঞ্ছনার কশাঘাতে ও দুঃসহ বেদনার অশ্রুপাতে তাহার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে।

এইটি গ্রন্থের ফলশ্রুতি।

যদুনাথ ভট্টাচার্য

যদুনাথ ভট্টাচার্যের 'রাজা শত্রুজিৎ সিংহ' (১৩১৯) বৃহত্তর গ্রন্থ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে অহম-পর্তুগীজ-মগদের যুদ্ধ, মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন, রাণা প্রতাপের বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ, সন্ন্যাসীর শিক্ষা, রানী ক্ষমাসুন্দরীর দুঃখকষ্ট, মুকুন্দ রায়ের ভাগ্যবিপর্যয় এবং ভাগ্যলাভ, শত্রুজিতের অসম সাহসিক কার্যাবলী বর্ণিত। বলা বাহুল্য, এতগুলি প্রসঙ্গ একই গ্রন্থে স্থাপিত হওয়ায় উপন্যাসটির গঠন শিথিল। লেখকের বর্ণনাভঙ্গিও তরল। মাঝে মাঝে মঙ্গলকাব্যের কবিদের ন্যায় কোনো প্রসঙ্গ বোঝানোর জন্য লেখক রামায়ণ মহাভারত এবং প্রাচীন নীতিকথার উদাহরণ সবিস্তারে সংগ্রহ করেছেন। তুষ্টু-বিষ্টুর পাগলামি বেমানান। এই দুই পাগলের নীতিকথন এবং কবিতার আকারে ঘটনার সারসংকলন বিসদৃশ। লেখকের দেশ মাগুরা। সেখানে শত্রুজিৎপুর নামে একটি গ্রাম আছে। লেখক মনে করেন রাজা শত্রুজিৎ থেকেই এই নামের উৎপত্তি। এ থেকে বুঝতে পারি অনেক ঘটনাই লেখক কিংবদন্তী থেকে নিয়েছেন। তবে আইন-ই-আকবরীর সাহায্যও যে লেখক নিয়েছিলেন সে কথা গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন। যদুনাথের লেখায় ধার ছিল না। এজন্যে বাৎসল্যরস এবং সখ্যরস তাঁর গ্রন্থে তেমন জমে নি। অথচ এ-দুটি রসের প্রতি লেখকের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল।

দেবল রায়

দেবল রায় (১৯১৩) বাংলার জমিদার-কাহিনী। লেখক ভূমিকাতে বলেছেন তিনি একটি পুথির পাতায় রাজা দেবলের কাহিনী পেয়েছিলেন। পুথির ভাষায় প্রাচীনত্বের কোনো ছাপ নেই। সুতরাং লেখক পুথির যে

অংশ উদ্ধৃত করেছেন তা নিতান্ত আধুনিক কালের। ভূমিকাতে লেখক পাটকেলবাড়ি, ধনেশ্বরগাতি, ঘোড়ানাচ, কেঁকডুবি, মঘি, সত্যিপুর, ফেনদহ, অজয়দহ ইত্যাদির ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিকের কাছে এর যৎকিঞ্চিৎ মূল্য থাকতে পারে। 'বিজ্ঞাপনে' লেখক বলেছেন—

> কতকগুলি স্থানের নামের সহিত যে কিংবদন্তী জড়িত রহিয়াছে, তাহাই অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত হইতেছে।

দেবল রায়ের নাম অথবা উপাধি মুকুট রায়। মগ দস্যুদের সঙ্গে দেবলের যুদ্ধ এই গ্রন্থের অন্যতম বর্ণিতব্য বিষয়। দেবলের চতুরগ্নি যজ্ঞ উপলক্ষ্যে লেখক আদর্শ রাজ্যের রণনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। বিধবাবিবাহ, সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ নাকি দেবলের রাজ্যের আদর্শ ছিল। বলা বাহুল্য, এ চিন্তা নিতান্ত অনৈতিহাসিক। দেবলের অন্তঃপুরের চিত্র অত্যন্ত একঘেয়ে, পাঁচপাঁচি সুরে বর্ণিত। গ্রন্থে অনেকগুলি গান আছে। কবিতারও অপ্রতুলতা নেই। মগদের আক্রমণের বর্ণনা অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব। তবে সকলের মতো যদুনাথবাবুও স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়েছেন।

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'দরাফ খাঁ' ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে লেখক রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা রচনা করেছিলেন। এগুলিতে লেখক ইতিবৃত্তের আড়ালে ধর্মকথার অবতারণা করেছেন। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে 'পৌরাণিক উপন্যাস'ও এককালে সমাদৃত হয়েছিল। এগুলি নিছক পৌরাণিক নাটকের অনুকরণে রচিত নয়। কিছু কিছু কল্পনা মিশানো ছিল। এখন সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় হল এই যে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রবণতা নিয়ে একজাতীয় উপন্যাস লেখা হচ্ছিল যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস' সকলেই যে এ নাম ব্যবহার করেছেন তা নয় কিন্তু কোনো ধর্মপ্রাণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করার প্রবৃত্তির পেছনে ছিল এই মিশ্র অনুভূতি। মূলত এই উপন্যাসগুলির আবেদন ধর্মবোধের কাছে। ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত দিতে

গিয়ে এঁরা পৌরাণিক চরিত্র নির্বাচন না করে ঐতিহাসিক ব্যক্তি নির্বাচন করেছিলেন এই মাত্র তফাৎ। শচীশচন্দ্রের সনাতন গোস্বামী উপন্যাসটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ধর্মচর্চা তো ছিলই। কিন্তু সেখানে ইতিহাসই প্রধান। এই 'ধর্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস'গুলিতে ধর্মই মুখ্য, ইতিহাস অপ্রধান।

দরাফ খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যোগীন্দ্রবাবুর উপন্যাস থেকে জানতে পারি তিনি ছিলেন হিন্দুবংশজাত। দরাফ খাঁ ত্রিবেণীর নিকটে দ্বারবাসিনী গ্রামে এক মুসলমান জমিদার মেহের আলির আশ্রমে লালিত হন। কালে তাঁর নাম হয় দরাফ খাঁ। তিনি একজন অজ্ঞাতনামা বালিকার (মেহের আলির আশ্রিতা) পাণিগ্রহণ করেন। কন্যার নাম মতিয়া। এই মতিয়াও হিন্দু-বংশজাত। মেহের আলির মৃত্যুর পর দরাফ খাঁ বিরাট জমিদারীর মালিক হন। জ্ঞাতি নাজেম আলি দরাফ খাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। দরাফ বনবীরের সাহায্যে সংগ্রামে জয়লাভ করেন। ধীরে ধীরে দরাফের মধ্যে অধ্যাত্মপ্রবণতা দেখা দেয়। একটি অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। তিনি গঙ্গাদেবীর ভক্ত হয়ে পড়েন। এর পর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তিনি তাঁর জন্মদাত্রীর সাক্ষাৎ পান। নিজদেশে এসে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। আবার বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুকাল পরে ত্রিবেণীর ঘাটে সমাধিলাভ করেন। পত্নী মতিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হন। গঙ্গায় তাঁদের দেহ ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দরাফ খাঁ সম্বন্ধে কিংবদন্তীই ছিল লেখকের মূল অবলম্বন। লোকের মুখে মুখে ফিরে কিংবদন্তীগুলি নানা আকার ধারণ করেছিল। যোগীন্দ্রবাবু লোকপ্রচলিত এই বস্তুগুলি খুঁটিয়ে দেখেন নি। বরং সাগ্রহে উদ্ধার করেছেন। যোগীন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যাত্মার জীবন বর্ণনা, ঐতিহাসিকের তথ্যপ্রীতি তাঁর ছিল না।

দরাফ খাঁ সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন।[১] কৌতূহলী পাঠকদের এই প্রবন্ধটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দরাফ খাঁর উল্লেখ শিলালেখেও পাওয়া যায়। এমন-কি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও দরাফ খাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে—

১ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'দরাপ খাঁ গাজী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪

ত্রিবেণীর ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী।
তাহার মোকামে বন্দো বোল শয় কাজী ॥

এই দফর খাঁ গাজীই দরাফ খাঁ। য়াকুব আলির 'ছহি বড় জঙ্গনামা'-তে আছে—

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান ॥

এইগুলিই প্রমাণ করছে দরাফ খাঁর প্রাচীনত্ব।

জয়কুমার বর্ধন রায়

ত্রিপুরার রাজকর্মচারী জয়কুমার বর্ধন রায় সমসের গাজীকে নিয়ে অদৃষ্ট চক্র উপন্যাসটি রচনা করেন। সমসের গাজী পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তি। অন্তত আলিবর্দীর রাজত্বকালে সমসের যে খ্যাতি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ ত্রিপুরার রাজমালায় আছে। সমসের গাজীর লোকান্তরের বেশ কিছুকাল পরেও তাঁর স্মৃতি যে জনসাধারণের মধ্যে অম্লান ছিল তার নিদর্শন রয়েছে তাঁকে নিয়ে লিখিত মীর হবিবের 'গাজীনামা'য়। এই গাজীনামা বইটির বিস্তৃত বিবরণ[১] পেয়েছি। নোয়াখালি অঞ্চলে সমসেরের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি এতই বেড়ে যায় যে তিনি প্রজাদের নিষ্কর ভূমি দান করতে আরম্ভ করেন।

ত্রিপুরায় থাকাকালে জয়কুমারবাবু নিশ্চয়ই এই গাথার সঙ্গে পরিচিত হন। এবং এও স্থিরনিশ্চয় যে সমসেরের কীর্তিকলাপ তখন পর্যন্ত জনসমাজে সপ্রশংস শ্রদ্ধা লাভ করে আসছিল। তবে জয়কুমারবাবু রাজকর্মচারী হওয়াতে নথিপত্র দেখবার সুযোগ বেশি পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। সেই কারণে অদৃষ্ট চক্র বইখানি তথ্যবহুল এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বাক্ষরে দীপ্যমান। নোয়াখালি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ, স্থানের নামকরণে জয়কুমার অভ্রান্ত ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

বাল্যকাল থেকে সমসের সাহসী বীর বলে পরিচিত। পিতা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সমসেরের আশ্রিত রেজা খাঁ সমসেরের সাহস-বীরত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। নোয়াখালিতে বসির খাঁ রতনপুর দুর্গের অধিপতি। বসির খাঁর

১ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা

অত্যাচারে দেশ যখন উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল তখন সমসের বসিরকে দমন করেন। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সমসের যখন ক্ষমতা পেল তখন তিনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধঘোষণা করলেন। একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করে সমসের বলীয়ান হয়ে উঠলেন। সমসেরের এই ক্ষমতা-প্রাপ্তিতে ত্রিপুরারাজ শঙ্কিত হলেন। ত্রিপুরার অধিপতি সমসেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করলে। ত্রিপুরার সৈন্য পরাজিত হল। কোনো-এক সময়ে সমসেরও বন্দী হলেন। কিন্তু কৌশলে সমসের মুক্তিলাভ করে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ত্রিপুরারাজ সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। সমসের এইভাবে ত্রিপুরার সামন্ত রাজা হিসাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু রেজা খাঁ সমসেরের এই গৌরবে শান্তি পেলেন না। সমসেরের ভগ্নী গুলনেয়ার রেজা খাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করলে। অচিরে গুলনেয়ার তার ভুল বুঝতে পারলে। সে গৃহত্যাগী হল। রেজা খাঁ নবাবফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সমসেরকে প্রলোভিত করলে। সমসেরের পত্নী বেলা বেগমের নিষেধ সত্ত্বেও রেজা খাঁর ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। সমসেরকে নিয়ে একদিন নবাবগুপ্তচররা ফেনী নদী দিয়ে পালিয়ে গেল। পথে গুপ্তঘাতকের হস্তে সমসেরের মৃত্যু হয়।

অদৃষ্ট চক্র বইটির পরিচয় লিখে দিয়েছেন আর-একজন ঔপন্যাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী। তিনি সমসেরকে সীতারাম রায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতিহাসে কিন্তু সমসেরকে 'ডাকাইত' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাজত্ব লাভের পর সমসের অবশ্য নানা সদনুষ্ঠান দ্বারা নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করেন। জয়কুমারবাবুর বর্ণনার সঙ্গে ইতিহাসের গরমিল প্রচুর। সমসেরের শেষ জীবন বর্ণনায় তিনি অনৈতিহাসিক লোকপ্রচলিত গালগল্পে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। জয়কুমারবাবুর গ্রন্থে যেটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে তিনি এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিস্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। সমসের বেলা বেগমের প্রতি ভবরানীর বাৎসল্যভাব এবং ভবরানীকে সমসেরের মা বলে সম্বোধন, সমসেরের গুরু ভীমপ্রসাদ এই সবই হিন্দু-মুসলমান প্রীতির জন্য উদ্‌ভাবিত বর্ণনা। এই-সকল বর্ণনা প্রচারগন্ধী হওয়াতে বর্ণবিহীন এবং একঘেয়ে। প্রেমবর্ণনাতেও (গুলনেয়ার - রেজা খাঁ, সমসের-বেলা, আমিনা-জাফর আলি) লেখক গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। সমসেরের রাজ্যপ্রাপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উল্লসিত হয়েছিল। এর পশ্চাতে

যে রাজনৈতিক কারণ ছিল জয়কুমারবাবু উপসংহারে সে কথা বলেছেন। নবাবী আমলের তখন ভগ্নদশা। ত্রিপুরা রাজ্যে গৃহবিবাদ। আভ্যন্তরীণ অভাব-অনটন প্রজাদের নবাবী শাসন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে উদ্‌বেজিত করেছিল। সমসেরকে এজন্য ত্রাণকর্তা বলে মনে হয়েছিল। সমসেরের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা সম্ভবত একটি লোকপ্রচলিত গল্প থেকে পাওয়া। কথিত আছে সমসের কালীসাধক ছিলেন। এবং এর জন্যই ধর্মসাধনা রাজ্যপালন অপেক্ষা বৃহত্তর হয়ে উঠলে সমসেরের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসম্পূর্ণ উপন্যার 'ডঙ্কা নিশান' ১৩৩০ সালে প্রবাসীতে ধারাবাহিক বার হচ্ছিল। উপন্যাসটি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১] সত্যেন্দ্রনাথের জ্ঞান-পিপাসা পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে প্রাপ্ত। তাঁর কবিতায় ইতিহাস-প্রীতির পরিচয় পেয়েছি। সে ইতিহাস কবিকল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত নয় —স্থির বিচার ও তথ্যের যাথার্থ্যে তা দীপ্যমান। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় কেবলমাত্র রোমান্সসৃষ্টির আত্যন্তিক মোহে ইতিহাসকে বিকৃত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল।[২] সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখেও অতীতের তথ্যের উপর তাঁর কবিদৃষ্টি প্রসারিত করেছেন। ফলে উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হলেও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বরূপ কি হওয়া উচিত তার পরিচয় ডঙ্কা নিশানে আছে।

মগধ ও বৈশালীর দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির বিষয়। এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত সন্ধিতে নিষ্পত্তি হয়। অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই সন্ধি হচ্ছে যবন বিতাড়নের পূর্বাভাস। চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হয়ে যবন অভিযান করেছিলেন। ভারতের বৃহত্তর ঐক্যের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন উপন্যাসটির অন্যতম ফলশ্রুতি।

১ রাখালদাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, প্রবাসী, ১৩৩০ মাঘ

অসম্পূর্ণ উপন্যাসটির পূর্ণবিচার সম্ভব নয়। লক্ষণীয়, উপন্যাসটি চলিত ভাষায় লিখিত। সত্যেন্দ্রনাথ মৌর্যযুগের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সে-যুগের রীতিনীতির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধাস্ত্র, পরিখা, রণকৌশল, প্রজাপুঞ্জের সাহস ও তিতিক্ষা সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বল্প হলেও চন্দ্রগুপ্তের যেটুকু পরিচয় উপন্যাসটিতে আছে তাও চমৎকারভাবে বর্ণিত। পর্বতবাসীর চরিত্র বর্ণনায় আরণ্যক সারল্যের মনোহর চিত্র এঁকেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। গোয়ালাদের রূপায়ণেও তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। বইটি ছাপা নেই। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনার দু-একটি নিদর্শন দিচ্ছি—

আমরা যে সময়কার কথা বলছি তখন এই দশসিদ্ধিক নন্দের চতুরঙ্গ সেনার ডঙ্কা ধ্বনিতে চির-বিদ্রোহী ও চির-স্বাধীনতাপ্রিয় বৈশালী নগরের দ্বার-গ্রাম পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আর, চীনাংশুকের তৈরী— রক্তমাখা চিলের ডানার মতন মগধসম্রাটের বিজয়োদ্ধত নিশানগুলো যেন বৈশালীবাসীদের শেষ স্বাধীনতাটুকু মাংসের টুক্‌রোর মতন ছোঁ দিয়ে কেড়ে নেবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছে।…দুর্গের চারিদিকে ত্রিশ হাত চওড়া বিশহাত গভীর পরিখা; পরিখায় পোষা কুমীরের দঙ্গল। তার পর কাঁটার বেড়া। তারপর জানুভঞ্জনী ত্রিশূলের বেড়া। এত সত্ত্বেও মগধ-সৈন্যের চেষ্টার ত্রুটি নেই। নগরবাসীরা তাদের উপর কখনো বা যন্ত্র-সাহায্যে যমদণ্ডের মতন গুরুভার লোহার সজারু দেবদণ্ড নিক্ষেপ করে একসঙ্গে অনেককে জখম করছে, কখনো বা উপর থেকে তপ্ত তেল ঢেলে মনের ঝাল্ মেটাচ্ছে, আবার কখনো বা রাশি রাশি এঁটো পাতা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

সীমা-সাক্ষীর বর্ণনাতে সে-যুগের অদ্ভুত বিশ্বাসের একটি দুর্লভ নিদর্শন সত্যেন্দ্রনাথ দিয়েছেন—

সীমা-সাক্ষী জানেন না? যাদের মধ্যে সন্ধি পাকা হবে তাদের দুই তরফের দু'জন জীয়ন্ত লোককে দুটো গর্ত কেটে পিঠোপিঠিভাবে পুঁতে ফেলা হয়। পাহাড়ীদের বিশ্বাস এরা মরে ভূত হয়ে নিজের নিজের স্বদেশের সীমা রক্ষা করে। জীয়ন্ত বিদেশী বা বিদেশীর ভূত কাউকে নিজের এলাকায় ঢুকতে দেয় না। এদেরি বলে সীমা-সাক্ষী। পাহাড়ীরা এদের প্রাণান্তে চটায় না। এ কথা আমি পাহাড়ীদের মুখে অনেকবার শুনেছি। আমার বিবেচনায় এরূপ একটা অনুষ্ঠান করে রাখা মন্দ নয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ইতিহাসে দৈন্যের অবধি নেই। পুরাণ-ইতিহাস যমজ ভাইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। জনশ্রুতি, গালগল্পগুলি তথ্যের ভাবে 'অথরিটি'র মূল্য লাভ করেছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ অতথ্যকে দূর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেবল খনন-আবিষ্কারেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয় নি বলেই, কুলজী সাহিত্যের পরিবর্তে আমরা পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ইতিহাস। মুসলমান আমলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে মুসলমান ঐতিহাসিদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক উপাদানের নিতান্ত অভাব ছিল। ভারতবাসীর কাছে কিছুকাল আগেও হিন্দুযুগ ছিল কল্পনার বস্তু, ধ্যানগম্য আদর্শ। এ বস্তু ঐতিহাসিকদের কাছে নিন্দিত। অতএব তাম্রশাসন, শিলালিপির উপর নির্ভর করতে হল। খননকার্য চলতে লাগল সর্বত্র। রাখালদাসের এ বিদ্যায় আগেই হাতে-খড়ি হয়েছিল। তিনি সে শিক্ষা এবং অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে আবিষ্কার করলেন মহেঞ্জোদরোর পুরাকীর্তি। এ আবিষ্কারে তাঁর আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই ছিল। তিনি বলেছেন, It comes once in age— এ উক্তি অহমিকার নয়, সত্যের।

তথাপি ইতিহাস রচনা করবার সময় উপাদানের অভাব রাখালদাস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে উপাদানের অভাব লেখককে পীড়িত করেছিল। তিনি বলেছেন—

> যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।[১]

উপন্যাস রচনা করে তিনি এ অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। রাখালদাসের কৃতিত্ব এখানে যে তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের কঙ্কালে মেদ মাংস যোজনা করেছেন। প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বর্তমান কালে অর্থাৎ রাখালদাসের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে এই

১ বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ভাগ), ভূমিকা

কৃতিত্বের উপলব্ধি সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কেননা নূতন গবেষণার আলোকে আমরা আজ বিস্মৃতযুগকে মোটামুটিভাবে জানতে পেরেছি। কিন্তু রাখালদাসের পথ ছিল দুরূহ এবং দুর্গমও বটে। ইতিহাসকে তিনি পলিটিক্সের সেবাদাসী[১] করেন নি। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে রাখালদাসের পার্থক্যটি লক্ষ্য করবার মতো। পাশ্চাত্যজগতে ইতিহাসচর্চার অপ্রতুলতা নেই। এমনকি এক-এক যুগের অস্ত্রশস্ত্রের আকারপ্রকার নিয়ে পর্যন্ত সূক্ষ্ম গবেষণা হয়েছে। স্কটের উপন্যাসে তীরের মাপ নিয়ে পর্যন্ত আলোচনার বিরাম নেই। সুতরাং ইতিহাসের এই দৈন্য যখন আমাদের দেশে আকাশপ্রমাণ সেখানে কল্পনার আশ্রয়ে একটি যুগকে জীবন্ত করে তুলতে হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করবেন এই আকাঙ্ক্ষাটুকুই যথেষ্ট নয়। রাখালদাসের জীবনী থেকে জানতে পারি উপন্যাস রচনার সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুবর্গ কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। এ তিরস্কার লেখক নীরবে হজম করেন নি। রাখালদাসের মনে ছিল ম্যাসপেরোর (G. Maspero) আদর্শ। ম্যাসপেরো যেমন এক দিকে প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমন অন্য দিকে সেই-সমস্ত উপাদানের সাহায্যে প্রাচীন মিশরকে উপন্যাসাকারে উপস্থাপিত করেছেন। রাখালদাস এই পথের পথিক।

রাখালদাসের আগে বিশেষভাবে মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্ব নিয়েই উপন্যাস রচিত হয়েছিল। রাখালদাস হিন্দুযুগকে আশ্রয় করে সে-যুগের পরিবেশ রচনা করলেন। সে-যুগের রাজনীতি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্রে তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রথম তিনখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। রাখালদাস যে প্রবল স্বদেশ-প্রেরণা থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি রচনা করেন— সে প্রেরণা উদ্দীপনা প্রাচীন কালে প্রসারিত হয়েছে। কেউ কেউ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কেননা পারসিকরা যখন গ্রীস দেশ আক্রমণ করে তখন প্রবল স্বদেশী উদ্দীপনাই দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।[২] এই স্বদেশী প্রেরণাই হেরেডোটসের মতো ঐতিহাসিকের জন্ম দিয়েছিল। গুপ্তযুগে হুন আক্রমণ এ রকম একটি ঘটনা। রাখালদাস হুনদের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযানকে

১ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪

২ A. B. Keith, *History of Sanskrit Literature*

বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন। দেশের সত্তা হূন আক্রমণে আলোড়িত, স্বদেশ রক্ষার জন্তে উদ্দীপিত। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের অভিযান মহৎ গৌরবে চিত্রিত। প্রশ্ন হল সে-যুগে এরকম কোনো স্বদেশ-প্রেরণা ছিল কি? এর উত্তরে বলা যায় নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেইটি গ্রীস-বাসীর অনুরূপ কি না তা বলা দুরূহ। রাখালদাস উপন্যাসে সে-যুগের ইতিহাসকে সমসাময়িক দৃষ্টিতে বৃহত্তর করে দেখেছেন। তিনি বাংলার হেরেডোটস।

রাখালদাসের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় আছে,[১] কিন্তু সেই-সব গ্রন্থে তিনি দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করেন নি। উপন্যাসগুলিতে তিনি সে অভাব পূরণ করেছেন। সেকালের কেবল যুদ্ধবর্ণনা নয়— মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার ছবিও এঁকেছেন। এই হিসেবে তাঁর উপন্যাসগুলি ইতিহাসের পরিপূরক।

রাখালদাসের উপন্যাসেও দৈবজ্ঞের গণনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস দেখি। এগুলি পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের প্রভাব।

আরও একটি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুখানি উপন্যাস[২] এবং রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম তিনখানি উপন্যাস[৩] মিলিয়ে নিলে আমরা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে পতনের একটা পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি। অর্থাৎ অশোকের সময় থেকে মুসলমান আক্রমণ -পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি পূর্ণরূপ এই উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যাবে। গুরুপ্রসাদের সঙ্গে রাখালদাসের এই আর-এক যোগ।

শশাঙ্ক

শশাঙ্ক রাখালদাসের প্রথম উপন্যাস। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। উপন্যাসটি রাখালদাসের শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উৎসর্গিত। 'পাষাণের কথা' থেকেই বুঝতে পারি লেখক ইতিহাসকে জনপ্রিয় করে তোলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন—

১ রমাপ্রসাদ চন্দ, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', প্রবাসী, ১৩৩৭

২ কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে

৩ শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা

'পাষাণের কথা'[১] মনীষিগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া দুই বৎসর পরে 'শশাঙ্ক' আরব্ধ হইয়াছিল।'

এবারে আর গল্পাকারে ইতিহাস নয় খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন রাখালদাস।

প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করে কথাসাহিত্যের 'প্রশস্ত সমতল বর্ত্ম' আশ্রয় করার কারণ হিসেবে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নজির দেখিয়েছেন। মৃণালিনী ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ঘটনাসংস্থান মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকাল।

'মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়া আমরা মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শন স্বরূপ শশাঙ্ক রচিত হইল।'

শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম মৌলিক অনুমানগুলি করেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন তাঁর আলোচনা সিদ্ধান্তের স্তরে পড়ে না। অতএব কল্পনার একান্ত প্রয়োজন। নিছক কল্পনা ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে অশ্রদ্ধেয় এবং বর্জনীয়। সম্ভবত এই কারণেও লেখক উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, লেখক উৎসর্গপত্রে লিখেছেন, 'যাঁহার অপূর্ব শিক্ষা ব্যতীত হিন্দুবৌদ্ধ দ্বন্দ্বযুগের ইতিহাস অবলম্বনে উপাখ্যান রচিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ'— এই থেকে বোঝা যায় শশাঙ্ককে লেখক এই ধর্মকলহের একজন নেতারূপে দেখেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে তিনি হিন্দুবৌদ্ধ যুগকে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছিলেন।

শশাঙ্কের একস্থানে লেখক বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র উল্লেখ করেছেন[২], আবার হিউয়েন সাঙয়ের অপব্যাখ্যাকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যত্র। তথাপি মনে হয় লেখক তাঁর উপন্যাস রচনায় এ দুটি বইয়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে রাখালদাসের উল্লেখযোগ্য গবেষণা অবশ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে (১ম ভাগ) আগেই পেয়েছি। শশাঙ্ক উপন্যাস রচনায় প্রধানত শিলালিপি তাম্রশাসনগুলিই রাখালদাসের অবলম্বন ছিল।

১ পাষাণের কথা উপন্যাস নয়। গল্পচ্ছলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-কথা। এই বইটিকে রাখালদাসের উপন্যাসগুলির পটভূমিকা বলতে পারি।

২ "Historically we may say that the work is of minimal value, though in our paucity of actual records it is something even to have this!"— A. B. Keith, *History of Sanskrit Literature*.

রাখালদাসের অনুসরনে শশাঙ্কের কথা বলি। শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছিলেন, এইটি হিউয়েন সাঙের অভিমত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে দুষ্টাত্মা বলেছেন। শশাঙ্ক যে বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছিলেন এ ছাড়াও চীনীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের রাজা বলেছেন। বাণভট্ট বলেছেন গৌড়াধিপ। হর্ষচরিতে শশাঙ্ক 'দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ'। হর্ষচরিতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। রাখালদাস উভয়মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। রাজ্যবর্ধন দুর্দান্ত হূনদের পরাজিত করেছেন, মালবাধিপকেও পরাজিত করেন। সুতরাং এই প্রবল নরপতিকে শশাঙ্ক অসহায় অবস্থায় নিহত করেছিলেন এইটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেখক শেষে বলেছেন, দেবগুপ্তের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক সসৈন্যে রাজ্যবর্ধনকে আক্রমণ করে নিহত করেন। শশাঙ্ক-রাজ্যবর্ধন ঘটনা নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি।[১] কিন্তু রাখালদাসের উপন্যাসে এই ঘটনাটি তাঁর নিজের মত অনুযায়ীই বর্ণিত এবং ঘটনাটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্ট ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'মগধ গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।' ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ নেই। বস্তুত রাখালদাস পান নি। সুস্থিবর্মার পুত্র ভাস্করবর্মা। তিনি কামরূপ অধিপতি। ভাস্করবর্মা কিছুদিনের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। শশাঙ্ক এঁকে যুদ্ধে পরাজিতও করেছিলেন। ভাস্করবর্মার সঙ্গে যে শশাঙ্কের যোগসূত্র ছিল এ কথাও রাখালদাস বলেছেন। হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধেই যে শশাঙ্ক নিহত হন সে কথা ইতিহাসে জানা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার পত্নী ছিলেন। রাজ্যশ্রী সম্বন্ধে শশাঙ্কের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে রাখালদাস তা বিশ্বাস করেন না।

শশাঙ্ককে নিয়ে এখন পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত অনেক সমস্যারই সমাধান হয় নি। নূতন তথ্যের অভাবে শশাঙ্ক সমস্যা এখন পর্যন্ত অনুমানের স্তরে। অতএব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে কল্পনা ও অনুমান যথেষ্ট আছে। তথ্যবিরলতা শশাঙ্কের পূর্ণজীবনী রচনার

১ R. C. Majumdar: *History of Bengal*, Vol. I (Appendix).

প্রতিবন্ধক। কিন্তু রাখালদাস তথ্যের দৈন্য সত্ত্বেও শশাঙ্ককে অবলম্বন করে একটি মৌলিক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করেছেন। সেইটি হচ্ছে শশাঙ্ককে নিয়ে যে ঐতিহাসিক ঘটনার নূতন অধ্যায় শুরু তার যাথার্থ্য নিরূপণে।[১] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে।

Mr. R. D. Banerji's view that Sasanka was the son or nephew of Mahasengupta has hardly any basis to stand upon.

তবে রাখালদাসের একটি গুরুতর ভ্রান্তির দিকে ঐতিহাসিকেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক রোটাসগড়ের শিলালিপির সাক্ষ্যে গুপ্তসম্রাটদের সামন্ত হতে পারেন স্বচ্ছন্দে কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্ত এবং শশাঙ্ক এক ব্যক্তি নন। আর যদি এঁরা একও হন তথাপি গুপ্তসম্রাটদের সঙ্গে শশাঙ্কের বংশগত আত্মীয়তা আবিষ্কার করা দুরূহ।

আসলে গুপ্তসম্রাটদের পতনের সময় শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে। এবং গুপ্তসম্রাটরা যেভাবে রাজনীতি পরিচালিত করতেন শশাঙ্কও সেইভাবে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন।[২]

আর-একটি কথা। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসংঘের সম্মিলিত অভিযানকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা। চীনীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং বাণভট্টের কথা আগে বলেছি। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এঁদের অপব্যাখ্যাকে দূর করবার দায়িত্বও লেখক গ্রহণ করেছিলেন। বাণভট্ট আপন প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছেন। হিউয়েন সাঙ সম্ভবত ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। রাখালদাস এই কারণে বৌদ্ধষড়যন্ত্রের কাহিনী বলেছেন। হর্ষ সম্বন্ধেও এক জায়গায় কটাক্ষ করেছেন। যেহেতু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়[৩] সেই কারণে রাখালদাসের ব্যাখ্যাকে মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কিন্তু একটি কথা আছে।

১ "Beginning his life as a vassal chief, he made himself master of Gauda, Magadha, Utkala and Kongada, and consolidated his position by defeating the powerful Moukharis": R. C. Majumdar ed. *History of Bengal,*

২ He was the first historical ruler of Bengal who not only dreamt imperial dreams, but also succeeded in realising them. He laid the foundations of the imperial fabric in the shape of realised hopes and ideals on which the Palas built-at on later age.— R. C. Majumdar. ed. *History of Bengal*, Vol. I

৩ রমাপ্রসাদ চন্দ, গৌড়রাজমালা

উপন্যাসে হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘট্টের কাহিনীটি আত্যন্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে শশাঙ্কের বীরত্ব কাহিনী নেপথ্যে থেকে গেছে। রাখালদাস বাণভট্টকে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কিছু পরিমাণে নির্মম হয়েছেন। এ নির্মমতা আবেগসঞ্জাত। এ কারণে তিনিও কতকটা পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। শশাঙ্ক স্বদেশপ্রেমিক। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধ প্রাধান্য পাওয়াতে গ্রন্থের এই নিহিতার্থটি লক্ষ্যচ্যুত। বৌদ্ধভিক্ষু দেশানন্দ কিংবা বসুগুপ্ত-চরিত্র অঙ্কনে রাখালদাস মাত্রা অতিক্রম করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাখালদাসও বৌদ্ধবিহারের ধনসম্পত্তি লাভের কথাটি বলেছেন। রাখালদাস বসুমিত্রকে ভিক্ষু করার যে কারণ দেখিয়েছেন বেণের মেয়েতে মায়ার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা সম্ভাবিত ছিল। তরলা যুথিকাকে বসুমিত্রের ভিক্ষু হবার কারণ বলেছে এইভাবে,

> 'ভিক্ষু হইলে বৌদ্ধগণের বিষয়ে অধিকার থাকে না, তাহাদিগের সম্পত্তি বৌদ্ধসংঘের হস্তে পতিত হয়। এই জন্যই চারুমিত্র একমাত্র পুত্রকে বৌদ্ধসংঘের নিকট বলি দিতেছে।'

বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত এবং বজ্রাচার্য (শক্রসেন) যেভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেছে তাতে ইতিহাসের যুক্তিনির্ভর তথ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় পীড়ন করা হয়েছে বলে মনে করি।

প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের বিরোধের ইঙ্গিতটি অনৈতিহাসিক। উপন্যাসে দেখি প্রভাকরবর্ধন পাটলিপুত্রে মহাসেনগুপ্তের কাছে এলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সঙ্গে থানেশ্বরের সৈন্যের বিরোধ দেখা দেয়। মহাসেনগুপ্ত প্রভাকরবর্ধনের সঙ্গে একজন অধীন প্রজার ন্যায় ব্যবহার করেছেন। নিঃসন্দেহে প্রভাকরবর্ধন তখন একজন প্রভাবশালী নরপতি। কিন্তু কলচুরি রাজের আক্রমণের ভয়ে মহাসেনগুপ্তই প্রভাকরের রাজসভায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রভাকর পাটলিপুত্রে আসেন নি— আশ্রয় নেওয়াতে মনে হয় প্রভাকরের সঙ্গে মহাসেনগুপ্তের সম্পর্ক আত্মীয়তাসূত্রে প্রীতিরই ছিল। রাখালদাসের বর্ণনায় অনৈতিহাসিকতা সত্ত্বেও তখনকার রাজনীতির অনুসরণ করলে ঘটনাটির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি না হবারই সম্ভাবনা। বিশেষত হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরোধের দিকে লক্ষ রেখেই রাখালদাস ঘটনাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মহাসেনগুপ্তের রাজকার্য পরিচালনা সে-যুগের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। শশাঙ্কের পিঙ্গলকেশের বর্ণনা ঐতিহাসিকতার দিক থেকে

সমর্থনযোগ্য। বিশেষত উপন্যাসে এই তথ্যটি রোমান্সের দীপ্তি আনতে সমর্থ হয়েছে।

রাখালদাস ইতিহাসের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে যশোধবল-বীরেন্দ্রসিংহ-লতিকার জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন। যশোধবলের মধ্যে প্রভুভক্তির চরম রূপ লক্ষিত হয়। মহাসেনগুপ্ত এবং যশোধবলের মিলনদৃশ্যটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে উজ্জ্বল।

শশাঙ্কের বাল্যজীবনটি রাখালদাসের কল্পিত। এর পশ্চাতে কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি না থাকাতে অংশটিকে দুর্বল মনে হওয়া স্বাভাবিক। শশাঙ্কের বাল্যজীবন অনেকটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। উপন্যাসটিতে ঘটনার ভীড় অত্যন্ত বেশি। ফলে শশাঙ্কের ব্যক্তিগত দিকটি একরকম অনুদ্‌ঘাটিত। চিত্রার মৃত্যুর জন্যে শশাঙ্ক দায়ী এবং লতিকার ট্রাজেডির মূলেও তিনি। এ দুটি নারীর প্রতি শশাঙ্কের আচরণ উপন্যাসের যুক্তিসম্মত পথ ধরে চলে নি। চিত্রার বিবাহবাসরে শশাঙ্কের আচরণ অনেকটা অবিশ্বাস্য ঠেকে। তবে চিত্রার চরিত্র স্বল্পপরিসরে অঙ্কিত হলেও মোটামুটি মন্দ হয় নি। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্‌বেগ-ব্যাকুলতা লেখক ফাঁকে ফাঁকে আমাদের জানিয়েছেন। শশাঙ্কের পতনের কারণ সম্বন্ধেও লেখক দুর্বল কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। সে কৈফিয়ৎ ইতিহাসসম্মত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর জন্যে দায়ী অদৃষ্ট। শক্রসেন শশাঙ্কের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন। সমগ্র ঘটনাবলীর একটা সারসংকলন করে শক্রসেন বলেছেন, মোহবশে শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটবে ; তবে স্কন্দগুপ্ত বিদেশী-দের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হবে আর শশাঙ্ক বিদেশে স্বদেশীদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মৃত্যু বরণ করবে। উপন্যাসটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—শশাঙ্কের রাজ্যলাভ, বিজয় অভিযান এবং মৃত্যু। ইতিহাস-বিচ্যুতি থাকলেও ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় লেখক সার্থক।

আগে লেখকের বৌদ্ধমনোভাব আলোচনা করেছি। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। স্কটও 'আইভ্যানহো'তে স্যাক্সন জাতির বীরত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে নরম্যানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। Freeman স্কটের এই ইতিহাসবিচ্যুতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। রাখালদাসের চিত্রও ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নয়।[১] তবে রাখালদাসের বর্ণনায়

১ শ্রীসুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী

আতিশয্যটুকু ছেড়ে দিলে বৌদ্ধচিত্রটিকে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শশাঙ্ক সম্বন্ধে বলেছেন এর পনেরো-আনাই কল্পনা। তথাপি তিনি এই কল্পনাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি মধ্যযুগের তথ্যবিরলতার মধ্যে রাখালদাস গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভগ্নদশাকে নিজ কল্পনাবলে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে মনোহারিত্ব দিতে চেয়েছিলেন। কাহিনী বিশেষ কিছু নেই বলে এর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সমাবেশই গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চরণাদ্রি দুর্গ, প্রতিষ্ঠান দুর্গ, শতদ্রু নদীর যুদ্ধ, মেঘনার যুদ্ধ এগুলি লেখকের মৌলিক উদ্ভাবনা।

বিপণিস্বামিনী বঙ্কিমচন্দ্রের পানওয়ালীর প্রতিরূপ। শশাঙ্ক, চিত্রা, মাধবগুপ্তের নদীতীরে বালুকাখেলা মাধবীকঙ্কণের শ্রীশচন্দ্র-নরেন্দ্র-হেমলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তরলার দৌত্য ঈষৎ তরল হলেও মন্দ নয়। নৌসৈন্যের কথা সম্ভবত রাখালদাস 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' গৌড়বাণীর উল্লেখে অনুমান করিতেছেন। নবীন কৈবর্তের সৈন্যসজ্জা রামচরিতে উল্লিখিত কৈবর্তবিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয়। শক্রসেনের বৃক্ষের শাখায় শাখায় ভ্রমণ নাথযোগীদের আচরণের অনুরূপ।

ধর্মপাল

শশাঙ্কের পর ১৩২২ সালে ধর্মপাল প্রকাশিত হল। শশাঙ্ক গৌড়াধিপ হলেও তাঁর জীবনের ট্রাজেডি লেখক অঙ্কিত করেছেন। হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবে শশাঙ্ক তাঁর মূল উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারেন নি। রণক্ষেত্রে লতিকার কাছে তাঁর খেদোক্তি থেকে তা বুঝতে পারা যায়। অথচ শশাঙ্ক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন লেখকেরও। সুতরাং শশাঙ্কের পর বাংলার অদ্বিতীয় বীর ধর্মপালকে নিয়ে উপন্যাস রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'শশাঙ্ককে লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এইজন্য "শশাঙ্কের" পরে "ধর্মপাল" লিখিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য ছাড়া শশাঙ্কের অনুরূপ ইতিহাসের সত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা তো ছিলই। বাংলার

ইতিহাসের সে যুগে জাতি নবযৌবনের স্বপ্ন দেখছিল।[১] সে যুগের ইতিহাসকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করায় গ্রন্থটির মর্যাদা বেড়েছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বাংলার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'গৌড়রাজমালা'য় পাওয়া যায়। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'গৌড়লেখমালা'য়ও বাংলার ইতিহাসের এই পর্বটির বিস্তৃত বিবরণ পাচ্ছি। তবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র উপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন করেন নি। বলা বাহুল্য, রাখালদাসের নিজের গবেষণাই 'ধর্মপালে' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাহিনীটি এই।—

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনদশায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজারা একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদাই কলহদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। আত্মকলহে জর্জরিত বাংলাদেশ তখন মরুভূমির আকার ধারণ করেছিল। লুঠতরাজ, গ্রাম পোড়ানো, নরহত্যা এই-সমস্ত কাজে সামন্তনরপতিবৃন্দের উৎসাহ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণ একজন সুশাসকের অভাব বোধ করছিল। এমন সময়ে গৌড়দেশ অধিপতি গোপালদেব সামন্ত নরপতিবৃন্দের হাত থেকে গোকর্ণদুর্গ রক্ষা করলেন। গোপালদেবের অসীম বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সামন্ত নরপতিরা গোপালদেবকেই তাঁদের সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত করলেন।

গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের মায়ের নাম দেদ্দদেবী। গোকর্ণের যুদ্ধে তিনিও ছিলেন। দুর্গস্বামিনীর কন্যা কল্যাণীকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি তাকে নিয়ে বনপ্রদেশে চলে এসেছিলেন। কল্যাণী রক্ষাকর্তা ধর্মপালের প্রেমে পড়ল। ধর্মপালও কল্যাণীকে ভালোবাসলেন।

গোপালদেবের সময়ে রাজ্যে মোটামুটিভাবে শান্তি ফিরে এসেছিল। তিন বৎসর পর গোপালদেবের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষে তখন যুদ্ধ লেগেই ছিল। গুর্জররাজ এবং রাষ্ট্রকূটপতি সে সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছেন। কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ

১ শ্রীসুকুমার সেন, বিচিত্র সাহিত্য, ২য় খণ্ড, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'

Bengal, which had lost all political homogenity and had almost been eliminated as a factor in Indian politics suddenly emerged under him at the most powerful state in Northern India.— R. C. Majumdar and A. D. Pusalker : *Age of the Imperial Kanauj.*

গুর্জররাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। ইন্দ্রায়ুধ জ্যেষ্ঠ বজ্রায়ুধের পুত্র চক্রায়ুধকে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চক্রায়ুধ গৌড়দেশ এলেন। তখন গৌড়াধিপ ধর্মপাল। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দের কাছে ধর্মপাল চক্রায়ুধকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। বিশ্বানন্দের সহায়তায় ধর্মপাল বৌদ্ধ সাহায্য পেলেন। সদ্ধর্ম এবং সদ্ধর্মীদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতিও ধর্মপাল দিলেন। ধর্মপাল কল্যাণীর প্রণয়াসক্ত। কিন্তু বিবাহে বারবার বাধা পড়ছিল। পিতার মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ এই শুভবিবাহে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। এর পর ধর্মপালের যুদ্ধযাত্রা। গুর্জররাজ-বাণভট্টের সঙ্গে যুদ্ধে বাঙালি সৈন্য অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করলে। চক্রায়ুধ রাজত্ব পেল। কিন্তু যুদ্ধ থামল না। অবশেষে রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সহায়তায় বাংলা দেশ রক্ষা পেল। যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজা যখন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন গোবিন্দ রাষ্ট্রকূটপতির কন্যাকে গ্রহণ করার দাবি জানালেন। এ দাবি উপেক্ষিত হল। আবার যুদ্ধ বাধল। বাংলার সৈন্য শেষ সংগ্রাম করলে। গোবিন্দ বাঙালি সৈন্যের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে। কিন্তু কল্যাণী তখন মৃত্যুপথযাত্রী। দেশের মঙ্গলের জন্যে কল্যাণীর জীবন উৎসর্গিত হল। কল্যাণীর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূটবংশের কন্যা রন্নাদেবীর সঙ্গে ধর্মপালের বিবাহ হল। ধর্মপালদেবের রাজত্বের বিস্তৃত ঘটনা বাহুল্যভয়েই সম্ভবত রাখালদাস বর্ণনা করেন নি।

এবারে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি বিচার করি।

খালিমপুরের তাম্রশাসন থেকে গোপালদেবের রাজপদে বৃত হবার ঘটনাটি গৃহীত।[১] তাম্রশাসনটি এইরকম—

> প্রজাবৃন্দ সেই বপ্যটের পুত্র নৃপতিশিরচুড়ামণি শ্রীগোপালকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন দেশে মৎস্যন্যায় দুরীভূত করবার জন্য। দিগন্তে বিস্তৃত যাঁর সনাতনযশোরাশি জ্যোৎস্নাধবলিত পূর্ণিমা রজনীর দ্বারা কথঞ্চিত অনুকৃত হতে পারে।

মাৎস্যন্যায় বলতে সাধারণভাবে অরাজকতা বুঝি। প্রবলের উপর দুর্বলের অত্যাচার, রাজ্যে দণ্ডশক্তির অভাব মাৎস্যন্যায়ের পরিচয়। এর সঙ্গে তিব্বতীলামা তারনাথের বিবরণ মিলিয়ে নিলে বোঝা যায় গোপালদেবের পূর্ববর্তী গৌড় দেশের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। অশান্তি-অরাজকতায় দেশ ছিন্নভিন্ন। রাজসভায় চক্রান্ত— অন্তঃপুরেও ব্যভিচার ষড়যন্ত্র। তার উপর পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণ। এ অবস্থা থেকে মুক্তিকামনায় প্রজারা

১ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা

গোপালদেবকে সিংহাসনে নির্বাচিত করলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মপালে দেশের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি প্রজাদের দ্বারাই গোপালদেব নির্বাচিত হন এই মতটি মেনে নেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামন্তদের দ্বারা গোপালদেব নির্বাচিত হন। এ জন্যেই গোকর্ণদুর্গের কাহিনীটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সম্ভবত এইটি নূতন তথ্য বলে উপন্যাসে এ কাহিনীটি অনেক অংশ অধিকার করেছে। গোপালদেব সম্বন্ধে আর বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। একান্ত কল্পনার উপর নির্ভর করেন নি বলে গোপালদেবের কাহিনীকে রাখালদাস বিস্তৃত করেন নি। দেবদেবীর উল্লেখও ইতিহাসে আছে।

ধর্মপালের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য রয়েছে। ধর্মপালকে লেখক এইভাবে দেখেছেন, খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তরাপথের প্রধান নায়ক।[১] গোপাল-দেবের [২] সময়েই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হল। এই কারণে ধর্মপাল রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দিতে পারলেন। চক্রায়ুধ যে ইন্দ্রায়ুধের পুত্র নয়, নগেন্দ্রনাথ বসুর এই মতকে রাখালদাস নানা তথ্যপ্রমাণ সহযোগে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। রাখালদাস বলেছেন, খালিমপুরের তাম্রশাসনের সাক্ষেই বোঝা যায় চক্রায়ুধ ধর্মপাল কর্তৃক রাজত্ব পান।

> তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ মৎস্য মদ্র কুরু যদু, যবন অবন্তি গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ—চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্তে পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকমল উদ্‌ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।[৩]

এই লিপিই রাখালদাসকে বজ্রায়ুধ এবং চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ প্রসঙ্গ অবতারণায়

১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২ গোপালদেব সম্বন্ধে আধুনিক মত—It reflects no small credit upon the political sagacity and the spirit of sacrifice of the leading men of Bengal that they rose to the occasion and selected one among themselves to be the sole ruler of Bengal to whom they all paid willing allegiance. It is not every age, it is not every nation, that can show such a noble example of subordinating private interests to the public welfare...The result was almost equally glorious and the great bloodless revolution ushered in an era of glory and prosperity such as Bengal has never enjoyed before or since.— R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, *Age of the Imperial Kanauj*.

৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা

সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দের সঙ্গে ধর্মপালের বিরোধের কারণটি কি জানা যায় না। এই কারণটি অজ্ঞাত বলে রাখালদাস রণ্ণা দেবীর প্রসঙ্গটিকে কৌশলে স্থাপন করেছেন। কেউ কেউ অনুমান করেন ধর্মপাল বৃদ্ধ বয়সে রণ্ণা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সে যাই হোক রাখালদাসের এ কল্পনা উপন্যাসের দিক থেকে সার্থক, আমাদের বাস্তববোধ জাগাতে সাহায্য করে। ইতিহাসে এ রকম ঘটনার অভাব নেই। সুতরাং ঐতিহাসিক পরিবেশের দিক থেকে ঘটনাটির প্রয়োজনীয়তা অ নস্বীকার্য। ঘটনার সম্ভাব্যতার দিক দিয়েও রাখালদাসের এ কল্পনা উচ্চপ্র শংসার যোগ্য। বাণভট্ট-কাহিনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'বাঙ্গালার ই তিহাস' প্রথম খণ্ডে। কল্পনার আশ্রয় দেখতে পাওয়া যায় সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ ইত্যাদির চরিত্র পরিকল্পনাতে। গুর্জররাজের সঙ্গে আর্যসংঘের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না সে সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধভদ্র গোপনে গুর্জররাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাংলায় গুর্জররা জের আধিপত্য বিস্তৃত হোক এইটি চেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের এই অধঃপতনের চিত্র লেখকের ইতিহাসের সম্বন্ধে বিশেষ ধারণাসঞ্জাত। বজ্রযানী, হীনযানী, মহাযানী বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন কলহে মুখর। 'কৃষ্ণসর্প' নারায়ণ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত বজ্রযানী বৌদ্ধ বলে। মহাযানী সম্প্রদায় ধর্মপালের সহায়তায় আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসারে উন্মুখ, আবার বুদ্ধভদ্র ইত্যাদি বৌ দ্ধরা সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের আশায় গুর্জররাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধভ দ্রের ব্যর্থতার কাহিনী ধর্মপালে বিস্তৃত।

তবে ধর্মপালের কাহিনীর প্রধান অংশ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয় হলেও ধর্মপাল-কল্যাণী প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয় নি। ধর্মপালের কল্যাণীর প্রতি আসক্তির চিত্রটি বাস্তবসম্মত উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশস্তিলিপির সাহায্যে ধর্মপালের চিত্রটি রাখালদাস রূপায়িত করেছেন। লেখক ধর্মপালের প্রকৃত গৌরব এবং মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কল্যাণীর আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায় দীপ্যমান। রণ্ণা দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গে রাজ্যে যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল তখন সাধারণ নরনারীর কল্যাণীর প্রতি ঈর্ষা কয়েকটি দৃশ্যে সুন্দর ফুটেছে।

ধর্মপালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। মাৎস্যন্যায়ের ফলে অরাজকতার দৃশ্যটি আনন্দমঠের মন্বন্তরের চিত্রটি অনুকরণে রচিত। বিশ্বানন্দ, অমৃতানন্দ আনন্দমঠের চরিত্রগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষত ধর্মপালের উত্থানের

মূলে বিশ্বানন্দের প্রভাব অনেকটা দায়ী। জনবল, অর্থবল দিয়ে এবং বিপদের ক্ষেত্রে নিজে অগ্রসর হয়ে বিশ্বানন্দ ধর্মপালকে সাহায্য করেছে। এ কাহিনী কল্পিত হলেও ঐতিহাসিক পরিবেশে বেমানান হয় নি।

ভীষ্মের চরিত্র আদর্শবাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত। দেশের জন্যে তাঁর আত্ম-ত্যাগ গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে। ধর্মপালের ভীষ্ম পৌরাণিক ভীষ্মের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ধর্মপালে যে স্বদেশপ্রেরণা আছে সেটি করুণাতে আরও পরিস্ফুট। কেউ কেউ করুণার প্রভাব ধর্মপালে দেখতে পান। কিন্তু এইটি অসংগত। কেননা ধর্মপাল ১৩২২ সালে ছাপা হয় আর করুণা উপাসনা পত্রিকায় ১৩২৪ সাল পর্যন্ত বেরিয়েছিল। বরং ধর্মপালের অনেক চরিত্র যেমন কল্যাণী, পুরুষোত্তম ভীষ্মদেব, করুণায় অরুণা, ঋষভদেব এবং অগ্নিগুপ্তের উপর প্রভাব ফেলেছে।

ধর্মপালের আরম্ভটি দুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়। দুর্গস্বামিনীর কন্যার প্রতি প্রেম ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি সহজ ও বহুলব্যবহৃত উপাদান।

করুণা

করুণা ধারাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে ১৩২৪ সালে এটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন 'ইহা "শশাঙ্কের" ন্যায় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকামাত্র, ভরসা করি কেহ ইহাকে ইতিহাস মনে করিবেন না।' গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের আগ্রহ ছিল প্রচুর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথমভাগে তিনি গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক তথ্যও দিয়েছেন। তা ছাড়া নূতন নূতন শিলালিপি এবং মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক বিচারের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছিল। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক থাকাকালীন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন বক্তৃতাকারে। পরে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে সেইগুলি একত্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। এর থেকেই বোঝা যায় গুপ্ত যুগ সম্বন্ধে লেখকের তীব্র আগ্রহ ছিল এবং তাকে উপন্যাসাকারে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে তিনি গুপ্ত যুগকেও অন্তর্ভুক্ত

করেছেন। কেন? এর কারণ বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি প্রকরণ, তার মধ্যে একটি উত্তরাপথের ইতিহাস। বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক থেকে যে সত্যটি তিনি উপলব্ধি করলেন, উপন্যাসেও তাকে যথাযথ রাখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতের ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলির বর্ণনা করাও লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক।

তা ছাড়া বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের যোগাযোগের অন্যতর কারণ উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড় বঙ্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।১

সুতরাং ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করতে হলে বাঙ্গালার ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। স্কন্দগুপ্ত-শশাঙ্ক-ধর্মপাল এই ইতিহাসের ক্রমপরিণত রূপ।

আবার হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের রূপটিকেও ভুললে চলবে না। কেননা লেখক এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। সে আলোচনা যথাস্থানে করব। এই বিরোধের রূপটি গুপ্ত যুগ থেকে আরম্ভ এ রকম একটা ধারণা লেখকের ছিল।

কিন্তু করুণাতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে লেখকের স্বদেশ-প্রেরণা। স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে লেখকের ধারণা ছিল অনুকূল। তিনি একস্থানে বলেছেন,

He was the last great hero of Magadha who realised that it was his duty to defend the gates of India with the last drop of his blood. He spent his whole life in the performance of this noble task and at the end of it sacrificed himself cheerfully in the performance of this sacred duty.২

দেশের জন্য এ রকম আত্মোৎসর্গ লেখককে মুগ্ধ করেছিল। রাখালদাসের এই বিস্ময়বিমুগ্ধ চেতনা থেকে করুণার সৃষ্টি।

১ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, 'ভূমিকা'
২ R. D. Banerji, *Age of the Imperial Guptas*.

কাহিনীও শশাঙ্কের মতো শিথিল নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক রোমান্স বলতে যা বুঝি সেই-রকম প্লট করুণায় আছে।

'করুণা'র নায়ক স্কন্দগুপ্ত প্রথমকুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম-কুমারগুপ্তের রাজত্বে বিলাসব্যসনের প্রাচুর্য ছিল। রাজশক্তির এক প্রধান অংশ এই বিলাসকলাকুতূহলে নিবিষ্ট। এমন-কি রাজা কুমারগুপ্ত পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে গণিকা ইন্দ্রলেখার কন্যা অনন্তাদেবীর আসক্ত। বৃদ্ধ মহানায়ক দামোদরগুপ্ত রাজাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। তিনি জালন্ধর থেকে কুমারগুপ্তের ভ্রাতা গোবিন্দগুপ্তকে ডেকে আনলেন রাজ্যের সর্বনাশ থেকে রক্ষা করবার জন্য। রাজা যখন বিবাহে উদ্যত তখন তাঁর চেষ্টায় তা রোধ হল। কিন্তু এই বিবাহের পশ্চাতে ছিল এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত রাজা হলে বৌদ্ধধর্মের উন্নতির আশা নেই—এই কারণে বৌদ্ধধর্মী হরিবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে রাজার সঙ্গে অনন্তাদেবীর বিবাহ দেবার বন্দোবস্ত করলে।

ওদিকে উত্তরাপথে বার বার দুর্ধর্ষ হূন জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল। এই আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করবার দায়িত্ব মগধের। সুতরাং রাজধানীর গোলযোগ থামিয়ে স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র ইত্যাদি সকলে হূন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হল। বাহ্লীকতীরে, বক্ষুতীরে গুপ্ত সেনানী সমাবেশ হল। হূন আক্রমণ সময়ে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে অগ্নিগুপ্ত দেহত্যাগ করলেন। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত অন্যান্য সেনার সাহায্যে অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করলেন। জয়ের আনন্দে সকলে আত্মহারা। সকলে জয়লাভ করে দেশে ফিরে এল। মগধ উৎসবে ব্যসনে মেতে উঠল। পট্টমহাদেবী পুত্রের বিজয়বার্তায় আনন্দিত। তাঁর পালিতা কন্যা করুণা এবং অরুণা। করুণা গৌড়দেশীয় সেনাপতি যুবরাজের সখা ভানুমিত্রের পত্নী। অরুণা স্কন্দগুপ্তের বাগদত্তা। আবার হূন অক্রমণ শুরু হল। অরুণাকে বিবাহ না করেই স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন।

হরিবল-ইন্দ্রলেখার চক্রান্তে পুনরায় অনন্তাদেবী মহারাজের সামনে এল। মহারাজের চিত্ত টলমল। পট্টমহাদেবী সব শুনলেন। তিনি আত্মহত্যা করে আত্মাবমাননা থেকে মুক্তি পেলেন। ইন্দ্রলেখার সাহায্যে যখন এই বিবাহ সংঘটিত হল তখন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইন্দ্রলেখার উপপতি চন্দ্রসেন অরুণার উপর অত্যাচার করতে চাইলে। ক্ষোভে-রোষে অরুণা

কোনো রকমে আত্মরক্ষা করে পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করলেন। এক সন্ন্যাসী অরুণাকে পলায়নে সাহায্য করলেন।

হূনযুদ্ধে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, ভানুমিত্র অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমন সময়ে পাটলিপুত্রের সংবাদ নিয়ে সন্দেশবহ গোবিন্দগুপ্তের কাছে সব বললে। গোবিন্দগুপ্ত দ্রুত পাটলিপুত্র অভিমুখে রওনা হলেন। অগ্নি আগেই জ্বলেছে, এবার তার অঙ্গারের চিহ্ন লক্ষিত হবে। মহাপ্রতীহার কৃষ্ণগুপ্ত বাহ্লীকতীরে যুবরাজকে সব জানালেন। তিনি বললেন, 'ভীষণ অত্যাচারে গুপ্তকুললক্ষ্মী বিচলিতা। গুপ্তকুলরবি, তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে আর্যাবর্তে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই।'

রাজ্যে অশান্তি বিশৃঙ্খলা। সব অনন্তাদেবীর আজ্ঞাধীন। রাজা মোহবশে অনন্তাদেবীর অনুরোধে বৃদ্ধ মন্ত্রী দামোদর শর্মাকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন। চন্দ্রসেন স্কন্দগুপ্তকে বন্দী করবার আদেশ নিয়ে বাহ্লীকে এল। হূনযুদ্ধে সেনাপতি চন্দ্রসেন। যুবরাজ বন্দী হলেন। পুরুষপুরে হূনেরা আক্রমণ করে করুণাকে হরণ করলে। করুণা তার পর থেকে হূনদের কাছে দেবী রূপে পরিচিতা। স্কন্দগুপ্ত ও ভানুমিত্র করুণার সন্ধানে এসে বিফল হলেন। ভানুমিত্র করুণার শোকে প্রায় উন্মত্ত। শতদ্রুতীরের যুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত পুনরায় বিজয়ী হলেন। বক্ষুতীরের যুদ্ধের পর অনন্তাদেবী যুবরাজকে ডেকে পাঠালেন। কেননা গোবিন্দগুপ্তের চেষ্টায় অনন্তাদেবী এখনও আপন ক্ষমতার যথেচ্ছব্যবহার করতে পারেন নি। স্কন্দগুপ্তের জয়লাভে অনন্তাদেবী এবং বৌদ্ধরা আশঙ্কিত হল।

যুবরাজ পাটলিপুত্রে এলে মগধবাসী তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু মাতার মৃত্যুতে রাজ্যের অশান্তিতে যুবরাজের শান্তি ছিল না। এর পর যুবরাজ অরুণার সঙ্গে দেখা করলেন। অরুণা তখন আশ্রমবালিকা। যুবরাজকে দেখে তার পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। অরুণা এবং যুবরাজের বিবাহ হল। পাটলিপুত্রের অবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গণিকা ইন্দ্রলেখার সখী মদনিকার ব্যবহারে। গৌল্মিক সেনাপতি দেবধর মদনিকা-কর্তৃক অপমানিত। হর্ষগুপ্ত মদনিকাকে প্রহার করলেন। মদনিকার প্ররোচনায় দেবধরের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হল। দেবধর এবং তার নবপরিণীতা স্ত্রী উভয়েই আত্মহত্যা করে রাজ্যের অনাচারের দিকটি প্রকাশ করে দিলে। কুমারগুপ্ত লজ্জায় পালিয়ে গেলেন। এর পরও কুমারগুপ্তের চেতনা ফিরে আসে নি।

স্কন্দগুপ্ত একের পর এক যুদ্ধ করে গেলেন। অবশেষে সকলকেই হারালেন। গল্পের ফলশ্রুতি বন্ধুবর্মা এবং মুরারিগুপ্তের কথোপকথন থেকেই বোঝা যায়—

> 'স্কন্দ গিয়াছে, মহারাজপুত্র গিয়াছেন, বৈষ্ণব অভিজাতসম্প্রদায় গিয়াছে, আর্যসংঘর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে সদ্ধর্মি, উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক, দেশ, ধর্ম, পূর্বস্মৃতি বিসর্জন দিয়া, মগধ সাম্রাজ্য অতল জলধিজলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পরিবর্তে আর্যসংঘ সদ্ধর্মের উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিল, সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।'

ইতিহাসের উপাদান বিচারে লেখকের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করি। 'স্কন্দগুপ্ত, গোবিন্দগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, বন্ধুবর্মা, চক্রপালিত, হর্ষগুপ্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্কন্দগুপ্তের হূনযুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু অধিক কথাই কাল্পনিক।' তথ্য পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনার উৎস নির্ণয় করছি। এখানেও রাখালদাসের বাংলা এবং ইংরেজি বই দুখানিই আমাদের অবলম্বন।

রাখালদাস বলেছেন তিনি *Fleet's Corpusus Inscriptionum Indicarum* থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, সে-যুগের কবির প্রশস্তিলিপিও লেখকের সহায়ক হয়েছিল। পরবর্তী আবিষ্কারের ফলে 'তোরমানকে এখন আর স্কন্দগুপ্তের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না এবং ইহা স্থির যে স্কন্দগুপ্ত জীবিত থাকিতে হূনগণ গুপ্ত সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই। স্কন্দগুপ্তের দুই পুরুষ পরে তোরমান মালব অধিকার করিয়াছিল।'

পুরগুপ্তের লিপিতে স্কন্দগুপ্তের নাম পাওয়া যায় না। এর কারণ কি? এখানে অনুমান ভিন্ন উপায় নেই। সম্ভবত পুরগুপ্তের সঙ্গে স্কন্দগুপ্তের বনিবনা ছিল না। এবং রাজ্যে অধিকার নিয়ে এঁদের মধ্যে গোলযোগ ঘটবারও সম্ভাবনা। পুরগুপ্ত তা হলে কি স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয়? এর থেকে এ অনুমান স্বাভাবিক যে কুমারগুপ্তের প্রথম মহিষী অনন্তাদেবীর পুত্র। অনন্তাদেবীর পরিচয়ও ঐতিহাসিক। ইতিহাস থেকে এই সূত্রটিকে নিয়ে লেখক স্কন্দগুপ্ত এবং পুরগুপ্তের কাহিনী রচনা করেছেন। জ্যেষ্ঠকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা একটু অস্বাভাবিক ঘটনা। হয়তো এর মধ্যে কুমারগুপ্তের পত্নী অনন্তাদেবীর প্ররোচনা ছিল। যদি এই প্ররোচনা থেকে থাকে তবে অনন্তাদেবীর উদ্দেশ্যকে সৎ বলা যায় না। অথচ অনন্তাদেবীর নামে সে রকম কোনো কলঙ্ক ইতিহাসে নেই। সুতরাং লেখক ভিলেন ইন্দ্রলেখাকে সৃষ্টি করেছেন। অত্যাচার-অনাচারের দায়িত্ব ইন্দ্রলেখার

উপরেই এসে পড়ে। আবার কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালে এটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি শেষজীবনে বিলাসী হয়ে পড়েন। তাঁর সময় থেকেই বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু। কুমারগুপ্তের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ কি তা জানা না থাকলেও লেখক-প্রদর্শিত পথকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। সুতরাং রাখালদাসের কল্পনা উপন্যাসের বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছে বলে মনে করি।

ইতিহাসে স্কন্দগুপ্তের কোনো পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে-সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মধ্যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার পত্নীর লেখা দেখতে পেয়েছেন। মনে করি সেই কল্পনাবলে লেখক অরুণার চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। স্কন্দগুপ্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির উৎসস্থল ভিটরী গ্রামের শিলালেখের অনুকরণে লিখিত। অন্তর্বেদীর যুদ্ধও ঐতিহাসিক। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয়ই তিনি তাঁর বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালায় তথ্যপ্রমাণযোগে ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয়— আজ পর্যন্ত স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয় নি। দেবধর এবং অমিয়ার কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা কিছু নেই। তবে লেখকের পরিবেশ রচনা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। রোহিতাশ্ব দুর্গ ঐতিহাসিক। এই দুর্গের অধিপতিরা যে গুপ্তসাম্রাজ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গোবিন্দগুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন তিনি মালব দেশের অধিপতি ছিলেন। ভানুমিত্র-করুণা কাহিনী লেখকের কল্পনাপ্রসূত। মগধের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগসাধনের জন্য লেখকের এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। গল্পের শেষে লেখক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা উত্থাপন করেছেন। থানেশ্বররাজ এবং যশোধর্মের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্যে লেখক এই কথা বলেছেন। এই রাজাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম আবার নবজীবন লাভ করে এ কথা সকলেই বলেছেন।

কাহিনীটিকে লেখক কতগুলি ভাগে সাজিয়েছেন— বোধিসত্ত্বায়, অগ্নি, অঙ্গার, ভস্ম। প্রথম ভাগকে 'বোধিসত্ত্বায়' বলায় লেখকের মূল অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণায় আসা যায়। সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে কুমারগুপ্তের দুর্বলতা এবং হিন্দুসৈনিকের বীরত্বের কথা বলা সত্ত্বেও লেখক মূল কথা একে বলেন নি। গল্পের ফলশ্রুতি থেকে বোঝা যায় গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য

দায়ী বৌদ্ধ প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই হিন্দুরাজত্বে অগ্নি জ্বলে উঠল। তারই অঙ্গার এবং ভস্মের চিহ্ন স্কন্দগুপ্তের পরিসমাপ্তিতে। দেখা যাবে ইন্দ্রলেখা এবং হরিবলের ষড়যন্ত্রের একটি অধ্যায়ের শিরোনামাতে আছে 'অগ্নিতে ইন্ধন', আর-একটিতে আছে 'অগ্নি জ্বলিল'। এর পর এই অনুমান স্বাভাবিক যে বৌদ্ধরাই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ। বাহ্লীকবীর ব্রাহ্মণের কাছে হরিবল স্পষ্টত স্বীকার করেছে যে হুন আক্রমণ আসলে রাজ্যের পক্ষে অভিশাপ নয়— আশীর্বাদ। পুরগুপ্তর হুনদের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষার পশ্চাতেও বৌদ্ধদের আশঙ্কা জয়যুক্ত হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের মৌলিক দিকটি উপন্যাসেও বিস্তৃত হয়েছে। হরিবলের উক্তি থেকে জানতে পারি বৌদ্ধদের আসল শত্রু, গুপ্তরাজকুল। হুন যেমন শত্রু গোবিন্দ, দামোদর স্কন্দ আর বৈষ্ণব-অভিজাত সম্প্রদায় তেমনি শত্রু। 'শত্রুবিনাশে শত্রুক্ষয় হউক, সাম্রাজ্য রসাতলে যাউক, মগধের আধিপত্য থাকিলেই আমাদের যথেষ্ট।'

কিন্তু করুণায় এই দিকটি প্রকাশিত হলেও শশাঙ্কের মতো এ বস্তু আত্যন্তিক হয়ে ওঠে নি। পূর্বে বলেছি প্রবল স্বদেশপ্রেরণা থেকেই এই কাহিনী রাখালদাস লিখেছিলেন। কতগুলি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করি।

অগ্নিগুপ্তের আত্মত্যাগ মহৎ সম্ভাবনায় দীপ্যমান—'দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, দেবতার জন্য, রমণী ও ব্রাহ্মণের জন্য কয়জন মরিতে পারে? যে পারে সে মানুষ নহে, দেবতা।' এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অগ্নিগুপ্ত হুনযুদ্ধে নিহত হন। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্ত্বেও—

> 'যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হইয়া মরিব, মাতৃভূমি রক্ষা করিয়া মরিব' এইটি ছিল তার মূলমন্ত্র।'

গ্রহাচার্যের আকাঙ্ক্ষা আসলে রাখালদাসের নিজেরও আকাঙ্ক্ষা—

> অগ্নিগুপ্ত, আবার আসিও—দেবতা ও ব্রাহ্মণ, রমণী ও শিশু রক্ষা করিতে আবার আসিও।'

অগ্নিগুপ্ত আসলে গুপ্তকুলরবি স্কন্দগুপ্তেরই অংশ। স্কন্দগুপ্তর জীবনেও অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা দেখি। মাতৃভূমি রক্ষার উদগ্র বাসনা স্কন্দগুপ্তকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছে। শিলালেখের সাক্ষ্যে রাখালদাসও স্কন্দগুপ্তকে নারায়ণ বাসুদেব রূপেই চিত্রিত করেছেন। দুষ্কৃতকারীর দমন এবং সাধু-

ব্যক্তির পরিত্রাণ এইটি তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বামাকণ্ঠের ধ্বনিতে স্কন্দগুপ্তের আসল পরিচয় পাই—

> 'কে সে মাগধগণ, সে গুপ্তকুলপুত্র, আর্যাবর্তের পরিত্রাতা, রমণী ও শিশুর রক্ষাকর্তা, বক্ষুবাহ্লীক ও শতক্রর যুদ্ধজেতা। বন্ধুগণ, সে মাগধ, সে পাটলিপুত্রিক, সে আমাদিগের পরমাত্মীয়, তাহার নাম স্কন্দগুপ্ত।'

লেখক স্কন্দগুপ্তের জবানিতে সমসাময়িক জনচিত্তকে প্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক বিভেদও লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। অগ্নিগুপ্তের জবানিতে অন্তর্বিরোধ রাজ্যনাশ এই সত্যটি ব্যক্ত—

> 'কিন্তু যেদিন গৃহবিবাদ সূচিত হইবে সেইদিন চন্দ্রগুপ্ত বিন্দুসার ও অশোকের সাম্রাজ্য শতধাবিভক্ত হইয়া যাইবে। পুষ্যমিত্র ধূলিমুষ্টির জন্য স্বর্ণমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা বিস্মৃত হইও না।'

স্কন্দগুপ্তের ট্রাজেডি পাঠকের সমবেদনা আকর্ষণ করে। রাষ্ট্রনীতির কুটিলচক্রে নিবেদিত হয়েছে স্কন্দগুপ্তের পত্নী অরুণাদেবীর দেহ। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ চরিত্রটিকে অলোকসামান্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে। দেবধর-অমিয়া কাহিনী শিথিলবদ্ধ। কিন্তু 'স্বামীধর্মে'র রূপটি পরিস্ফুট করার জন্য এর সার্থকতা।

গ্রন্থটির নাম করুণা। এবং করুণা চরিত্র অঙ্কনে লেখকের দুর্বলতা সর্বাধিক। করুণার উন্মত্ত অবস্থা এবং হূনদের মাতারূপে গৃহীত হবার কাহিনী প্রহেলিকার স্তরে উপনীত। ঋষবদেব সংস্কৃত বিদূষক চরিত্রের উন্নত সংস্করণ। শৌণ্ডিকালয়ের চিত্রও মৃচ্ছকটিকের আদর্শে চিত্রিত। ইন্দ্রলেখা ভিলেন জাতীয় চরিত্র। হরিবলকে রাখালদাস বলেছেন বৌদ্ধাধম। তাঁর ধারণা অনুযায়ীই এই চরিত্র অঙ্কিত।

ময়ূখ

মুসলমান বিজয়ের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনা করার পর রাখালদাসের দৃষ্টি পড়ল মোগল রাজত্বের প্রতি। মোগল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করলেও রাখালদাস রমেশচন্দ্রের মতো রাজপুত ঘটনা অবলম্বন করেন নি। ময়ূখের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজত্বকাল। প্রধানত পর্তুগীজ অত্যাচারের কাহিনীটি বিস্তৃত করবার আকাঙ্ক্ষাই রাখালদাসের ছিল। ভূমিকাতে লেখক বলেছেন, পর্তুগীজ মিশনারিরা চট্টগ্রাম এবং হুগলি অঞ্চলে খ্রীস্টানি ধর্মান্তরকরণের জন্য নিরীহ

জনসাধারণের উপর অত্যাচার করেছে। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার ইচ্ছায় শাহজাহান ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। ফলে হুগলি মোগলদের শাসনে আসে। তারিখ-ই-শাহজাহান লেখকের অবলম্বন ছিল। G. Keene এবং James Burgess-এর লেখাও গ্রন্থকারের সহায়তায় এসেছিল। লেখক ভূমিকাতে গ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচার করেছেন।

ময়ূখের কাহিনীটি এই: পর্তুগীজ অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত। বাংলাদেশের জমিদারপুত্র ময়ূখ পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার প্রণয়ী ললিতা। পর্তুগীজরা ললিতাকে হরণ করে নিলে। ময়ূখ যথাসাধ্য বাধা দিয়ে আহত হল। এমন সময়ে ময়ূখ সপ্তগ্রামবাসী বণিক গোকুলবিহারী সেনের আশ্রয় পেলে। বণিক এবং ময়ূখ পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে। উভয়েই দেশের এই অত্যাচার নিবারণের জন্য সম্রাটের সাহায্যের কথা ভাবলে। গোকুলবিহারী সেনের চেষ্টায় ময়ূখ সপ্তগ্রামে এল। এখানে বাদশাহের পালিতা কন্যা গুলরুখ ময়ূখের অনুপম দেহকান্তি দেখে তাকে ভালোবাসলে এবং ময়ূখকে লাভ করবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করতে লাগল। সপ্তগ্রামেও পর্তুগীজেরা অত্যাচার নিপীড়ন করছিল। ময়ূখ নিজেও বাধা দেবার চেষ্টা করে আহত হল। ইতিপূর্বেই ময়ূখের পরিচয় সপ্তগ্রামের মোগল শাসনকর্তা আসদ খাঁ জানতে পেরেছিলেন। সপ্তগ্রামের যুদ্ধে গুলরুখও বন্দী হল। ছাড়া পেয়ে ময়ূখকে আহত অবস্থায় দেখে তাকে বজরায় নিয়ে এল। ময়ূখের তখন স্মৃতিভ্রংশ। গুলরুখকে ললিতা মনে করলে। তারা পর্তুগীজ অত্যাচারে উন্মত্ত হয়ে হুগলির কাছে বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। ময়ূখ সেখানে এলে উভয়ের পূর্বের কথা মনে পড়ল। গুলরুখ আশ্রমে এল। বিনোদিনী বৈষ্ণবী ময়ূখ ললিতা গুলরুখ দিল্লীতে উপনীত। গুলরুখ ময়ূখকে বাদশাহের অন্তঃপুরে আনবার ব্যবস্থা করলে। ময়ূখ বাদশাহের কাছে প্রশংসা পেলে এবং মনসবদার নিযুক্ত হল। যেদিন সে মনসবদার নিযুক্ত হল সেদিনই গুলরুখের প্রেরিত লোকজন ময়ূখকে হতচেতন করে মোগল-অন্তঃপুরে নিয়ে এল। ললিতার সঙ্গে ময়ূখের বিবাহের সব ঠিকঠাক ছিল। গুলরুখ ময়ূখের কাছে প্রেমভিক্ষা করলে। তা উপেক্ষিত হল। সুতরাং প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নির্দিষ্ট হল। ময়ূখকে যখন ফাঁসিমঞ্চে চড়ানো হল তখন নাটকীয় ভাবে মমতাজের আবির্ভাবে ময়ূখ রক্ষা পেল। শাহজাহান সমস্ত শুনতে

পেলেন। গুলরুখ আপন কৃতকর্মের কথা নিবেদন করলে। এর পর ময়ূখ হুগলি-অধিকারকালে মোগলসেনার সাহায্য করলে। বিজয়ী ময়ূখ ললিতাকে বিবাহ করে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হল মমতাজের সমাধির পাশে। মমতাজের স্মৃতি সকলের মধ্যে প্রেমের উদার ভাবনা এনে দিলে।

ময়ূখ-ললিতা-গুলরুখের কাহিনী রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নরেন্দ্রের মতো ময়ূখও ভাগ্যবিড়ম্বিত, পিতার অধিকারবঞ্চিত। হেমলতার জন্য এবং পিতার রাজ্য উদ্ধার করার আশায় নরেন্দ্র মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। জেলেখার আবির্ভাব নরেন্দ্রের জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনা। জেলেখা প্রেমবঞ্চিত, নরেন্দ্র হেমলতাতে সমর্পিতচিত্ত। ময়ূখও পর্তুগীজ-মোগল দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়েছে, গুলরুখের প্রেমকে সেও প্রত্যাখ্যান করেছে। জেলেখা মৃত্যুবরণ করে প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর, গুলরুখ চোখ অন্ধ করে রূপতৃষ্ণা জয় করেছে। উভয়ের প্রেমেই মহত্ত্বের দিক আছে। সাদৃশ্য আরও আছে। হেমলতা থেকে নরেন্দ্রের মন ফিরানোর জন্য জেলেখা নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে নি এবং সম্রাট শাহজাহানের কাছে কৃতকর্মের জন্য সে অনুশোচনাও জানিয়েছে। মিল যেমন আছে অমিলকেও তেমনি উপেক্ষা করা যায় না। নরেন্দ্রের পরিণতি ময়ূখের মতো মিলনে নয়। জেলেখা তাতারী, গুলরুখ বাদশাহপালিতা। আরও এক কথা, বৃদ্ধের প্রশ্নে ময়ূখ সম্বন্ধে গুলরুখই বলেছিল 'আমার খসম'। উক্তিটি নিঃসন্দেহে কপালকুণ্ডলার মতিবিবির উক্তির প্রতিধ্বনি।

লেখক পর্তুগীজ হার্মাদের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাসের মূল উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাই ছিল। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ বস্তু এমন কিছু নূতন নয়। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে' পর্তুগীজ-মগ দস্যুদের নৃশংসতার কথা বলেছেন। গঞ্জালিসের উল্লেখ প্রতাপচন্দ্রও করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের নরহরি সরকারের কথা জানতেন কি না জানি না, তবে চৈতন্যদাসের নির্যাতনের কাহিনী উক্ত ঘটনারই উপন্যাসরূপ। শিষ্যকে গচ্ছিত রেখে নরহরি পর্তুগীজদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। শিষ্য লোচনদাসের প্রশংসা করে মধ্যযুগে কবি লিখেছিলেন 'গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ'।[১] রাখালদাসও

১ শ্রীসুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী

চৈতন্যদাসের উপর পর্তুগীজ পাদ্রীর অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার জীবন্ত চিত্র দিয়েছেন। পর্তুগীজেরা পরবর্তী ইংরেজ পাদ্রীদের মতো শিক্ষা-উপদেশের বিশেষ ধার ধারত না।

তথাপি রাখালদাসের বর্ণনায় আতিশয্য লক্ষণীয়। যে সময়ে ময়ূখ বেরোয় তার অনেক আগেই পর্তুগীজদের বিবরণ বেরিয়েছিল। কিন্তু বাঙালির স্মৃতিতে মধ্যযুগের কবিবর্ণিত পর্তুগীজ-দস্যুতার বিবরণগুলিই দৃঢ়মূল হয়েছিল। রাখালদাসও এই স্মৃতির উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। ফলে কিছুটা তথ্য কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে রাখালদাস পর্তুগীজ-নৃশংসতার দিকটিকেই স্পষ্ট করেছেন। ম্যানরিকের উক্তি যে মিথ্যা সেইটি প্রমাণ করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পর্তুগীজ ধর্মান্তরকরণের পাশাপাশি চৈতন্যদাসের কৃষ্ণভক্তির জয়ঘোষণা কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈতন্যদাসের চিত্রে আদর্শবাদ থাকলেও তা বিশেষ বেমানান হয় নি। চৈতন্যদাসের ভূমিকা স্পষ্ট এবং সাহিত্যগুণোপেত।

বাঙালিবীর ময়ূখের প্রথম যুদ্ধটি রোমান্সলক্ষণাক্রান্ত। রোমান্সের আতিশয্য লক্ষিত হয় সন্ন্যাসী চরিত্র অঙ্কনে। ধর্মপালে বিশ্বানন্দ-অমৃতানন্দের চরিত্রেও এই রোমান্সপ্রবণতা জয়ী হয়েছে। ময়ূখের ভাগ্যবিচার, জাহাঙ্গীর-নগরে তাঁর আবির্ভাব, সম্রাট শাহজাহানের সন্ন্যাসীর কাছে নতিস্বীকার কিছুটা আকস্মিক। চণ্ডীচরণ সেনের রামেশ্বরের আচরণ এবং সন্ন্যাসীর ব্যবহার প্রায় অনুরূপ। সম্রাটমহিষী মমতাজের আকস্মিক আবির্ভাবও অনুরূপ রোমান্স-প্রভাবিত।

কিন্তু ময়ূখের ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেশে বিধি-বিধানের প্রতি সমাজনায়কদের আত্যন্তিক আস্থা দেখি। সেইটি পরিস্ফুট হয়েছে ললিতা-অপহরণের পর পল্লীসমাজের বিচারের দৃশ্যটিতে।

It is a significant fact that despite their many-sided activities, the Portuguese survive in popular imagination as pirates and plunderer only and the best-known passage referring to them in the period perpetuates the memory of their ruthless ravages along the coast.—T. K. Roy Choudhury, *Bengal under Akbar and Jahangir*

মোগল রাজদরবারের বর্ণনায় লেখক বঙ্কিমের প্রভাবমুক্ত। দেওয়ান-ই-খাস গোসলখানা ইত্যাদি বর্ণনায় রাখালদাস কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

পরিবেশ রচনার দিক থেকে এর মূল্য অপরিসীম। মোগল-অন্তঃপুরের বর্ণনায় লেখক রমেশচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন। জাহানারার স্বেচ্ছাচারিতা মাধবীকঙ্কণের জাহানারার কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাতার রমণী এবং কালুমকের বিনোদিনী বৈষ্ণবীর গৃহে হানা দেওয়ার দৃশ্যটি। এ বর্ণনায় ঈষৎ স্থূলতা আছে সত্য, কিন্তু এ স্থূলতা বাস্তবসম্মত। তাতার রমণী সরাব পান করে, উপপতি গ্রহণে সে নির্বিচার, মোগল হারেমের নানা গুপ্ত প্রয়োজনে সে প্রধান সহায়িকা। কিন্তু কালুমকের প্রশ্নে সে যখন বলে, 'মোগল বাদশাহের অন্দরমহলের চাকরী, আর বাঙ্গালা মুলুকের জবান, আর মরুভূমি এই তিনই সমান।' তখন এই রমণীর জীবনকাহিনীর চকিত আভাস পাঠককে সহজে আকর্ষণ করে। রমেশচন্দ্রের মোগলদাসী তাতারি জেলেখার বর্ণনা আবেগের পথ অনুসরণ করেছে— রাখালদাস লঘু চালে একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে শাহজাহানের পরিচয় বিশেষ নেই। ময়ূখে 'আশিক ও মাসুকে'র চিত্র কেবল ময়ূখ-গুলরুখের বর্ণনাতেই নয় শাহজাহান মমতাজের চিত্র-রচনাতেও দীপ্যমান। এজন্য বোধ হয় রাখালদাস সকলের মিলনস্থলটি নির্বাচন করেছেন মমতাজের সমাধির পার্শ্বে। ললিতা, গুলরুখ, ময়ূখ, শাহজাহান, চৈতন্যদাস উদার মানবপ্রেমে এসে মিলিত হয়েছে মমতাজের সমাধিপাশে। গুলরুখের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যখন নির্বাপিত, তখন ময়ূখ গুলরুখের বেদনায় দীর্ণচিত্ত, ললিতাও গুলরুখের নৈকট্য অনুভব করে, চৈতন্যদাসের মানবতা উচ্চ আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়।

অসীম

রাখালদাসের পুস্তকাকারে শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অসীম' দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল। পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল ১৩৩১ সালে। বইটি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অসীমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত।

ময়ূখের পটভূমিকা শাহজাহানের রাজত্বকাল। অসীম রচিত হয়েছে সম্রাট ফররুখসিয়রের রাজত্বের পটভূমিকায়। ভূমিকায় লেখক বলেছেন,

'অসীম' সত্যসত্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'এক অসীম ও মণিয়া ব্যতীত অধিকাংশ পুরুষ ও নারী চরিত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।' শশাঙ্কের 'ভূমিকা' থেকে বুঝতে পারি মোগলশাসনের সময় বাঙালিজাতির অধঃপতন ঘটেছিল। রাখালদাসের এ মত কতটা সমীচীন সে বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু রাখালদাস সম্ভবত এই কারণেই বাঙালিবীর-চরিত্র অবলম্বন করে জাতির অধঃপতনের সময়েও দু-একটি উজ্জ্বল চিত্র রচনা করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন।

অসীম দীর্ঘ রচনা। অবান্তর বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস হিসেবে বইটির আদর হয় নি। ভারতবর্ষ-সম্পাদক বইটির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।[1] কাহিনিটি এই—

আওরঙজেবের মৃত্যুর পর মোগল রাজ্য পতনোন্মুখ। রাজধানীর বিশৃঙ্খলা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সুবাদাররা সম্রাটের পরিবর্তনে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন। বাদশাহ আলমের পর আজীম-উশ্-শানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে কলহ হতে পারে। আজীম-উশ্-শানের পুত্র ফররুখসিয়র বাংলার কানুনগো হরনারায়ণের ভ্রাতা অসীম এবং ভূপেন্দ্রের পরিচিত। অসীমের গৃহে শান্তি ছিল না বলে ফররুখসিয়রের সঙ্গে দিল্লির পথে পাটনা চলে আসে। পাটনায় অসীম মণিয়া বাঈয়ের সাক্ষাৎ পেলে। মণিয়া বাঈ অসীমের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। অসীম মণিয়ার প্রতি স্নেহ অনুভব করে কিন্তু প্রেমের প্রশ্নে বিচলিত হয়। ওদিকে অসীমের সংবাদ জানবার জন্যে হরনারায়ণ পাটনাতে নবীন পরামাণিক এবং সরস্বতী বৈষ্ণবীকে পাঠান। অসীমের নামে গ্রামে কুৎসা রটনা হল গ্রামের হরনারায়ণ বিদ্যাসাগরের কন্যা দুর্গাকে কেন্দ্র করে। হরনারায়ণও সমাজচ্যুত হয়ে পাটনায় চলে এলেন সপরিবারে। পাটনাতে অসীম-দুর্গা-মণিয়া কাহিনীর বর্ণনাই গ্রন্থের মূল বিষয়। মণিয়া অসীমকে লাভ করবার কোনো আশা নেই দেখে হরনারায়ণের উপদেশমত বৈষ্ণব আচারে দীক্ষিত হল। ঘটনাক্রমে অসীম শৈলকে বিবাহ করলে। ফররুখসিয়র সম্রাট হয়ে অসীমকে হাজারমনসবদার করে বাংলার রুকনপুরের শাসনভার দিলেন।

এর পর দশবছর অতিক্রান্ত। দিল্লিতে সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র লেগেই

১ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৬৪

ছিল। ফররুখসিয়রের তখন চরম দুর্দশা। অসীম ও ভূপেন্দ্র রাজার এই দুর্দশার সময়ে দিল্লী এল। সম্রাট পরাজিত এবং বন্দী। ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। ফররুখসিয়রেরও মৃত্যু হল। অসীম মণিয়ার সঙ্গে চলল বৈষ্ণবের আরাধ্যদেবতা গোপালের সন্ধানে।

পুত্র অসীমের মৃত্যুশয্যায় রাখালদাস এই বই আরম্ভ করেছিলেন। শেষজীবনে রাখালদাস নিজেও দুঃখযন্ত্রণা পেয়েছিলেন। ধনীর সন্তান রাখালদাস দারিদ্র্যের পেষণে বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হন।[১] ব্যক্তিগত ব্যর্থতা তাঁর মধ্যে এনে দিয়েছিল হতাশা। এজন্য অসীম গ্রন্থে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বাণীই বারবার শুনি। ফররুখসিয়র সম্রাটপুত্র, কিন্তু তিনি সুজার কথা স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়েন— আশার পথ দেখতে পান না। মণিয়া পাটনার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, বাঈজী-জীবনে তার অর্থসচ্ছলতা অতি সহজেই ঘটতে পারত, কিন্তু অসীমের আশায় সে তার রূপকে ধিক্কার দিয়েছে, দুঃখকে চিরসঙ্গী করেছে। অন্ধ ভূপেন্দ্র ফররুখসিয়রের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে, দুর্গার জীবনেও বৃন্দাবন আশ্রয় হয়েছে, সর্বোপরি গ্রন্থের নায়ক অসীম রায় মনসবদার হয়েও জীবনে একটা ব্যর্থতার সুরই অনুভব করেছে। এ-সব দেখে মনে হয় রাখালদাস তাঁর ব্যক্তিগত ব্যর্থতার দিকটিই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবনার জন্য উপন্যাসটিতে রচনাগত শিথিলতা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকট। ইতিহাস এ কাহিনীর একটি বৃত্তরেখা মাত্র। কেন্দ্রস্থ চরিত্রগুলির মধ্যে ইতিহাসের আবর্ত লক্ষ করা যায় না। পাটনার ঘটনার অতি-বিস্তৃতি গ্রন্থটির অন্যতম ত্রুটি। এ বর্ণনায় যতটুকু সত্য আছে তা যে-কোনো সামাজিক উপন্যাসে স্থান পেলে আপত্তি উঠবার কারণ থাকত না। লেখক সামাজিক উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। এ উপন্যাসে সামাজিক উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভেদরেখাটি অবলুপ্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাস ময়ূখেও সামাজিক বিশ্লেষণ আছে কিন্তু সেইটি সেখানে বেমানান হয় নি। গ্রন্থটিতে ত্রিবিক্রমের আচরণে বাস্তবতার লেশমাত্র নেই। অসীমের বিবাহও কতকটা আকস্মিক।

আরও এক কথা, দুর্গা-অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে হরনারায়ণের সতর্কতা এবং

১ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১ম ভাগ) 'ভূমিকা'

জালবিস্তার অতিকথনদোষে দুষ্ট। বিষয়টি ক্ষুদ্র, এর জন্য এতটা স্থান নেবার প্রয়োজন ছিল না।

অসীমে বৈষ্ণবতার সুর লক্ষণীয়। এই বৈষ্ণবতার সুর ধ্বনিত হয়েছে হরিদাস বাবাজী, মণিয়া দুর্গা এবং অসীমের মধ্যে। এর পূর্বাভাস কিন্তু ধর্মপালের বালক চরিত্রে, ময়ূখে চৈতন্যদাসের ভূমিকায়। এই-সব উপন্যাসে যা ছিল বীজাকারে অসীমে তাই পত্রপল্লবে বিস্তৃত।

লুৎফ উল্লা

রাখালদাসের লুৎফ উল্লা মাসিক বসুমতীতে ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৬ সাল পর্যন্ত বার হয়েছিল। উপন্যাসটি বৃহৎ নয়। বসুমতীর সব সংখ্যায় লুৎফ উল্লার কাহিনী প্রকাশিত হয় নি। পূর্ববর্তী উপন্যাস অসীমে ফররুখসিয়রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। এ উপন্যাসেও মোগল শাসনের শেষ দৃশ্যকে পটভূমিকা করা হয়েছে। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে মহম্মদ শাহের রাজত্ব-কালকে কেন্দ্র করে।

লুৎফ উল্লার কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। সমগ্র দৃশ্যগুলি নাদির শাহের অত্যাচারের ঘটনা, মহম্মদ শাহের কাপুরুষতা, মন্ত্রী ফৌজদারের বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রজাসাধারণের অকথ্য জ্বালাযন্ত্রণাভোগের বর্ণনা। এরই মধ্যে লেখক বাংলার আমীর আনন্দরাম, সুজাউদ্দীনের পুত্র আক্রমজমান খাঁ, নূরবাঈ এবং জগবাঈর কথা বলেছেন। আনন্দরাম ফকির শাহ্ লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে কি করে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের পূর্বে এবং আক্রমণের সময়ে প্রজাসাধারণের জন্যে অকাতরে সাহায্য করেছেন তার কথা বলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। বাংলাদেশ থেকে আনন্দরাম দিল্লীতে এলে তিনি পদ্মিনী এবং লক্ষ্মীর বাড়িতে স্থান পান। এদের দয়া এবং অতিথিসেবায় আনন্দরাম মুগ্ধ হন। এই সময়ে দিল্লীর অবস্থা শোচনীয়।

> 'তখনও নূরবাঈ অতি সুন্দর নাচিতেছিল, কোকীজিউ গোপনে বাদশাহকে প্রেমের গান শিখাইতেছিল, সুতরাং গোলন্দাজরা কামান ছোড়া ভুলিয়া গিয়াছিল, বারুদ তৈয়ারী করা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল, আওরঙ্গজেব আলমগীরের প্রেমের দায়ে হিন্দুরা অনেকদিন পূর্বে মোগলের রাজধানী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আফগানিস্থান জয় করিতে নাদিরের বিশেষ বিলম্ব হইল না।'[১]

১ মাসিক বসুমতী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

আনন্দরাম বীর, পরোপকারেও তিনি উদারচিত্ত। এই কারণে লুৎফ উল্লাকে তিনি গৃহে আটক করে নিজে লুৎফ উল্লার ছদ্মবেশে রাজ্যে নাদির শাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন। আনন্দরাম রাজ্যের আমীর ওমরাহ, বাঈজী সকলের পরিচিত। সকলে তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ। মহম্মদ শাহ পরাজিত হয়ে নাদির শাহকে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। নূরবাঈ মুক্তি চাইলে। সে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ নর্তকী। নাদির শাহ তাকে পারস্যে নিয়ে যাবেন বলে স্থির করলেন। নূরবাঈ আনন্দরামের সাহায্য প্রার্থনা করলে। আনন্দরাম নূরবাঈকে রক্ষা করলেন। কিন্তু নূরবাঈয়ের অদর্শনে রাজ্যে নাদির শাহ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। তখন নূরবাঈ আপন সুখ বিসর্জন দিয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্যে দিল্লীতে ফিরে এল। আনন্দরাম বন্দী হলেন। তাঁর বীরত্বের পরীক্ষা হল। দেখা গেল তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে এমন শক্তি নাদিরেরও নেই। এর পর নাদির দিল্লীর ধনদৌলত ও অসংখ্য বন্দী দাসদাসী নিয়ে পারস্য যাত্রা করবার মনস্থ করলেন। নূরবাঈ, আনন্দরাম কৌশলে অনেক প্রজাকে মথুরা অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। পরে আনন্দরাম আক্রমজমান খাঁ নূরবাঈ এবং পদ্মিনী নাদিরের বন্দীরূপে পারস্য অভিমুখে চলল। পথে এরাই অন্য বন্দীদের মুক্ত করে দিতে লাগল। নাদির এই ব্যাপার দেখে বিচারের জন্যে সকলকে আহ্বান করলেন। বিচারকালে প্রত্যেকেই নিজের উপর সমস্ত দোষ আরোপ করে শাস্তি প্রার্থনা করলে। নাদির এদের মহত্ত্ব দেখে মুগ্ধ হলেন।

> তখন শাহান শাহ নাদির শাহ নামিয়া আসিয়া নূরবাঈর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "তওয়াইফ, এমন কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠে আমার হুকুমে তলোয়ার পড়তে পারে না। দেশে ফিরে যাও। সকলে মুক্ত।[১] অসম্ভাবিত করুণায় সকল বন্দী কৃতজ্ঞতাপূত হৃদয়ে বিজেতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কেবল পারিল না আনন্দরাম, সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

রাখালদাস নাদির শাহের আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাস্তবসম্মত এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। চিন কিলিচ খাঁ, সাদাৎআলির দ্বন্দ্ব, আমীর ওমরাহের কূটনীতি তখন দিল্লীতে লেগেই ছিল। বাদশাহরা আসলে মন্ত্রী আমীরের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিলেন। নাদিরশাহের অত্যাচারের বর্ণনা সর্বজনবিদিত। জাট অধিবাসীদের কথাও ঐতিহাসিক।

১ মাসিক বসুমতী, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ

লুৎফ উল্লা নিঃশেষিত প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। যে উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে রাখালদাস হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন সে প্রেরণার একান্ত অভাব এ গ্রন্থে দেখা যায়। অসীম থেকেই এই দুর্বলতার সূত্রপাত। অসীমেরই কয়েকটি চরিত্র এ গ্রন্থে নূতন ভাবে দেখা দিয়েছে। মণিয়া বাঈ নূরবাঈয়ের পূর্বসূরী, আনন্দরাম অসীমের নবসংস্করণ।

এনায়েৎউল্লার পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতা, মহম্মদ শাহের নূরবাঈয়ের প্রতি আসক্তি এবং পরিশেষে জীবনে ব্যর্থতা 'অসীম' উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহম্মদ শাহের করুণ দিকটি রাখালদাসের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তুলনীয়।

উপন্যাস হিসেবে লুৎফ উল্লা সার্থক নয়। কোনো চরিত্রের বিশেষত্ব নেই, বিকাশ নেই, কাহিনীও বিশেষ কিছু নেই। সকল চরিত্রই একঘেয়ে, গতানুগতিক। তবে নূরবাঈয়ের উদারতা মর্মস্পর্শী। দেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় পাই নূরবাঈয়ের একটি উক্তিতে। নাদির শাহ পারস্যের ঐশ্বর্য বর্ণনা করে নূরবাঈকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করলে নূরবাঈ বলেছিল—

> 'বুলন্দপনা, যা চোখে দেখি নি, তা বলতে পারি না, কিন্তু আমার হিন্দুস্থানের সব মিঠা, —জল মিঠা, হাওয়া মিঠা, ফুল মিঠা, ফল মিঠা, হয়ত এর চাইতেও মিঠা দেশ আছে জাঁহাপনা। কিন্তু সে মিঠা আমি চাহি না। আমি যে দেশে জন্মেছি, সেই দেশই আমার মিঠা, আমার কাছে এমন মিঠা আর কিছুই লাগবে না।'১

জন্মভূমি যে সকল দেশের চাইতে সেরা এ সত্য বাঈজী হয়েও নূরবাঈ বুঝতে পেরেছিল।

পদ্মিনীর প্রেমের বিশেষত্ব কিছু নেই। ফকির শাহ লুৎফ উল্লার নচ্ছেদার রাবড়ীর প্রতি আসক্তি এবং লোভের বর্ণনায় রাখালদাসের রচনারীতির লঘুতা পীড়াদায়ক এবং বিষয়টির বিস্তৃতিও অনাবশ্যক ছিল। উপন্যাসটির লুৎফ উল্লা নামও সার্থক নয়।

ধ্রুবা

এই উপন্যাসটি প্রবাসীতে ১৩৩৮ সালের কার্তিক মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বার হয়। রাখালদাস লুৎক উল্লার মতো এটিকেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখতে পান নি। প্রবাসী সম্পাদক জানিয়েছেন,

১ মাসিক বসুমতী, ১৩৩৪ চৈত্র

'পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ১৩৩৫ সালে আমাদিগকে দিয়াছিলেন। তাহারও প্রায় ৬ মাস পূর্বে তিনি ইহা নাটকের আকারে আমাদিগকে প্রথম দিয়াছিলেন। তাহারও কিছুকাল পূর্বে তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই কাহিনীর প্রত্যেকটি কথা ঐতিহাসিক না হইলেও ইহার মুখ্য আখ্যানবস্তু ঐতিহাসিক এবং ইহার সমাজচিত্রও ইতিহাসসম্মত, এ কথা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। এই চিত্রের মধ্যে হিন্দুরাজশক্তির পতনের অন্যতম কারণ লক্ষিত হইবে।'

বলা বাহুল্য, এই উপন্যাসটি লুৎফ উন্নার আগের লেখা। গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা করে যে-সকল তথ্য রাখালদাস পেয়েছিলেন তাই উপন্যাসাকারে ধ্রুবাতে পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসটিতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ভগ্নদশার সমাজচিত্র পাচ্ছি। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্তের ভীরুতা, কাপুরুষতা রাজশক্তিকে কতখানি দুর্বল করে দিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ধ্রুবাতে রয়েছে। অপর দিকে সমুদ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রগুপ্ত এবং মাতা দত্তাদেবীর মহনীয় চরিত্রের ইতিহাস অঙ্কন করে চন্দ্রগুপ্তের মহানুভবতার দিকটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক। শকরাজা বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সমরকুশলতার দিকটি পরিস্ফুট। ধ্রুবা বা ধ্রুবস্বামিনীর পরিচয় ইতিহাস থেকে নেওয়া। রাখালদাস তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে *Age of the Imperial Guptas* ধ্রুবস্বামিনীর ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, ধ্রুবা ছিলেন রামগুপ্তের পত্নী। রামগুপ্তের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত তাকে বিবাহ করেন। এইটি বিধবাবিবাহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধ্রুবাকে বাসুদেবের নিকট প্রেরণ ব্যাপারটি ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু উপন্যাসে লেখক বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেন নি। রামগুপ্ত বিবাহ করতে চাইলেও ধ্রুবা চন্দ্রগুপ্তের বাগদত্তা বলে বিবাহে সম্মত হয় নি। অসহ্য নিপীড়ন সত্ত্বেও ধ্রুবা সংকল্পে অটল ছিল। রাখালদাস ধ্রুবা চরিত্রকে ইতিহাস থেকে নিয়েছেন বটে কিন্তু এই চরিত্র অঙ্কনে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিতেও কার্পণ্য করেন নি। ধ্রুবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের জয় সূচিত হয়েছে।

যে যুগে রাখালদাস এই গ্রন্থ লেখেন সে যুগে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বড়ো বেশি ছিল। কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও আদর্শকে রক্ষা করা জাতির অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য ছিল। তার পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। 'পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ, কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভারতবর্ষের প্রতি নগর তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চাহিয়া আছে।' এইটি গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত কি? নাটকাকারে রচিত হয়েছিল বলে উপন্যাসটিতে কয়েকটি নাটকীয় আবেগময় মুহূর্তের সুন্দর উপস্থাপন দেখি।

পরিশিষ্ট

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকগণের (বর্ণানুক্রমিক) এবং গ্রন্থের একটি তালিকা দিলাম। এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কতগুলি আসলে জীবনীপর্যায়ের গ্রন্থ। আবার কতগুলি গল্পমাত্র। প্রথমে গ্রন্থকার পরে গ্রন্থনাম ও বন্ধনীতে প্রকাশকাল দেওয়া হল।

অজ্ঞাত, অপূর্ব কারাবাস (১৮৭১) বিভাবতী (১৮৭১) কমলাবতী (১৮৭২) সরোজিনী (১৮৭২) বিজয় সিংহ (১৮৭৪) অপূর্ব সহবাস (১৮৭৪) বনবালা (১৮৮২)। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পলাশী সূচনা (১৯১০)। অনুরূপা দেবী, রামগড় (?) ত্রিবেণী (?)। অবিনাশচন্দ্র দত্ত, বিজলী (১৯০৩)। অমলানন্দ বসু, রামেশ্বর দুর্গ (১৯১২)। অম্বিকাচরণ গুপ্ত, কপট সন্ন্যাসী (১৮৭৪), পুরাণ কাগজ (১৮৯৯), কমলে কন্টক (?)। আনন্দচন্দ্র মিত্র, রাজকুমারী (১৮৭৯)। আবু মহম্মদ ইসমাইল হাসান, ঈশা খাঁ ও রায় চৌধুরানী (১৯১৬)। 'আশালতা' প্রণেতা, ভ্রমর (১৩১৬ দ্বি, স)। আশুতোষ বিশ্বাস, বীরজয় উপাখ্যান (১৮৬৯)। উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ভারতীয় উপন্যাস (১৮৮০)। উমেশচন্দ্র বিশ্বাস, সমর বাসনা (১৮৭৭)। উপেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতাপসংহার (১৮৭৯)। একজন পরিব্রাজক, শৈলবালা (১২৮৮)। করুণাকান্ত ভট্টাচার্য, শেঠ দুহিতা (১২৯০)। কালিদাস মুখোপাধ্যায়, যদু রায় (১৮৯৯)। কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, রশিনারা (১৮৬৯)। কালীপ্রসন্ন দত্ত, বিজয় (১২৯১)। কালীবর ভট্টাচার্য, অকাল কুসুম (১৮৬৯)। কিশোরীমোহন রায়, হামির (১২৯৮)। কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, একাকিনী (১৮৮০)। কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সিন্ধুগৌরব (১৯০৯)। কুসুমকুমারী দেবী, লুৎফউন্নেসা (১৯২৪)। কৃষ্ণানন্দ শর্মা হীরাবাঈ(১৯০৫)। কেদারনাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকেতু (১২৮৫)। কেদারনাথ দত্ত, প্রিয়ংবদা (১৮৫৫)। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন (১৮৮০)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, নারায়ণী (১৯১৯)। ক্ষেত্রগোপাল রায়, ইন্দ্রকুমারী (১৮৯১)। গজপতি রায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৭৩) চন্দ্ররোহিণী (?)। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, চিত্ত বিনোদিনী (১৮৭৫)। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়াবিনী (১৮৭৭), বীরবরণ (১৮৮৪)। চণ্ডীচরণ সেন, মহারাজ নন্দকুমার (১৮৮৫) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৮৮৬) অযোধ্যার বেগম (১৮৮৬) ঝান্‌সীর রানী (১৮৮৮) এই কি রামের অযোধ্যা (১৮৯৫)। চারুচন্দ্র দত্ত,

কৃষ্ণরাও (?)। জয় কুমার বর্ধন রায়, অদৃষ্ট চক্র (১৩২০)। তারকনাথ বিশ্বাস, কমলা (১২৯০) সুহাসিনী (১৮৮২)। তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী (১৯০৮)। দামোদর মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময়ী (১৮৭৪) তিলোত্তমা (?) প্রতাপ সিংহ (১৮৮৪)। দীনেন্দ্রকুমার রায়, উজীরনন্দিনী (১৯১২) নানা সাহেব (১৯২৭) হামিদা (১৮৯৯)। দুর্গাদাস লাহিড়ী, রানী ভবানী (১৩১৬) রাজা রামকৃষ্ণ (১৩১৭) লক্ষ্মণ সেন (১৩২০)। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, আকবর (১৮৯৮) কুমুদানন্দ (১৯০৭)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অমর সিংহ (১২৯৬) জয়ন্তী (১৩৩০)। ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোহিনূর (১৯০৭)। নবকুমার দত্ত, অমরাবতী (১৯০৮)। নবীনচন্দ্র সেন, ভানুমতী (১৩০৭)। নিখিলনাথ রায়, পৃথ্বীরাজ (১৯২৮)। পদ্মাবতী দেবী, রাজপুত বীরাঙ্গনা (১৩৩৫ তৃ, স)। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গাধিপ পরাজয় ১ম ও ২য় (১৮৬৯, ১৮৮৪)। প্রবোধচন্দ্র সরকার, শালফুল (১৮৯৭)। প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর মেয়ে (১৯২২) বাঙ্গালী বীর (১৩৩০) দেবতার দান (১৯২৩) দোকানদার (১৯২১) বাঙ্গালীর মা (১৯৩২ দ্বি স)। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মণিভদ্র (১৩২১)। প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, নীলাম্বর (১৯২৫)। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, তান্তিয়া ভিল (১৮৮৯)। ফকিরচন্দ্র বসু, উজীর পুত্র (১৮৭২) শিবাজীর অভিনয় (১৮৭০)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) মৃণালিনী (১৮৬৯) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) আনন্দমঠ (১২৭৯) রাজসিংহ (১২৮৮) দেবী চৌধুরানী (১২৯০) সীতারাম (১২৯৩)। 'বনপ্রসূন' রচয়িত্রী, সফল স্বপ্ন (?)। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, বঙ্গ বীরাঙ্গনা রায় বাঘিনী (১৯১৯)। বিনোদবিহারী শীল, বেগম মহল (১৯১০) জুঁই মহল (১৯১৯)। বিপিনমোহন সেন, চাঁদরানী (১৮৮৪)। ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, বাসন্তী (১৯০৪)। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তুমি কি আমার (১৮৭৮)। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭)। ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক (১৯১৫)। মদনমোহন মিত্র, সমর শায়িনী (১৮৭৩)। মধুসূদন পাল, সংসার লীলা (১৮৯৮)। মণীন্দ্রনাথ বসু, সফিয়া বেগম (১৯০৯)। মনোমোহন বসু, দুলীন (১৮৮৩)। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশমান তারা (?)। যদুনাথ ভট্টাচার্য, রাজা শচীপতি রায় (১৯১৭) বক্তিয়ার খিলিজি বা বঙ্গবিজয় (?) রাজা দেবল রায় (১৯১৩) রাজা শত্রুজিৎ সিংহ (১৯১২)। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপসকুমার (১৯০৫) বন্ধনমুক্তি (১৯১২) অনুরাগ (১৯১৪)। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শোভাসিংহ (১৩১৫)। যোগেন্দ্রচন্দ্র দে ও

নিত্যানন্দ রায়, নগনন্দিনী (১৮৮০)। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দরাফ খাঁ (১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮২) রাজর্ষি (১২৯২)। রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯)। রসিকচন্দ্র বসু, কালাপাহাড় (১৯১০)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক (১৯১৪) ধর্মপাল (১৩২৩) করুণা (১৩২২) ময়ূখ (১৩২৩) অসীম (১৩৩১) লুৎফ উল্লা (১৩৩৪) ধ্রুবা (১৩৩৮)। রাজকৃষ্ণ আঢ্য, কামরূপ কামলতা (১৮৭১)। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বীরবালা (১৮৭০)। রামগতি ন্যায়রত্ন, ইলছোবা (১৮৯২)। লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ, সংসার দর্পণ (১৮৭৬)। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, শকদুহিতা (১৮৯৯)। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর বল (১৩১৮) রাজা গণেশ (১৯১৪) রানী ব্রজসুন্দরী (?) বীরপূজা (১৩১২)। শফী অন-দীন-আহমদ, কনোজকুমারী (১৯১৭)। শরৎকুমার রায়, মোহনলাল (১৯০৬)। শরৎচন্দ্র ধর, রানী জয়মতী (১৯১১)। শশিচন্দ্র দত্ত, উপন্যাসমালা (১৮৪৫)। শশিভূষণ বিশ্বাস, সোনাবিবি (১৯১২)। শ্যামলাল গোস্বামী, নূরজাহান (১৯১৫)। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রানী লক্ষ্মীবাঈ (১৯২২) রামপাল (১৯১৪) বঙ্গেশ্বর (১৯০৪ তৃ, স)। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শক্তি-কানন (১৮০৯ শকাব্দ) ফুলজানি (১৮৯৪) বিশ্বনাথ (১৮৯৬) রাইবনী দুর্গ (১৩১৩-১৩১৪ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জাল প্রতাপচাঁদ (১২৮৯)। সত্যচরণ চক্রবর্তী, রানী দুর্গাবতী (১৩২৭) সংযুক্তা (১৯৩১)। সত্যরঞ্জন রায়, বেণী রায় (১৯১৬) রাজা দেবীদাস (১৯১২)। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঙ্কানিশান (১৩৩০ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)। সীতানাথ চক্রবর্তী, সরোজসুন্দরী (১৯১২)। সুরঙ্গিনী (শ্রীমতী), তারাচরিত (১৮৭৫)। সুরেন্দ্রনাথ রায়, পদ্মিনী (১৯১৫) বঙ্গবিজয় বা ভীষকদুহিতা (১৯২০)। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, লাল পল্টন (১৯১৪ দ্বি, স) বৈরাগীর হাট (১৯১৯)· ভবানীর মঠ (?) সোনর কণ্ঠী (১৯০৪) স্বপ্ন সুন্দরী (১৯০৮) যোগরাণী (১৯০৫)। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, লজ্জাদেবী (১৯৩০)। সূর্যকুমার সোম, মধুমালতী (১৯১৬)। স্বর্ণকুমারী দেবী, দীপ নির্বাণ (১৮৭৬) মিবাররাজ (১৮৮৭)) হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮) বিদ্রোহ (১৮৯০) ফুলের মালা (১৮৯৫)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কাঞ্চনমালা (১৯১৬ দ্বি, স) বেণের মেয়ে (১৯১৯)। হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা (১৩০৪) রানী ভবানী (১৩১০) প্রতিভাসুন্দরী (১৯০৪) মন্ত্রের সাধন (১৩০৫) জ্যোতির্ময়ী (?)। হারাণচন্দ্র রাহা, রণচণ্ডী (১৮৭৬)। হরিনারায়ণ

আগ্নে, সিংহগড় (১৯২১)। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়াবতীর উপাখ্যান (১৮৬৩) কমলাদেবী (১৮৮৫)। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রঙ্গমহল (১৯০১) শীশ্‌মহল (১৯১২) নূরমহল (১৯১৩) রঙ্গমহল রহস্য (১৯১৪) সুখের বাসর (১৯১৪) রূপের মূল্য (গল্পগুচ্ছ ১৯১৪) কঙ্কণচোর (১৯১৬) লাল চিঠি (১৯১৭) মতিমহল (১৯১৭) মরণের পরে (১৯১৭) শাহজাদা খসরু (১৯১৮) নীলাবেগম (১৯১৯) পান্নার প্রতিশোধ (১৯১৯) দেওয়ানা (১৯২০) গুলকাশেম (১৯২০)।

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৮, ৯২, ৯৯, ১০০, ৩২১, ৩২৩, ৩৩৯, ৩৫৫, ৩৫৭

অঙ্গুরীয় বিনিময় ২১, ৪৯, ৫৭, ৫৮, ৭৮, ২৬৫, ২৬৬

অচ্যুতচরণ চৌধুরী ২৬৯

অনুরূপা দেবী ৩৩৬

অমর সিংহ ২৩, ২৬, ৪৭, ২৮৬-২৮৮

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ২৮৯-২৯০

অযোধ্যার বেগম ২২০-২২১

অসীম ২৬, ৩৭০-৩৭৩

আই ভ্যান হো ৭২, ৮৯, ১৬৬ ১৮৮, ২৩৬, ৩০০, ৩৫৩

আনন্দমঠ ২২, ২৮, ২৯, ৬২, ৬৪-৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭১, ১০৫-১১৪, ১১৫-১১৮, ১২০, ·১২১, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৫৭, ১৭৯, ১৮৪, ২২৩, ২২৪, ৩৫৮

আন্দ্রে মোরয়া ১৫

'আশালতা' প্রণেতা ৩৩৫

ইকনমিক হিস্টরি অফ বেঙ্গল ১১৩, ২১৬

'ইতিহাস' ৭, ১১২

ইতিহাসমালা ২, ৭

ইনডিয়ান ব্যালাডস ৪২

ইন্দিরা ১০৫, ১২৮, ১৩৪

ইন্দ্রকুমারী ২৭৯-২৮০

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯

ইলছোবা ১৬, ৩১, ৩২, ৩৪

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩, ২৬১

উজীর পুত্র ২১

উপন্যাসমালা ৪০

উমেশচন্দ্র মিত্র ২১৬

ঐতিহাসিক উপন্যাস ৪৮, ৩৩, ৩৫

'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র' ৬২ পা, টী

ওয়েষ্টল্যাণ্ড, জে ১২৪-১২৮, ১৩৩

কঙ্কণচোর ৩১২

কণ্টার, জে, এইচ ৮-১০, ১২, ৪৯, ৫০, ৫৬, ২৫৬

কপট সন্ন্যাসী ২৯০

কপালকুণ্ডলা ১৯, ৩২, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭১, ৮৩-৮৮, ৮৯

কমলাদেবী ২৫৭

কমলে কণ্টক ২৯০

করুণা ২৬, ৩০, ৩৪, ৩৫৯-৩৬৬

কাঞ্চনমালা ২৬, ২৯১-২৯৩

কার্লাইল, টমাস ৩৮, ১৪১

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী ২৬৫-২৬৬

কালীপ্রসন্ন দত্ত ২৭৬-২৭৯

কিশোরীমোহন রায় ২৮১

কেদারনাথ চক্রবর্তী ২৭১-২৭২

কেদারনাথ চৌধুরী ২৩৭-২৩৮

কেরী, উইলিয়ম ২, ৭

কৈলাসচন্দ্র সিংহ ২৪১

ক্যালকাটা রিভিউ ২১৪, ২৫১, ২৫৮, ২৫৯

ক্যাসেল্‌স্ এনসাইক্লোপিডিয়া ১৫

'ক্ষুদ্র কথা' ১১৫, ১৩৩, ১৩৬

ক্ষুধিত পাষাণ ২০
ক্ষেত্রগোপাল রায় ২৭৯-২৮০

গঙ্গারাম দত্ত ৪
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৭৫-২৭৬
গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ২৬৪-২৬৫
গোলাম হোসেন ৯৭, ৯৮, ৯৯

চণ্ডীচরণ সেন ২১, ৩৬, ৩৭, ৮২, ১১৫, ২১২ ২২৭, ২৬৫, ২৭৭, ৩৬৯
চন্দ্রকেতু ২৭১-২৭২
চন্দ্রনাথ বসু ২২, ৭২, ১১৪
চন্দ্রশেখর ৬১, ৬২, ৬৫-৭১, ৯৭-১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১২০, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ২৭৯, ২৯২
চাঁদরাণী ৩৭
চিত্তবিনোদিনী ২৬, ২৬৪-২৬৫

জয়শ্রী ২৮৮ পা, টী
জয়াবতীর উপাখ্যান ২৫৬
জার্নাল অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি ১৯২
জাল প্রতাপচাঁদ ২৭২-২৭৫
জে, এন, গুপ্ত ১৮৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭, ১৮৯, ১৯০

ঝান্সীর রানী ২৬

টড, জেমস ৮, ১২, ৩০, ৪০, ৪৭, ৪৯, ৬৮, ৭৫ ১৪২, ১৪৫, ১৬২-১৬৪, ১৬৭, ১৭৯ ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯০, ১৯১ ১৯৪, ১৯৫, ৩০২, ৩৩৫
টয়েনবি, এ, জে, ৩৫
টেলস ইন ওয়েষ্টার্ণ ইত্যাদি ৮

ট্রেভেলিয়ন, জি, এম ১৩৯

ডঙ্কানিশান ৩৪
ডফ, গ্রাণ্ট ৫৬, ১৩৬, ১৭১-১৭৪, ১৭৮

তোতাকাহিনী ২
ত্রিবেণী ৩৩৬
দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল কনৌজ ৩৫৫, ৩৫৯
(দি) এজ অফ দি ইম্পিরিয়াল গুপ্তস ৩৬১
দি ওয়ারিয়ারস রিটার্ন ১০
দি কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অফ ইংলিস লিটারেচার ২৯
দি টাইমস অফ ইয়োর ১০, ১৯, ৪০, ৪১,
দি মার্হাটা চিফ ৫০, ৫৬
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬২
দীনবন্ধু মিত্র ৮৪, ৯৬
দীপনির্বাণ ৮২, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৫
দুর্গাদাস লাহিড়ী ৩২৪-৩২
দুর্গেশনন্দিনী ১০, ১৩, ১৯, ৫০, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২-৮২, ৮৩ ৮৮. ৮৯, ১৪০, ১৫৪, ১৯২, ১৯৩, ২৬৫, ২৭২
দুলীন ২৭০-২৭১
দেওয়ানা ৩১৬-৩১৭
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ২১৮, ২২০
দেওয়ান গোবিন্দরাম ৩১৪
দেবী চৌধুরানী ৬২, ৬৪-৬৬, ৬৯, ৭১, ১১৪-১২০. ১২১, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৭, ১৩৯, ২৮৫

ধর্মপাল ৩০, ৩৪, ৩৯, ৩৫৪-৩৫৯
ধ্রুবা ২৬, ৩৭৫-৩৭৬

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৮৬-২৮৮

নবীনচন্দ্র সেন ২৭, ২৮, ১০০, ১৪১, ১৫২, ২৬৪, ২৮৩-২৮৪, ২৮৮
নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ১১২, ১১৩, ২১৬
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ৩৭১
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২০৮
নারায়ণ (পত্রিকা) ১০৯, ১২৯, ২৯২
নিখিলনাথ রায় ৩২৩
নীলমণি বসাক ২

পঞ্চানন দাস ১২০
পদ্মিনী উপাখ্যান ২৮, ২৯, ৪৪
পান্নার প্রতিশোধ ৩১৫-৩১৬
পারস্য ইতিহাস ২
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮, ১২৯, ৩০৪
পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল ২৮৯-২৯০
পুরুবিক্রম নাটক ২৭
পুষ্পাঞ্জলি ৪৮
'পূজারিণী' ২৪২
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৩, ৮৪, ১০৭, ১০৯
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১২০, ১৭০, ২২৮, ২২৯, ২৫৮-২৬০
প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত ২৭৪, ২৭৫
প্রবোধচন্দ্র সরকার ২৮৪-২৮৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩২, ২৩৭, ২৮৫
প্রমথনাথ বিশী ১৫৪
প্রমথনাথ মিত্র ১৯৬
প্রসিডিংস অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি ২২৯, ২৩১

ফুলজানি ১৭, ২৫০-২৫২, ৩১৩
ফুলমণি ও করুণা ৫৮
ফুলের মালা ২০৭-২১১

বউ ঠাকুরানীর হাট ৩৬, ২২৮-২৪০, ২৫৮, ৩২৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০, ১৩-১৫, ১৭, ২১-২৩, ২৫, ২৬, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৬, ৫০, ৫৬, ৫৮-১৫০, ১৫২-১৫৬, ১৫৭, ১৭০, ১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ২০০, ২০৫, ২১০-২১২, ২১৫, ২১৭, ২২৩, ২২৪, ২২৮, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৯, ২৬০, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩২৫, ৩৩২, ৩৫৮
বঙ্কিম-জীবনী ৮৪, ৮৯, ৯০
বঙ্কিম প্রসঙ্গ ৮৪
বঙ্গদর্শন ৫৯, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৭, ১০৪, ১০৫, ১১৪, ১১৫, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৩, ১৫৪
বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) ২৫৩, ২৫৫, ২৭২, ২৮৪, ২৯১
বঙ্গবিজেতা ১৫৪-১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৯
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৮১, ৮৮, ৯৫, ১০২, ১৪২, ১৪৯, ১৬৯,
বঙ্গাধিপ পরাজয় ১২০, ১৭০, ২১৪, ২৩১, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৭, ৩৬৮
বঙ্গাধিপ পরাজয় (২য়) ২৫৮-২৬০
বঙ্গের শেষ বীর ৩২৮
'বনপ্রসূন' রচয়িত্রী ২৮৩
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৪, ২১, ২৯, ৭১, ৮৮, ৯০, ১৬৮, ৩৫২
বাঙ্গালীর বল ৩০৬-৩০৭
বাটারফিল্ড, এইচ ১৭, ৩৫, ৬৩, ১৩৫
বার্ণিয়ের ১৩, ২৩০
বালক (পত্রিকা) ২৪৬, ২৫১, ২৫৩
বিজয় ২৬, ৩২, ২৭৬-২৭৯
বিদ্রোহ ২৩, ২৫, ৩৪, ৮২, ২০০-২০৬

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ২৮১-২৮২
বিবিধার্থ সংগ্রহ ৭৫, ৭৬, ৭৯
বিশ্বকোষ ১৭, ২১৯
বিশ্বনাথ ২৫০, ২৫২-২৫৩, ৩১৪
বিষবৃক্ষ ২৫, ৬১, ৭০, ১০৫, ১৩০, ২৯০, ২৯৩, ৩০২
বিসর্জন ২৪৫
বীরপূজা ৩০২
বীরবরণ ২৭৫-২৭৬
বেণের মেয়ে ১৬, ৯৭, ২৯৩-৩০১
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০, ৫৯, ২৯২
ব্রাইড অফ ল্যামারমুর ৮৯, ২৬৭
ব্লাকউডস ম্যাগাজিন ৪০
ভানুমতী ২৮৩-২৮৪
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩, ২১, ৩৫, ৪৮-৫৭, ৫৮, ৭৮, ১২৮, ১৩৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৮, ১৮০, ২৬০, ২৬৬
ভ্রমর ৩৩৫
মতিমহল ৩১৪
মধুসূদন দত্ত ১০, ৮৮, ১২১, ১৮৬, ২১০
মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙালি ১৬০
মনোমোহন বসু ২৭০-২৭১
ময়ূথ ২৬, ৩৬৬-৩৭০
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ ৭
মহারাজ নন্দকুমার ২১৪-২১৮
মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ৫০, ১৬৯-১৮০, ১৯০
মহারাষ্ট্র পুরাণ ৪
মাধবীকঙ্কণ ১৯, ২৩, ২৬, ১১৮, ১৬১-১৬৯, ১৭৭-১৮১, ৩৫৪, ৩৬০, ৩৬৮
মালিনী ২৪৮
মিনহাজ উদ্দীন ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৯৫
মিলিটারি হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া ৬৭
মৃণালিনী ১৩, ১৪, ৬১-৬৭, ৭০, ৭১, ৭৭, ৮৮-৯৭, ১০৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৬
মোহনলাল ২৮, ৩১৭-৩২৩
ম্যাককালাম, এম, ডব্লিউ ১৫, ৬৩, ৯৬

যদুনাথ ভট্টাচার্য ২৯, ৩১
যদুনাথ সরকার ৩, ১৩, ১৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ১১৮, ১২৩, ১২৪, ১৪২, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ২০৮, ২০৯, ২৩৪, ৩০৫
যশোহর খুলনার ইতিহাস ১২৪, ২৩৯
যামিনীমোহন ঘোষ ১১১, ১১৩, ১১৫, ১২০
যুগালাঙ্গুরীয় ৫৯
যোগরাণী ৩৩১-৩৩২
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৩৩-৩৩৫
রঙ্গমহল রহস্য ২০
রজনী ৬১
রজনীকান্ত গুপ্ত ১৬, ২২৪
রণচণ্ডী ১৬, ৩৪, ২৬৭-২৭০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪, ১৭, ১৮, ২০, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫৭, ৬০, ৮২, ১০৯, ১১৪, ১১৫, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২, ১৭৮, ১৮৯, ১৯৯, ২১০, ২২৮-২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৯, ২৭৫, ২৮৫, ২৮৬
রমেশচন্দ্র দত্ত ১০, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৬, ৫৭, ১৩৬, ১৪৩, ১৪৮, ১৫১-১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ২০০, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৬, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৫৭, ২৬৬, ৩০৫
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৯২, ৯৩, ২৯৬, ২৯৮, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৭২
রশিনারা ২৬৫-২৬৬
রাইবনী দুর্গ ৭২, ২৫৩-২৫৫

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮, ২৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৪, ৬২, ৯২, ২৯৬, ৩১২
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ৩১, ১৩৬, ১৮০-১৮৭, ২৫৭
রাজর্ষি ১৪০, ২৪০-২৪৮
রাজসিংহ ১২, ৩৯, ৬৪-৬৮, ৭০, ৭১, ১১৫, ১২০, ১২১, ১২৮, ১৩১, ১৩৩-১৫০, ১৯০, ৩১০
রাজস্থান ৮, ১০, ১১, ১২, ৩০, ৪০, ৪৭, ১৪৫, ১৯৪, ১৯৫, ২০০
রাজা গণেশ ৩০২-৩০৪
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ৬
রাজাবলি ৩
রাজা বসন্তরায় ২৩৮
রাজা রামকৃষ্ণ ৩২৫-৩২৬
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৯১
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৭
রাণী ব্রজসুন্দরী ৩০৪-৩০৫
রাণী ভবানী ৩৯, ২২০
রাণী ভবানী (হারাণচন্দ্র রক্ষিত) ৩৩১
রাণী ভবানী (দুর্গাদাস লাহিড়ী) ৩২৪
রামগড় ৩৩৬
রামগতি ন্যায়রত্ন ৩১, ৪৯, ২৬০-২৬৪
রামদাস সেন ১৮, ৯৭
রামপাল ২৭, ২৮০-২৮১
রামরাম বসু ৬, ৮, ২২৮, ২৬০

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫৪
রায়বাঘিনী ২৮১-২৮২
রেজাউল করিম ১৩
রোমান্স অফ হিস্টরী-ইণ্ডিয়া ৮, ৯, ১২, ৪৯, ৫০
রেনল্ডস ২১
র‍্যালে, ওয়াল্টার ৩০৮

লক্ষ্মণ সেন ৩২৬
লাল চিঠি ৩১৩
লুৎফউন্না ৩৭৪-৩৭৫
লোকনাথ ঘোষ ৩৩১

শক্তিকানন ১৭, ২৪৯-২৫০
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৮ ৫৯, ৮৪, ৮৯, ৯০, ১০৭ ৩০২-৩০৭
শরৎকুমার রায় ১৮, ৩১৭-৩২৩
শশাঙ্ক ৩৪, ৩৯
শশিচন্দ্র দত্ত ১০, ১৯, ৪০-৪৭, ১৫১, ১৫৩, ১৬৪, ২৮৩
শশিভূষণ বিশ্বাস ৩৩৬
শালফুল ১৬, ৩৪, ২৮৪-২৮৬
শাহজাদা খসরু ৩১৪-৩১৫
শাহ্‌ মজনু ১২০
শিবজী ১৭৬, ১৭৭
শিবনাথ শাস্ত্রী ৯৬, ১৯৯, ২২৫
শীসমহল ৩১০-৩১১
শেক্সপীয়র ১৫, ৬৩, ৮৩, ৯৬, ১৫৯, ৩২১
শোভাসিংহ ১৪, ২৫, ৩৩৩-৩৩৫
শ্রাদ্ধিকী ২১২, ২১৩, ২১৪
শ্রীকণ্ঠসিংহ ১৯৯, ২৩৮
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ২৮০-২৮১
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১৬, ১৭, ৭১, ৭২, ১৬৮, ২৪৯-২৫৫, ৩১৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭, ৮১, ৮৮, ৯৫, ১০২ ১৪২, ১৪৯, ১৬৯, ১৯৪

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৪, ২৭২-২৭৫, ২৯০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৪, ১৯০
সন্ন্যাসী অ্যাণ্ড ফকির রেডার্স অফ বেঙ্গল ১১১, ১১৩, ১১৫

সকল কথা ৪৯-৫০
সকল কথা ('বনপ্রসূন' রচয়িত্রী) ২৮৩
সাধনা ১৭, ৩১৪
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৫৯
সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ২২৪
সিয়ের উল মতক্ষরীণ ১০০, ২১৪
সীতারাম ১৪, ১৫, ২৫, ৩৯, ৬২-৭১, ৮২, ১০৫, ১১৭, ১২০-১৩৩, ১৪০, ২০৫, ২১০, ২১২
সুকুমার সেন ১৪, ২১, ২৯, ৬৭, ৭১, ৮৮, ৯০, ১৫২, ১৬০, ১৩৮, ১৬৮, ১৮৮, ২৩৬, ২৩৭, ২৮৩, ২৯১, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩৫৫, ৩৬২, ৩৬৮
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪, ২১৯, ৩৩৫
সুরেন্দ্রনাথ সেন ২৯২
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ২২, ২৯, ৩৩১-৩৩৩
সোনাবিবি ৩৩৬
সৌদামিনী দেবী ২৩০, ২৩৫
স্কট, ওয়াল্টার ১০, ২১, ২৪, ২৯-৩১, ৩৩, ৩৬, ৭২, ৮০, ৮৯, ১৩১, ১৫১, ১৫৪, ১৬৭, ১৭৫, ১৮৮, ১৮৯
ষ্টুয়ার্ট, চার্লস ১৩, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৯০, ১২২-১২৫ ১৩৩, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬২, ২০৭, ২০৮, ২৪১
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ৫৪, ৫৫
স্বপ্নসুন্দরী ৩৩২-৩৩৩
স্বর্ণকুমারী দেবী ২১, ২৩, ২৫, ৩০, ৮২, ১৮৭, ১৮৮-২১১, ৩০২, ৩১৩
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৬, ১৮, ২৬, ৫৯, ৯৭, ২৭৬, ২৯১-৩০১
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৭৭, ২৫৬-২৫৭
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ২০, ২২, ২৬, ৩১, ৮২, ১৮৯, ৩০৮-৩১৭
হাণ্টার, ডব্লিউ ১১০, ১১৩, ১১৬, ২৫২, ২৮০
হামির ২৮১
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ২৯, ৩২৪, ৩২৮-৩৩১
হারাণচন্দ্র রাহা ২৬৭-২৭০

—

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
১৮	৮	শরৎচন্দ্র রায়	শরৎকুমার রায়
৬৭	৩০	Military System of India	Military History of India
৪১	৬	Society for the Acquisition of knowledge	Society for the Acquisition of general knowledge
২২৭	১	Blackwood Magazine	Blackwood's Magazine.
২৫২	২৩	dakeurits	dakaits
২৭২	১২	দুর্গেশনন্দিনী আয়েষা	দুর্গেশনন্দিনীর মতো। আয়েষা